চীনা সভ্যতার অ,আ,ক,খ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

হৃষীকেশ-সিরিজ,—নং ৫

চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

উৎসর্গ

য়ুয়ান্-চু-আঙ্,

ভারতের হিন্দু তোমাকে চীনের শঙ্করাচার্য্য বলিয়া জানে; এশিয়ার মুসলমান তোমাকে চীনের আল্-ফারাবি বলিয়া মানে।

সপ্তম শতাব্দীর ইয়োরেশিয়ায় তুমি বিজ্ঞানদর্শন-মণ্ডলের সর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বিংশ শতাব্দীর যুবক এশিয়া তোমাকে বিপুল অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং কর্ম্ম-কৌশলের অবতাররূপে পূজা করিয়া থাকে।

হে চীনা ভগীরথ, তুমি হোআংহো ও ইয়াংছি-কিয়াঙে "তিয়েন্-চু" ("স্বর্গ") স্থিত গঙ্গা গোদাবরীর স্রোত বহাইয়াছিলে। মৌর্য্য-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যগণের উত্তরাধিকারী বর্দ্ধন-চালুক্যের ভারতবর্ষকে তুমি চীনা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে। তোমার আমদানি-করা বুদ্ধ-মার্কা হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে "চুঙ্-হুআ" ("ভূ-মধ্য") দেশে নব জীবনের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল।

হে কন্‌ফিউশিয়াস্ শাক্যসিংহের সমন্বয়-সাধক, হে বিদ্যা-সঙ্ঘের ধুরন্ধর, আজ তোমার স্বজাতি মরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই "আঁধার ঘোর" ও "কালিমার" আবেষ্টন ভেদ করিয়াও বিক্রমাদিত্যের বংশধরেরা চীনা সভ্যতার গৌরব কথা বর্ত্তমান জগতে প্রচার করিতে উদগ্রীব হইতেছে,— হোআংহো ইয়াংছির বারিও গঙ্গা-গোদাবরীতে আনিয়া ঢালিতেছে। প্রাচীন তাঙ্-সন্তানগণের বাণী শুনিয়া আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য জীবনের নব নব সাড়া প্রকটিত করিতেছে। নব্য ভারতের এই বিচিত্র জীবন-স্পন্দন যুবক চীনকেও জাগাইয়া এবং কর্ম্মঠ করিয়া তুলিবে।

হে চীনা কর্ম্মবীর, সহস্রাব্দি বর্ষ পরে এইবার তবে ভারতবর্ষ চীনের ঋণ পরিশোধ করিতে চলিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
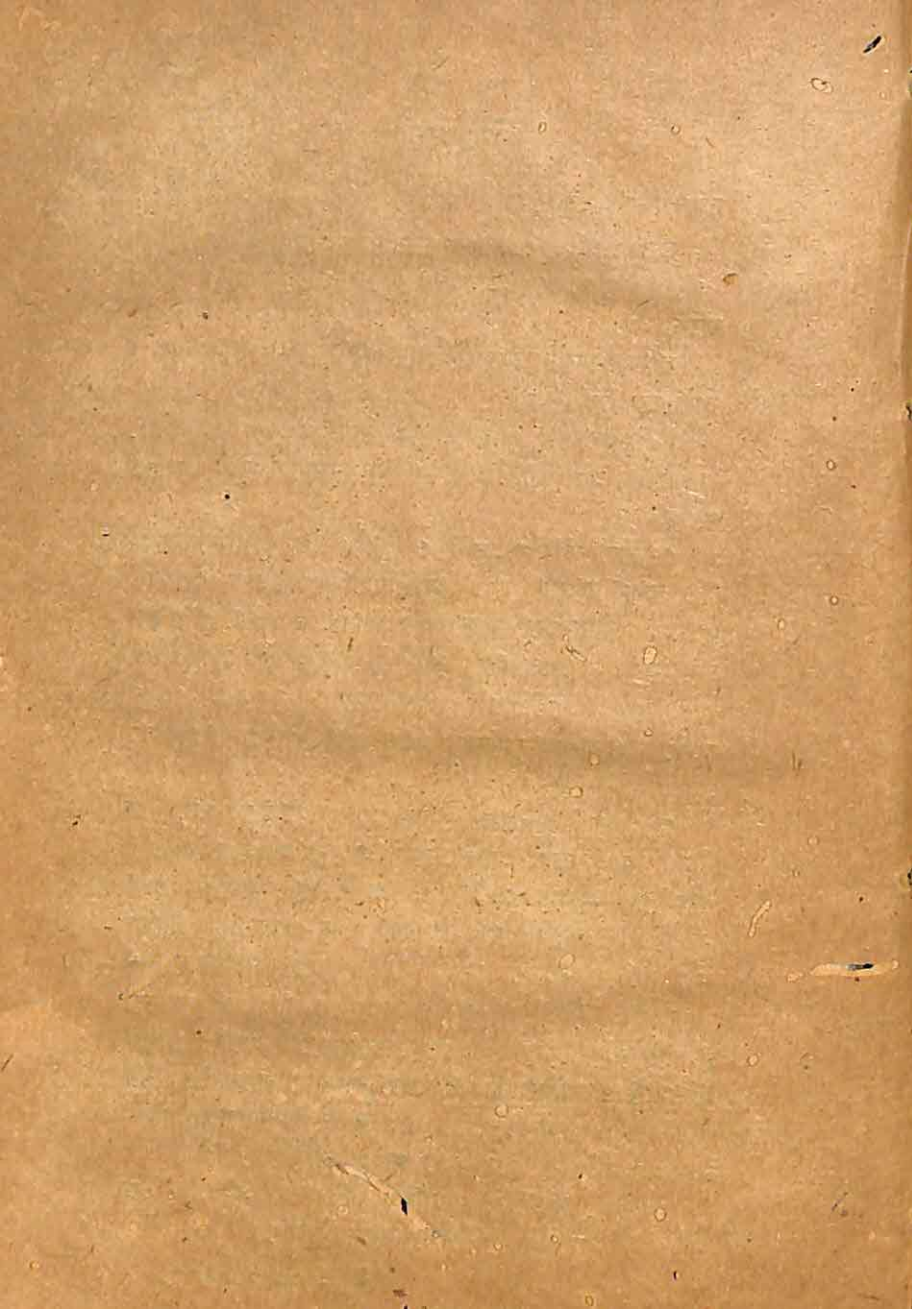
নিবেদন

এই কেতাব লেখা হইয়াছিল সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে,—চীনা আওতায় শাংহাইয়ে। তখন বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। কোন কোন অধ্যায় "ভারতবর্ষ," "গৃহস্থ" এবং "উপাসনা"য় বাহির হইয়াছে।

চীনে কাটিয়াছিল প্রায় এক বৎসর। চীনতত্ত্বের হজম করিতে পারিয়াছি অতি সামান্য মাত্র। যতটুকুই বা পারিয়াছি তাহার দশ ভাগের একভাগও বোধ হয় এই গ্রন্থে গুঁজিতে অবসর পাই নাই। চীন প্রবাসের পর্য্যটন কাহিনী অবশ্য আলাদা বইয়ে ছাপা হইবে।

যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান কেতাবের বনিয়াদ তাহার একটা তালিকা মৎপ্রণীত Chinese Religion through Hindu Eyes (pp. xxxii + 331, 1916, Commercial Press, Shanghai; Panini Office, Allahabad) বইয়ের "বিব্লিওগ্রাফী" বা গ্রন্থ-পঞ্জীতে দ্রষ্টব্য। একটা ইংরেজী তালিকা এখানে ছাপিয়া বাংলা বইয়ের শ্রী নষ্ট করা অনাবশ্যক। তবে দুই খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিব:—(১) Wylie প্রণীত Notes on Chinese Literature (London, 1867), এবং (২) Werner সঙ্কলিত Chinese Sociology (London, 1910). চীনমণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইলে এই বই দুখানার পাতা উল্টাইতেই হইবে।

তখনও জার্ম্মান এবং ফরাসী ভাষায় মনে পড়ি হয় নাই। কাজেই এই দুই ভাষায় নিবদ্ধ "সিনলজির" (চীনতত্ত্বের) হিসাব রাখার দরকার

ছিল না। চীনা কবিতাগুলা বাংলা "সাহিত্যে" স্থান পাইবার যোগ্য করিয়া লিখিতে সময় জুটে নাই। হয়ত ক্ষমতাও নাই। তবে সবই তাড়াহুড়ায় লেখা,—এক-নিঃশ্বাসে যেরূপ বাহির হইয়াছে প্রায় সকল স্থলে তাহাই রাখিয়া দিয়াছি। ঘষা মাজা সুরু করিলে বোধ হয় একদম কিছুই লেখা হইত না। আজও সেই সময়াভাব। যাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সময় লাগাইয়া স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই দিকে নজর দিলে বাঙালীর কাব্যসংসার এক নয়া ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

ভারতে চীনা-প্লাবনের যুগ আসিতেছে। আরবী ও সংস্কৃত-জানা হিন্দু-মুসলমান চীনা-ভাষা দখল করিয়া বর্ত্তমান ও প্রাচীন চীনের জীবন মন্থন করিতে অচিরেই অগ্রসর হইবেন। আর, তাঁহাদের গভীরতর পাণ্ডিত্যের এবং সূক্ষ্মতর ভূয়োদর্শনের বিচারে এই ধরণের "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ," নিতান্ত হাল্কা, তরল ও ছেলেখেলা মাত্র বিবেচিত হইবে। আশা করি, সেই দিনের জন্য ভারতবাসীকে অধিক কাল বসিয়া থাকিতে হইবে না।

চীনের দার্শনিক-প্রবর য়ুয়ান্-চু-আঙের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

"পাখীর কথা"র সুপরিচিত রচয়িতা শ্রীযুক্তসত্যচরণ লাহা এম, এ, বি, এল এফ্ জেড্, এস্ মহাশয় এ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

প্যারিস্, ফ্রান্স,

১৯২১

সূচীপত্র

চীনের রাজবংশ

চীনে আজকাল (১৯১৬ খৃঃ-অঃ) রাজ-রাজড়া নাই। প্রজারাই দেশ-শাসন করে। অর্থাৎ লোকেরা স্বয়ংই একসঙ্গে রাজা ও প্রজা। যখন ইহারা দল বাঁধিয়া আইন করিতে বসে, তখন ইহাদিগকে রাজা বলিতে পারি। আর যখন দল ছাড়িয়া ইহারা ঘরে আসিয়া বসে, তখন ইহাদিগকে প্রজা বলিতে পারি। এখানে প্রত্যেক লোক নিজেই নিজের রাজা; আবার নিজেই নিজের প্রজা। এই ধরণের দেশ বা সমাজ-শাসনকে জনগণের "স্বরাজ" বলা চলে। ইংরেজিতে "রিপাব্লিক" শব্দ প্রচলিত। সাধারণতঃ গণ-তন্ত্র বা প্রজা-তন্ত্র বলা হইয়া থাকে। এই ধরণের গণ-তন্ত্র বা স্বরাজ ইয়োরোপে আছে মাত্র দুই দেশে— ফ্রান্সে এবং সুইট্‌জল্যাণ্ডে। আর আমেরিকা-খণ্ডেরও সকল দেশেই লোকেরা একসঙ্গে রাজা ও প্রজা। এই দেশসমূহের সংখ্যা বিশ। তাহার মধ্যে উত্তর-আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জ্জেণ্টিনা, ব্রেজিল ও চিলি এই চারি দেশ প্রসিদ্ধ। উত্তর-আমেরিকার ক্যানাডা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের উপনিবেশ—তাহার শাসন-প্রণালী স্বতন্ত্র।

পৃথিবীতে গণ-তন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়, উত্তর আমেরিকার ইয়াঙ্কি

সমাজে (১৭৮৫ খৃঃ-অঃ)। তাহার কয়েক বৎসর পরে ফরাসী-সমাজে এই শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (১৭৮৯ খৃঃ-অঃ)। আজকাল গণ-তন্ত্র, স্বরাজ বা প্রজা-তন্ত্রের কথা উঠিলে, আমরা সর্ব্বপ্রথমেই ইয়াঙ্কি যুক্ত-রাষ্ট্র এবং ফরাসী রিপাব্লিকের কথা মনে আনি। এই দুই দেশেও রিপাব্লিকপ্রথা বহুকাল গণ্ড-গোলের ভিতর চালিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই প্রথা দুই সমাজেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে ফ্রান্সে এক বিপ্লব হয় এবং ইয়াঙ্কি-স্থানেও গৃহ-বিবাদের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

এই ৪৬ বৎসর কাল স্বরাজ-প্রথা জগতে নির্ব্বিবাদে টিকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু খাঁটি ঐতিহাসিকভাবে কথা বলিতে হইলে বলিব যে, স্বরাজ-প্রথা আরও প্রাচীন। কেন না ইয়োরোপের সুইট্জর্ল্যাণ্ড আজকালকার দেশ নয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুইস্রা প্রবলপ্রতাপ অষ্ট্রীয়ান সম্রাটকে পরাজিত করে (১৩১৫)। তখন হইতে সুইট্জর্ল্যাণ্ড একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৬৪৮) ওয়েষ্টফেলিয়া সহরে এক বিরাট ইয়োরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে সুইস্ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই সুইস-সমাজে গণ-তন্ত্র চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং স্বরাজ আজ ঠিক ছয়শত বৎসরের প্রাচীন শাসন-প্রণালী।

কিন্তু সুইট্জর্ল্যাণ্ড অতি নগণ্য রাষ্ট্র। কতকগুলি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইয়োরোপের প্রবল রাষ্ট্রপুঞ্জ মুরুব্বির ন্যায় সুইট্জর্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন। ইয়োরোপের কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে সুইস রাষ্ট্র যোগ দিতে আইনতঃ অপারগ। আবার ইয়োরোপের কোন রাষ্ট্রও সুইটজর্ল্যাণ্ড আক্রমণ করিবে না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা কাগজে-

কলমে লিপিবদ্ধ আছে। সুইট্‌জর্ল্যাণ্ডের মত আইনরক্ষিত, অভিভাবক-প্রতিপালিত রাষ্ট্রকে "নিউট্র্যালাইজড্" বা চির-উদাসীনীকৃত রাষ্ট্র বলে। এই জন্য সুইট্‌জর্ল্যাণ্ডের নাম বেশী শুনিতে পাই না। এই কারণেই স্বরাজ-প্রথা সুইসদিগের আবিষ্কাররূপে জগতে রটিতে পারে নাই। এই শাসন প্রণালী ইয়াঙ্কি-ফরাসীদেরই "পেটেন্ট" বা মার্কামারা ভাবে বাজারে চলিতেছে।

চীনেরা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই ইয়াঙ্কি-ফরাসী মাল স্বদেশে আমদানি করিয়াছে। সেই সময়ে চীনে রাজ-তন্ত্র বা "মণার্কি" ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। চীনা-রাজতন্ত্রের সমান প্রাচীন ও দীর্ঘজীবী রাজতন্ত্র জগতে আর ছিল না। অন্ততঃ চারিহাজার বৎসর ধরিয়া রাজতন্ত্র চীনে চলিয়া আসিয়াছে। চীনা-রাজতন্ত্রের নামডাকও খুব বেশীই ছিল। ভারতবর্ষে আমরা অনেক সময়ে কথার কথা বলিয়া থাকি, "সম্রাট্‌ত সম্রাট্—রুশ সম্রাট্! সেইরূপ সম্রাটের পরের সম্রাট্—চীন সম্রাট্!" আজ চারিবৎসর ধরিয়া সেই চীন সম্রাটের সিংহাসন খালি—চীনের রাজমুকুট মাথায় দিবার কোন লোক নাই!—অথচ রাজতক্তে বসিবার উপযুক্ত রাজপুত্র সশরীরে চীনের বড় সহরেই বিদ্যমান! ইহা একটা ঘোর বিপ্লব নহে কি? কোথায় চীনেশ্বরের অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিরাট সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা উঠিবে বসিবে—না, তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতেছি, পঞ্চায়তীর বৈঠক, আর বারোয়ারিতলার শাসন! এই কিম্ভূত-কিমাকার বারোয়ারি-শাসন বা স্বরাজ-প্রথার যুগটাকে আমাদের পারিভাষিক শব্দে "কল্কী-যুগ" বলিতে পারি। চীনে কলিযুগের পর একটা মস্ত যুগান্তর হইয়া গেল বলিলে অন্যায় হইবে কি?

চারিহাজার বৎসরের রাজ-রাজড়াদের নাম মনে রাখা ভয়ানক কথা। রাজবংশগুলির সংখ্যাই ছোট-বড় প্রায় ত্রিশ। সর্ব্বপ্রথম

চীনা নরপতি খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০৫ সালে রাজা হন। অত প্রাচীন সন, তারিখ ভারতীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমরা মহাবীর ও শাক্যসিংহের সমসাময়িক শিশুনাগবংশীয় রাজা বিম্বিসারের তারিখ পাই ৫৩০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। এই সময় হইতে পশ্চাতে ঠেলিয়া বড় জোর ৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় সন, তারিখের সীমানা পাইতে পারি। মৎস্যপুরাণের হিসাব-অনুসারে বোধ হয় সেই সময়ে শিশুনাগবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনা সম্বন্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু চীনা ইতিহাসে তাহার পূর্ব্বেকার অন্ততঃ ১৬০০ বৎসরের প্রমাণ বা প্রমাণাভাব পাওয়া যায়। এমন কি, তাহারও পূর্ব্বেকার ৬০০ বৎসরের কথা সন, তারিখ সমন্বিতভাবে প্রচারিত হইতে পারে। চীনা ইতিহাসের সর্ব্ব পুরাতন বা সর্ব্বপ্রথম বর্ষ ২৮৫২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। এই বৎসর ফুহি (Fuh-hi) রাজা হইয়া ১১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব খৃষ্টান বাইবেল প্রসিদ্ধ "ডেলিউজ" বা "মহা প্লাবনে"র (খৃঃ পূঃ ৩১৫৫) ৩০৩ বৎসর পরে প্রাচীনতম চীনা আমলের খুঁটি ফেলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলিতেন, মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ৩১০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের পরে ফু-হির রাজ্যলাভ। এই হিসাব সত্য হইলে, চীনা সন-তারিখের সীমানা মিশরীয় সন-তারিখের সীমানা হইতে নবীনতর। কারণ, মিশরীয় ইতিহাসের প্রথম খুঁটি ৪০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ; আর তদপেক্ষাও প্রাচীন তথ্য মিশরীয় কাহিনীতে পাওয়া যায়।

এই ত গেল সন-তারিখওয়ালা ইতিহাসের সীমানা। এই পর্য্যন্ত অকাট্য প্রমাণ আছে। অথবা চলনসই প্রমাণ বা অনুমান বা আন্দাজ চলিতে পারে। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বেকার কথা চীনাদের মুখে শুনিতে

পাওয়া যায়। সে গুলি মান্ধাতার আমলের কথা। বস্তুতঃ তাহাকে "সত্যযুগে"র কথা বলাই সঙ্গত।

পৃথিবীর সকল জাতিরই এই ধরণের একটা সত্যযুগ আছে। সেই যুগ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক বা আজগুবি গল্প প্রত্যেক নর-সমাজেই প্রচলিত। গ্রীক, হিন্দু, চীনা কেহই এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়।

(ক) সত্যযুগ

আমাদের শাস্ত্র-অনুসারে কোটি-কোটি বর্ষে এক-এক "কল্প" সম্পূর্ণ হয়। চীনাদের কল্পনা অতদূর পৌঁছিতে পারে নাই। চীনা সত্যযুগ মাত্র পঞ্চাশ হাজার বৎসরেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। এই যুগের প্রধান কথা দুইটি।

(১) পান্-কু (Pan-Ku) চীনাদের আদি-মানব। ঠিক আমাদের অতি-বৃদ্ধ মনু। পান্-কু হাতুড়ি-বাটালি দিয়া জগৎ গড়িয়াছেন—তাঁহার গায়ের পোকা হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইনি আঠারহাজার বৎসর এই কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

(২) সুই-জিন (Sui-jin) অগ্নির ব্যবহার প্রবর্তন করেন। ইঁহাকে চীনাদের প্রমিথিউস বলা যাইতে পারে। বোধ হয় ইনি রন্ধন-বিজ্ঞানেরও প্রবর্তক।

(খ) ত্রেতাযুগ (খৃঃ পূঃ ২৮৫২—২২৫৫)

ভারতীয় যুগ-বিভাগই রক্ষা করিয়া যাইতেছি। চীনা ত্রেতাযুগকে সাধারণতঃ "পঞ্চ-নৃপতি"র যুগ বলা হয়। এই যুগটা সত্যসত্যই "মান্ধাতার আমল"। চীনা-সমাজে এই আমলকে "মহাপ্রাচীনকাল" বলা হইয়া থাকে। এই যুগে বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত হয়—বাদ্য-যন্ত্র

আবিষ্কৃত হয়—লিপি-প্রণালী প্রচলিত হয়—তুঁতের চাষ এবং রেশম-কীট-পালন সুরু হয়—ওজন করিবার দাঁড়িপাল্লা প্রথম ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি। অধিকন্তু অতি বিখ্যাত দুইজন নরপতিও এই যুগেই আবির্ভূত হন। পরবর্ত্তী কালে কন্‌ফিউশিয়াস সেই দুই ব্যক্তিকে "আদর্শপুরুষ" বা "নর-নারায়ণ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুগেরই মাঝা-মাঝি হইতে চীনের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক ছি-মা-চিয়েনের (Sze-Ma Tsien) সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ (খৃষ্টপূর্ব্ব ৯০) সুরু হইয়াছে।

আমাদের ত্রেতাযুগ রামচন্দ্রের জন্য প্রসিদ্ধ। হিন্দুমতে আদর্শ রাজ্যের নাম রামরাজ্য। কন্‌ফিউশিয়াসের দেশে দুইজন রামচন্দ্র আছেন। একজনের নাম য়াও (yao)। আর একজনের নাম শুন্ (Shun)। আমরা জন্মিয়া অবধি মুখস্থ করি—"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।" চীনারাও জন্মিয়া অবধি য়াও ও শুন্ এই দুইজন পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির নাম জপ করে। এমন কি, চীনা-ভাষায় সম্পাদিত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রেও বোধ হয় প্রতিদিন অন্ততঃ একবার এই দুই নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। বাল্মীকির হাতে রামচন্দ্র অমর হইয়াছেন, গ্রীক হোমারের হাতে ইউলিসিস্ অমর হইয়াছেন। সেইরূপ কন্‌ফিউশিয়াসের হাতে য়াও ও শুন্ অমর হইয়াছেন।

(গ) দ্বাপর যুগ (খৃঃ পূঃ ২২০৫—২৪৯)

এইবার দ্বাপরে আসা যাউক। রাজবংশের নামগুলি সহজে মনে রাখিবার জন্য এই যুগ বিভাগ করা যাইতেছে। কোন অবতারের আবির্ভাব-কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

(১) হিয়া (Hia) রাজবংশ (খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০৫—১৭৬৬)। এই

বংশের প্রথম রাজা য়ু-(Yu) ও আর একজন "আদর্শ নরপতি"। কন্‌ফিউশিয়-সাহিত্যে য়ুকে দেব-চরিত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বংশের শেষ নরপতিকে ঠিক তাহার উল্টা দেখান হইয়াছে। নরাধম বা মানবে পশুত্বের নিকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই নাম চীনা-সমাজে আজও প্রচলিত।

(২) শাঙ্ (Shang রাজবংশ (খৃঃ পূঃ ১৭৬৬—১১২২)। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাঙ্ (Tang) কন্‌ফিউশিয় সাহিত্যে ভূরি প্রশংসা পাইয়াছেন। ইনি তাঁহার স্নানাগারে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন—"নিত্য নূতন জীবন যাপন করিবে"। অর্থাৎ "প্রতিদিনই যেন কিছু-না-কিছু উন্নতি হইতে থাকে"। তাঙ্ একবার দেশের দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য আত্মবলিদানে প্রস্তুত ছিলেন। এমন সময়ে সাত বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

(৩) চাও (Chou রাজবংশ (খৃঃ পূঃ ১১২২—২৪৯)। এই যুগের কথাকে খাঁটি ঐতিহাসিক কথা বলা চলে। এই যুগেই লাওটজে এবং কন্‌ফিউশিয়াসের নিকট চীনারা দীক্ষালাভ করে। তাঁহাদের বাণীই আজও চীন-সমাজের অনুশাসন। এই দুই ধর্ম্ম-প্রচারক আমাদের মহাবীর ও শাক্যসিংহের সমসাময়িক। চাও আমলকে প্রাচীন চীনের শেষ স্তর বিবেচনা করিতে পারি। এই আমলের বৃত্তান্ত না জানিলে চীনা-সভ্যতার গোড়ার কথা অজানা থাকিবে। এই যুগের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপরেই পরবর্ত্তী চীনা-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান চীনের মাথা চাও-আমলে। এইখানে দ্বাপর শেষ করিলাম।

(ঘ) কলিযুগ (খৃঃ ২৪৯—১৯১২ খৃঃ অঃ)

এই বার "কলি"—আজকালকার নর-নারীর সুপরিচিত যুগ। এই

২১৫০ বৎসরের কথা যেন সেদিনকার কথা—অতি আধুনিক; বুঝিতে বেশী কষ্ট হয় না। কলিকাল পাপের যুগ নয়! কলিযুগই শ্রেষ্ঠযুগ—কেন না, এই যুগে আমরা বাঁচিয়া আছি। আবার যখন কল্কীযুগে আমাদের জন্ম হইবে, তখন কল্কীযুগই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ যুগ হইবে। চীনে সেই কল্কীযুগ আজকাল চলিতেছে।

চীনের কলিযুগে ২৩।২৪টা রাজবংশ চীনেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই সমুদয়ের মধ্যে চীনারা (১) চিন (Tsin), হ্যান্ (Han), (৩) তাঙ (Tang), (৪) সুঙ (Sung), ও (৫) মিঙ (Ming) এই পাঁচ বংশের নামে গৌরব অনুভব করে। এই পাঁচটি নাম বিদেশীয়গণেরও মনে রাখা কর্ত্তব্য। এই পাঁচ বংশ চীনের খাঁটি স্বদেশী বংশ। এই জন্যও চীনাদের বিশেষ গৌরব। মিঙ বংশের পূর্ব্বে মোগলবংশ এবং পরে মাঞ্চু বংশ রাজত্ব করে। এই দুই বংশই বিদেশী। এই দুই আমলে চীনারা বিজিত জাতি ছিল। এই কারণে চীনা-সমাজে এই দুই নামের আদর নাই। কিন্তু চীনা-রাজবংশের তালিকায় এবং চীনা সভ্যতার ইতিহাসে মোগলবংশ এবং মাঞ্চুবংশ উভয়ই প্রসিদ্ধ। ফলতঃ, চীনা রাজবংশসমূহের মধ্যে পাঁচটা স্বদেশী এবং দুইটা বিদেশী বংশ দুনিয়ায় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য।

এই সঙ্গে কয়েকটা কথা মনে রাখা আবশ্যক।—প্রথমতঃ, ভারতীয় রাজবংশাবলীর নামে আর চীনা-রাজবংশাবলীর নামে কিছু প্রভেদ আছে। আমাদের মৌর্য্যবংশ, গুপ্তবংশ, পালবংশ, সেনবংশ এবং অন্যান্য বংশগুলি নরপতিগণের বংশ বা গোত্র বা পদবী-অনুসারে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু চীনা-রাজবংশের নামে কোন গোত্র বা জাতি বা উপাধিই বুঝা যায় না। এইগুলি প্রদেশের নাম। হ্যান-রাজবংশ বলিলে বুঝিতে হইবে হ্যান প্রদেশের বাসিন্দা নরপতিগণের

বংশ। সেইরূপ তাঙ, সুঙ, চীন ইত্যাদি সবই প্রদেশের নাম। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নবাব বা জমিদারেরা চীনের অধীশ্বর হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশগুলির নাম-অনুসারে রাজবংশের নাম পরিচিত হইয়াছে। বিলাত এক সময়ে ফরাসী দেশস্থ নরম্যাণ্ডি প্রদেশের জমিদারগণের অধীন ছিল। তখন বিলাতের বিজেতা রাজ-বংশের নাম ছিল নরম্যান বংশ। এই নামকরণ চীনাদের অনুরূপ। সেইরূপ ফরাসী দেশীয় এ্যাঞ্জু প্রদেশের জমিদারেরাও এক সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। সেই সময়কার বিলাতের রাজবংশের নাম এ্যাঞ্জেভিন। চীনা কায়দায় বিলাতী রাজ-বংশের নামকরণ আরও আছে। এই কায়দায় ভারতীয় রাজবংশের নামকরণ হইলে, মৌর্য্য-বংশকে বলিব, মগধবংশ; বর্দ্ধনবংশকে বলিব কান্যকুব্জবংশ, পাল-বংশকে বলিব বরেন্দ্রবংশ, সেনবংশকে বলিব রাঢ়বংশ; ইত্যাদি।

চীনা স্বদেশী-রাজবংশের মধ্যে একমাত্র মিঙবংশের নামকরণ এই কায়দায় হয় নাই। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোন স্থানের জমিদার বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। তিনি একজন বৌদ্ধ-পুরোহিতমাত্র ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি বিদেশীয় মোগল-রাজবংশের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহের ধুরন্ধর হয়। অবশেষে তিনিই রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার বংশ কোন প্রদেশের নামে অভিহিত হইতে পারে না। "মিঙ" শব্দের অর্থ "উজ্জ্বল" বা "গৌরবময়"। ভিক্ষু-সেনাপতি সাম্রাজ্যের ভার পাইবার পর এই উপাধি গ্রহণ করেন। জাপানের বিখ্যাত মিকাদোর শাসনকাল এই ধরণের এক শব্দে পরিচিত হইতেছে। ইহাকে মেজি-যুগ বলা হয়। "মেজি"র অর্থ "উন্নতি" "গৌরব" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, তাঙ্‌বংশও চীনের স্বদেশী; আবার চীনবংশ, হান্‌বংশ,

ঙ্‌বংশ ইত্যাদিও চীনের স্বদেশী। কিন্তু নৃতত্ত্ব, বংশতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদির হিসাবে এইগুলিকে এক গোত্রের অন্তর্গত করা সম্ভবপর নয়। খাঁটি স্বদেশী চীনা-রক্তের সঙ্গে বিদেশী রক্তের সংমিশ্রণ যথেষ্টই হইয়াছিল। চীনের প্রাচীনতম সভ্যতাই গঠিত হইয়াছে বিদেশীয়-গণের আগমনের পর। সেই সত্যযুগের "বর্ব্বরাগমন" হইতে বহুশত বর্ষকাল পর্য্যন্ত দেশী-বিদেশী-সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে। মোগল, তাতার, হুন, য়ুয়েচি, শক, কুশান, ইত্যাদি নানা নামে এই সকল বিদেশীয়গণ অভিহিত। চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই সমুদয় জাতির প্রভাব কখনই চাপা পড়ে নাই। এদিকে ইয়াংসির দক্ষিণস্থ জনপদের বর্ব্বরগণও নবাগত সভ্য চীনাদিগের জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফলতঃ, চীনবংশই বলি, বা তাঙ্‌বংশই বলি, বা মিঙবংশই বলি—সকল বংশই ন্যূনাধিক দো-আঁসলা বা মিশ্রিত জাতি। "খাঁটি চীনা" শব্দের প্রয়োগ বিজ্ঞানে চলিতে পারে না। ভারতবর্ষের রাজবংশগুলির কথাও এইরূপ। শিশুনাগবংশ রক্তহিসাবে কোন্ গোত্রের অন্তর্গত বলা সম্ভবপর কি? সেইরূপ মৌর্য্যবংশেরই বা রক্ত কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্ন পাল, সেন, চোল পর্য্যন্ত সকল বংশ-সম্বন্ধেই তোলা যাইতে পারে। মোটের উপর, সংক্ষেপে বলা চলে যে, ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় (অর্থাৎ হিন্দু এবং অহিন্দু) অথবা আর্য্য এবং অনার্য্য এই দুই রক্ত প্রায় সকল বংশেই বিদ্যমান। ভারতীয় ইতিহাসের এই কথাগুলি মনে রাখিলে চীনা-রাজবংশের বৃত্তান্ত সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। মৌর্য্যবংশও হিন্দু বা ভারতীয়, আবার চোল-বংশও হিন্দু বা ভারতীয় এবং সেনবংশও হিন্দু বা ভারতীয়। কিন্তু মৌর্য্যে, চোলে আর সেনে পার্থক্য কত? ঠিক এই পার্থক্য চীনা স্বদেশী-বংশসমূহের মধ্যেও দেখিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে আলো-

চনা বিস্তৃতরূপে হওয়া আবশ্যক। চীন-তত্ত্বজ্ঞেরা সে দিকে বেশী দৃষ্টি
দিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

তৃতীয়তঃ, সমগ্র চীনে কর্ত্তৃত্ব করা কোন বংশেরই সকল নৃপতির
পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। চীন বহুবার ভাঙ্গিয়াছে ; চীনের ভিতর
অসংখ্য ঘরোয়া লড়াই, বিদ্রোহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। অধিকন্তু,
উত্তর এবং পশ্চিম হইতে বহিঃশত্রুর আশঙ্কা চীনে সর্ব্বদাই ছিল। এই
কারণে অনেক সময়ে চীনের কিয়দংশ পরহস্তগত হইয়াছে, এবং অব-
শিষ্টাংশ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীন রহিয়াছে। ফলতঃ অখণ্ড
চীনের সাম্রাজ্য-ভোগ অধিক সংখ্যক নরপতির কপালে জুটে নাই।
কয়েকটি রাজবংশের দু'একজনমাত্র যথার্থ "রাজ-চক্রবর্ত্তী" ছিলেন।
চীন্, হান্ ও তাঙ্ এই তিন বংশের কয়েকজন সম্রাট্ সত্যসত্যই
চীনেশ্বর ছিলেন। বিদেশীয় মোগল এবং মাঞ্চু আমলেও চীনে এবং
চীনের বাহিরেও সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু চীনের ইতিহাসে
প্রায়ই বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ দেখিতে পাই। আর, অন্তর্ব্বিদ্রোহ,
"মাৎস্যন্যায়", "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই"—নীতি, "জোর যার মুল্লুক তার"
সূত্র ইত্যাদির পরিচয় যথেষ্ট।

ভারতীয় ইতিহাসের কথাও এই, ইয়োরোপীয় ইতিহাসের কথাও
এই। ইয়োরোপ, ভারত ও চীন ত এক-একটা বিরাট্ মহাদেশ। এত
বড় ভূখণ্ডে অশান্তি এবং গণ্ডগোল ত থাকিবারই কথা। কালেভদ্রে
এক শার্লামান, গাষ্টাভাস এ্যাডোল্‌ফাস, ফ্রেডরিক, পিটার, নেপোলি-
য়ানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রতাপেও কতখানি জন-
পদই বা একছত্র শাসনের অধীন হইয়াছে? চীনা এবং ভারতীয়
নেপোলিয়ানদিগের কৃতিত্বও প্রায় তদ্রূপ। "মাৎস্যন্যায়" বহুকালের
জন্য নিবারণ করা মানুষের কোষ্ঠিতে লেখে নাই।

বড় বড় মহাদেশের ত কথাই নাই। ছোট খাট ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি ইত্যাদি দেশেই বা কি দেখি? বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ এবং ঘরোয়া লড়াই এই সকল ক্ষুদ্র দেশে বন্ধ হইয়াছে কি? কোন দিনই না। ইয়োরোপের বুকের উপরকার জনপদগুলিতে শান্তি কখনই ছিল না, এখনও নাই—ভবিষ্যতেও থাকিবে না। ইয়োরোপ আগাগোড়া "মাৎস্যন্যায়ের" দৃষ্টান্তস্থল। আজকাল ইতালী, ফ্রান্স, জার্ম্মানি ইত্যাদি নামে যে কয়টা দেশ দেখিতে পাই, সেইগুলি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ছিলই না। রাষ্ট্রসমূহের সীমানা রোজই বদলাইয়া যাইত; এখনও যাইতেছে। ইংলণ্ড দেশটা দ্বীপ—সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। এই জন্য ইংরেজের ইতিহাসে স্বাধীনতার বয়স কিছু বেশী। কিন্তু পরাধীনতার ভয়ে ইংরাজকেও চিরকাল শশব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। ইংরেজ জাতি বহুবার পরাধীন হইয়াছে। দিনেমার, ফরাসী, ওলন্দাজ এবং জার্ম্মাণ রাজবংশ ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছেন। অধিকন্তু "মাৎস্য ন্যায়ে"র তাণ্ডব বিলাতী সমাজেও কম দেখা যায় নাই। ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে লাঠালাঠি সুবিদিত। ইংলণ্ডের সঙ্গে ওয়েলস, স্কটলণ্ড, এবং আয়র্লণ্ডের লড়াইও সুবিদিত। স্কটলণ্ড মাত্র দুই শত বৎসর হইল, ইংলণ্ডের সঙ্গে আপোষ করিয়াছে। আয়র্লণ্ড মাত্র এক শত বৎসর হইল, ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। সেই সংযোগ আজও দৃঢ় নয়। এতদ্ব্যতীত রাজায় প্রজায় মারকাট ত বিলাতে মাত্র সে দিন শেষ হইয়াছে।

সমুদ্রের মধ্যে বড় হাঙ্গরে ছোট হাঙ্গরকে গিলিয়া ফেলে। নদীর মধ্যে বড় মাছ ছোট মাছকে উদরসাৎ করে। প্রকৃতির দস্তুরই এই। প্রকৃতির ধর্ম্ম "সংগ্রাম" পাশ্চাত্য দার্শনিক হব্বার ও স্পিনোজার ভাষায় সংগ্রামকেই বলে "ষ্টেট অব নেচার" অর্থাৎ দুনিয়ার প্রাকৃতিক

অবস্থা। আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্র-গুরু কৌটিল্যের পরিভাষিকে তাহাকে বলা হয় "মাৎস্যন্যায়"। অর্থাৎ "আমি বড় মাছ, তুমি ছোট মাছ। অতএব যুদ্ধং দেহি—অর্থাৎ উদরস্থ ভব।" সোজা কথায় ইহার নাম অরাজকতা।

পৃথিবীতে সর্ব্বত্র শক্তির খেলা চলিতেছে। বিশ্বশক্তিকে যে যত আয়ত্ত করিতে পারিবে, সে তত টিকিয়া থাকিবে। সুতরাং সংগ্রাম এবং অশান্তি ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন ঘটনা নাই। মানুষ যত দিন জীবিত থাকে, ততদিন বিশ্বশক্তির সঙ্গে যুঝাযুঝি করিতে পারে। ততদিন মানুষ সংগ্রামে এবং অশান্তিতে ভয় পায় না। এশিয়ার ইতিহাসে সংখ্যাতীত মাৎস্যন্যায় বা ঘরোয়া লড়াই দেখা যায়। ইহা এশিয়াবাসীর দুর্ব্বলতার চিহ্ন নয় তাহার সজীবতার লক্ষণ। আমেরিকার ইতিহাসেও ঠিক এতগুলি অশান্তি এবং বিদ্রোহের পরিচয় পাই। সেই সমুদয়কে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত দুর্ব্বলতার বা সংযম-হীনতার বা চরিত্রহীনতার লক্ষণ বলেন কি?

চীন-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ ইয়াঙ্কি-স্থানের সাম্রাজ্য হইতে অপসৃত হন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের বোর্বোঁ রাজবংশ সিংহাসন হইতে তাড়িত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার হাঁপ্‌স্‌বুর্গ বংশ ইতালী এবং জার্ম্মাণি এই দুই প্রদেশকে হাতছাড়া করিতে বাধ্য হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনা গণ-শক্তির প্রভাবে মাঞ্চু সম্রাট্ এইধরনের শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছেন। চীনের শেষ সম্রাট তখন নাবালক শিশু মাত্র।

মাঞ্চুবংশ (১৬৪৪—১৯১২) যখন চীনে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন মোগল ভারতের গৌরবযুগ। মাঞ্চুরা মুক্‌ডেন হইতে পিকিঙে আসেন। যে বংশ ধ্বংশ করিয়া মাঞ্চু বীর সম্রাট্ হন তাহার নাম মিঙ্ বংশ (১৩৬৮—১৬৪৪)। মিঙ্ বংশের স্থাপয়িতা একজন সাধারণ লোক মাত্র ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মোগলবংশ ধ্বংশ করিতে সমর্থ হন। মোগলবংশের কাল ১২৬০ হইতে ১৩৬৮ পর্য্যন্ত। এই বংশের প্রবর্ত্তক কব্‌লা খাঁ সুপ্রসিদ্ধ। মোগলেরা ভারতবর্ষে মুসলমান, কিন্তু চীনে বৌদ্ধ। ভারতীয় বাবর আকবর, আওরঙ্গজেব ইত্যাদি সম্রাটগণ কুবলা খাঁর নিকট-আত্মীয়। মোগল বংশে ৯ জন রাজা হইয়া ছিলেন, মিঙবংশে ১৭ জন রাজা হইয়াছিলেন। মাঞ্চুবংশের রাজসংখ্যা ১০। এই তিন বংশেরই প্রবর্ত্তকগণ রণ-কুশল নেপোলিয়ন পদবাচ্য ছিলেন। ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ মাঞ্চুসম্রাট কাংঘি (Kanghi) আমাদের আওরঙজেব ও য়ূরোপের চতুর্দ্দশ লুইয়ের সমসাময়িক।

মিঙ্-বংশ প্রবর্ত্তক তাই-চু বিদেশীয় মোগল বংশ ধ্বংশ করিয়াছিলেন। সেইরূপ বর্ত্তমানে সুন্ য়াৎ-সেন বিদেশীয় মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করিয়াছেন। মিঙ্-বংশ প্রবর্ত্তক তাই-চু একজন নগণ্য লোক—রাজরাজড়াদের রক্ত তাঁহার ধমনীতে একবিন্দুও ছিল না। সানের জন্মও অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারেই হইয়াছে। তাই-চু সম্রাট হইয়াছিলেন ; সান্ অল্পকালের জন্য স্বরাজের সভাপতি বা পঞ্চায়তের মণ্ডল মাত্র ছিলেন। তাই-চুর মোগল-ধ্বংস আর সানের মাঞ্চুধ্বংস এক শ্রেণীর অন্তর্গত। এই কারণে মাঞ্চুবংশ সিংহাসন হইতে সরাইয়া পরসান্ মিঙ্ সম্রাটগণের গোরস্থানে গমন করেন। সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশী সম্রাট্ গণের প্রেতাত্মার নিকট সান্ এবং তাঁহার সহযোগিগণ বর্ত্তমান স্বদেশোদ্ধারের সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। সুন্ স্বয়ং খৃষ্টান—কিন্তু দেশের কাজে জনগণের চিরাভ্যস্ত কনফিউশিয় প্রথা অবলম্বন করিতে আপত্তি করেন নাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন প্রথমবার বিদেশীয়গণের হস্তগত হয়। এই সময়ে উত্তর-ভারতও মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছে—দক্ষিণ-ভারতে তখনও মুসলমানদিগের অধিকার বেশীদূর বিস্তৃত হয় নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চীনে এবং ভারতে জনগনের স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতার আমলে দুই ভূখণ্ডেই যুগে যুগে ক্রমিক উন্নতি দেখা দিয়াছিল। এই উন্নতির বেগ কখনই বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। রাজবংশের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সত্য, স্বাধীন চীন এবং স্বাধীন ভারত বহুবার বহু খণ্ড-চীনে এবং খণ্ড-ভারতে বিভক্ত হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ধারা সুপ্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমবিস্তৃতি ও ক্রমোন্নতি লাভ

করিয়াছিল। চীনা সভ্যতার চরম বিকাশ দ্বাদশ শতাব্দীর সুঙ্-আমলেই দেখিতে পাই।

আর সমসাময়িক বঙ্গের সেন আমলও স্বাধীন হিন্দুসভ্যতার এক গৌরবযুগ। সাহিত্য-হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দী সমগ্র ভারত ভরিয়াই ভারতবাসীর অগষ্টান "এজ" বা স্বর্ণযুগ। চীনের দ্বাদশ শতাব্দীকেও লোকেরা অগষ্টান "এজ" বলে। এই ক্রমবিকাশের ধাপগুলি এখন বুঝা যাউক।

চাও আমলে চীনের দ্বাপর শেষ ও কলির আরম্ভ দেখিয়াছি—এক্ষণে কলির শেষ দেখিলাম। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৯ হইতে খৃষ্টীয় ১২৫০ পর্য্যন্ত দেড় হাজার বৎসরের কথাই চীনা-জাতির গৌরবের কথা। এই গৌরবেই চীনের গৌরব। চীনা সভ্যতা বলিলে আমরা সাধারণতঃ এই দেড় হাজার বৎসরের চীন-কথাই বুঝিয়া থাকি।

(১) চীনবংশ (খৃঃ পৃঃ ২৪৯-২৫০)। চাও আমলে বর্ত্তমান চীনের আধখানামাত্র সভ্য-গণ্ডীর অন্তর্গত ছিল। হোয়াং-হো এবং ইয়াংসি নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জনপদে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। ইয়াং-সির দক্ষিণে অর্থাৎ চীনের "দাক্ষিণাত্যে" তখনও "বর্ব্বরমণ্ডল" বিরাজমান। আর উত্তরে মাঙ্গোলিয়া এবং পশ্চিমে তুর্কীস্থান ত চীনা "আর্য্য" গণের ধারণায় "দস্যু জাতীয় শত্রুগণের আবাসভূমি। এই বর্ব্বর-সমাবৃত "ভূ-মধ্য" দেশে চাও রাজবংশ বাদশাহী করিতেন—কিন্তু তাঁহাদের এক্তিয়ার বড় বেশী ছিল না তাঁহাদের সেনাপতি, লাঠিয়াল, জমিদার এবং কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব স্থানে একপ্রকার স্বাধীন নরপতি হইয়া বসিয়াছিলেন এই ধরণের স্বাধীন রাষ্ট্রকেন্দ্র কোন সময়ে শতাধিক, কোন সময়ে পঁচাত্তর, কোন সময়ে পঞ্চাশের অধিক ছিল। কাজেই "মাৎস্যন্যায়ের"-অবাধলীলা চাওআমলে প্রকটিত হইয়াছিল।

অবশেষে একটি প্রদেশ সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে। তাহার নাম চীন (Tsin)। চীনের জমিদার অন্যান্য সকলকে কাবু করিয়া চাওবংশের উচ্ছেদ-সাধন করেন। সমগ্র চীনমণ্ডল এতদিনে প্রথমবার ঐক্যবদ্ধ হইল। এই ঐক্য-সংস্থাপক কর্ম্মবীর চীনের "সর্ব্বপ্রথম একরাট্" উপাধি গ্রহণ করিলেন (খৃঃ পূঃ ২২১)। চীনা ভাষায় এই উপাধি শিহোয়াংতি (শি=প্রথম, হোয়াংতি=সম্রাট্)। এতদিনে দেশের নাম "চীন" হইল। পূর্ব্বে নাম ছিল "ভূম-ধ্য" (দুনিয়ার মধ্যবর্ত্তী) দেশ। ইংরেজিতে "মিড্ল কিংডম" —চীনাতে "চুং-হুয়া"।

চীনেশ্বরগণ সম্রাট হইবামাত্র এক-একটা উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আসল নামে তাঁহারা পরিচিত হন না। ভারতীয় নৃপতিগণের মধ্যেও কেহ-কেহ এইরূপ উপাধি গ্রহণ করিতেন। বিক্রমাদিত্য, শিলাদিত্য, বালাদিত্য, নরেন্দ্রাদিত্য ইত্যাদি শব্দ সম্রাটগণের উপাধিবাচক, নামবাচক নয়। চীনাদের দস্তুর এই যে, কোন সম্রাটই তাঁহার নিজ নামে পরিচিত হইবেন না। যতগুলি চীন সম্রাটের নাম আমরা জানি, সবগুলিই উপাধিমাত্র। বর্ত্তমানে স্বরাজ-সভাপতি য়ুয়ান্-শি-কাইও সম্রাট হইতে চেষ্টা করিবার সময়ে প্রথমেই একটা উপাধি লইয়াছিলেন। তাঁহার কপালে উহার ভোগ হইল না।

সমগ্র চীনমণ্ডলের প্রথম অধীশ্বর ঘোষণা করিলেন—"ওহে ভূমধ্য-দেশের অধিবাসিগণ, আমার পূর্ব্বে তোমাদের কোন একরাট্ ছিলেন না। আমাকেই তোমাদের সর্ব্বপ্রথম রাজরাজেশ্বর বলিয়া জানিও। আমার পূর্ব্বেকার সকল ইতিহাস ভুলিয়া যাও। আমি এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিলাম। আমার জন্মভূমি চীন জেলার নাম হইতে এই যুগের নামকরণ হইবে। তোমাদের দেশটাও আগাগোড়া আমার জন্মভূমি অনুসারে চীন নামে পরিচিত হইবে। আজ হইতে তোমরা

সকলে চীনা ; তোমাদের দেশের নাম চীন, এবং এই যুগের নাম চীন-শি-হোয়াংতির যুগ। আমার পরবর্ত্তী সম্রাটগণ দশহাজার পুরুষ পর্য্যন্ত এই যুগ হইতেই কালগণনা করিবেন। আমার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় শি-হোয়াংতি নামে পরিচিত হইবেন- তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় শি-হোয়াংতি হইবেন। এইরূপ যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ চলিবে। ইহাই আমার আদেশ।"

আমাদের মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত (খৃঃ পূঃ ৩২২—২৯৮) এইরূপ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের নাম হইত মগধ, আর ভারতবাসীরা পরিচিত হইত মগধ সন্তান বলিয়া, আর চন্দ্রগুপ্তের নাম এবং উপাধি হইত মগধ-শি-হোয়াংতি বা মগধ-প্রথমসম্রাট। বঙ্গের পালবংশ আর্য্যাবর্ত্ত দখল করিয়াছিলেন। গোপাল, ধর্ম্মপাল বা দেবপালের চীনা খেয়াল চাপিলে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের নাম হইত বরেন্দ্র ; কেন না, বরেন্দ্রী পালরাজগণের পিতৃভূমি। আর গোপাল বা ধর্ম্মপালের নাম হইত বরেন্দ্র-শি-হোয়াংতি বা বরেন্দ্র-প্রথম-সম্রাট। সেইরূপ বিজয়সেন ইচ্ছা করিলে গোটা বাঙ্গালাদেশকে "রাঢ়" নাম দিতে পারিতেন এবং নিজের নাম দিতে পারিতেন রাঢ়-শি-হোয়াংতি বা রাঢ়-প্রথম-সম্রাট। কারণ রাঢ় সেন-বংশের জন্মভূমি।

শি-হোয়াংতি চীনের "দাক্ষিণাত্য" দখল করিতে আসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বোধ হয় মুখে ফার্ম্মাণ জারি করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। মোগল বর্ব্বরদিগের আক্রমণ হইতে চীনমণ্ডল রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী চাও আমলে "বিরাট প্রাচীরের" কিয়দংশ স্থানে-স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শি-হোয়াংতি সেই প্রাচীর সম্পূর্ণ করেন। লোকেরা শি-হোয়াংতিকেই বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণের ষোল আনা বাহবা দিয়া থাকে।

শি-হোয়াংতি নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ডেঁপো কন্‌ফিউশিয় পণ্ডিতগণের বাক্‌বিতণ্ডায় তাঁহার কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছিল। এই কারণে চীনের পণ্ডিতবংশ ধ্বংস করা তাঁহার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি। চীনের কোথাও এক পংক্তি প্রাচীন সাহিত্য আর থাকিল না। মান্ধাতার আমল হইতে যত রচনা নামিয়া আসিয়াছিল, সকলগুলিকে অগ্নিসাৎ করিয়া শি-হোয়াংতি ঠাণ্ডা হইলেন। নেপোলিয়ান বা আলেক্‌জাণ্ডার এই চীনা নেপোলিয়ানের নিকট হার মানিবেন, সন্দেহ নাই। সকল দিক হইতেই শি-হোয়াংতি চীনে একটা নবযুগ আনিলেন।

শি-হোয়াংতি (খৃঃ পুঃ ২৪৯-২১১) আমাদের অশোকের (খৃঃ পুঃ-২৭০-২৩০) সমসাময়িক। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। চন্দ্রগুপ্ত ভারতীয় ইতিহাসের শি-হোয়াংতি বা সর্ব্বপ্রথম একরাট্‌। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা চীনের মতই ছিল। মাৎস্যন্যায় দূর করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতেশ্বর হন ? অতএব চীনের চন্দ্রগুপ্ত এবং ভারতের শি-হোয়াংতি অর্থাৎ এশিয়ার দুই সর্ব্বপ্রথম নেপোলিয়ান প্রায় একসময়-কার লোক। উভয়েই দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী। খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য দিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, ভারতীয় শি-হোয়াংতির প্রায় শত বর্ষ পরে চীনা শি-হোয়াংতির কাল। আর আলেকজাণ্ডারের ঠিক পরেই ভারতীয় প্রথম নেপোলিয়ানের অভ্যুদয়।

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু ৩২৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে—সেই বৎসরই চন্দ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট হন। চীনের চন্দ্রগুপ্ত শি-হোয়াংতি হন ২২১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ; সুতরাং ভারত সাম্রাজ্য চীন-সাম্রাজ্য অপেক্ষা শতবর্ষ প্রাচীন। বস্তুতঃ কালহিসাবে আমাদের চন্দ্রগুপ্ত দুনিয়ার সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্‌। প্রাচীনতম কালের মিশর ও ব্যাবিলনের কথা সম্প্রতি ভুলিয়া যাইতেছি। অপেক্ষা-

কৃত অর্ব্বাচীন কালে ম্যাসিডন-বীর আলেক্‌জাণ্ডারই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার অকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁহার দিগ্‌বিজয়ের ফলসমূহ ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; অথচ সেই সময়ে হিন্দু নরপতি সাম্রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হন। তখনও চীনে চাও আমলের মাৎ সন্যায় চলিতেছে; আর সুদূর পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কল্পনাও কেহ করিতে অসমর্থ। কাজেই হিন্দুসাম্রাজ্যকে জগতের সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্য বলিতে দ্বিধা নাই।

চীনে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, শি-হোয়াংতি ভারতীয় মৌর্য্যবংশের লোক। এই গল্পের কোন ভিত্তি খুজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের সঙ্গে চীনের কোন প্রকার লেনদেনই চীন-আমলে (খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে), বোধ হয় সাধিত হয় নাই। এমন কি চীনারা স্বদেশ ছাড়িয়া মধ্য-এশিয়ায় আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। এখন পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বাহির হয় নাই। মধ্য-এশিয়ায় চীনাদের কারবার সম্বন্ধে আন্দাজ চলিতে পারে মাত্র।

কিন্তু ভারতবর্ষ এই আমলে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ম্যাসিডনীয়া, গ্রীস, এশিয়া-মাইনার, সীরিয়া, ও মিশর এই কয়দেশেও অশোকের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ সকল জনপদের অধিবাসিগণের সঙ্গে ভারতবাসীর লেনদেন অনেক হইত। অশোকানুশাসনে তাহার পরিচয় পাই; বিদেশীয় সাহিত্যেও তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু চীনের সংলগ্ন মধ্য-এশিয়ায় অশোকের প্রভাব কতখানি ছিল, তাহা সবিশেষ জানিতে পারা যায় না।

অশোক দুনিয়ার সর্ব্বত্র নিজের নাম ও নিজ সাম্রাজ্যের নাম জাহির করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে চীনের শি-হোয়াংতি ব্যতীত জগতে তাঁহার সমান নরপতি আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু

পৃথিবীর রাষ্ট্রমণ্ডলে অশোকের নাম-ডাক শি-হোয়াংতি অপেক্ষা বেশী ছিল। বস্তুতঃ শি-হোয়াংতিকে চীনের বাহিরে কেহ জানিত না। আর ভারতীয় অশোক দুনিয়ার রাজ-রাজড়ামহলে সম্মানিত হইতেন। ভারতের কন্‌সাল,রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক ও ব্যবসায়ী দুনিয়ার বড় বড় নগরে বসবাস করিতেন। জগতের প্রভাব ভারতে এবং ভারতের প্রভাব জগতে ছড়াইয়া পড়িত। আমাদের পাটলিপুত্র-নগর সেই সময়ে বর্ত্তমান লণ্ডনের মর্য্যাদা পাইত। বিভিন্ন দেশের নানাভাষা-ভাষী কন্‌সাল, এ্যাম্বাসেডার, রাষ্ট্রদূত, দার্শনিক, চিকিৎসক ও ব্যবসাদার পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। অশোক এক বিরাট বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাকে একজন বৈরাগ্য-ব্রতধারী, কামকাঞ্চনকীর্ত্তিবর্জ্জনকারী, নির্লোভ ধর্ম্ম-প্রচারক বিবেচনা করা নিতান্ত ভুল। অশোককে যশাকাঙ্ক্ষী প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্রবীররূপে না দেখিলে খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতেতিহাস বুঝা অসম্ভব। পরবর্ত্তীকালে প্রশিয়ার ফেডারিক-দি-গ্রেট, রুশিয়ার পিটার-দি গ্রেট, এবং জাপানের মুৎসুইতো-মিকাদো ঠিক অশোকেরই আদর্শানুযায়ী প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রবীর হইয়াছেন। ইঁহারা কেহই "প্রতিষ্ঠা"কে "শূকরী-বিষ্ঠা"র ন্যায় বর্জ্জনীয় বিবেচনা করিতেন না।

(২) হান্‌বংশ (খৃঃ পূঃ ২১০ খৃঃ অঃ ২২০)।

(ক) পশ্চিম হান্‌বংশ (খৃঃ পূঃ ২১০-খৃঃ অঃ ২৫)। এই বংশে কতিপয় ক্ষমতাবান সম্রাটের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সভ্যতার সকল বিভাগে এই যুগে চীনের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এইজন্য চীনারা অনেক সময়ে "হ্যান্‌-সন্তান" বলিয়া গৌরব বোধ করে। ষষ্ঠ নরপতি উ-তি (Wu-Ti) সর্ব্ব প্রসিদ্ধ হান্ সম্রাট্ (খৃঃ পূঃ ১৪০-৮৭)। উতি শব্দের অর্থ "দিগ্‌বিজয়ী"। অনেক চীন-সম্রাটের এই উপাধি দেখা

যায়। এই রাজত্বকালের দুইটি কথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ মধ্য-এশিয়া এবং প্রতীচ্য এশিয়া পর্য্যন্ত চীনেরা তাঁহার আমলে অভিযান পাঠাইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ১০৫-৯০ বর্ষের মধ্যে কতিপয় সেনাপতি এই সকল অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাতার জাতীয় হুনদিগের সঙ্গে সংঘর্ষ এই সকল অভিযানের কারণ। ইতিপূর্ব্বে চীনারা চীনমণ্ডল ছাড়িয়া কখনও বাহিরে আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। উ-তির আমলের দ্বিতীয় কথা হিন্দু সাহিত্য-সেবিগণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। খৃঃ পূর্ব্ব ৯০ অব্দে ছি-মা-চিয়েন (Sze-Ma-Chien) চীনের ইতিহাস রচনা করেন। এই ধরণের ইতিহাস-গ্রন্থ সংস্কৃত-সাহিত্যে একখানাও নাই। ছির ইতিহাস চীনের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এজন্য গ্রন্থকারকে চীনের "হেরোডোটাস" বলা হইয়া থাকে। হেরোডোটাস গ্রীসের সর্ব্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৩৪ জন্ম)।

"পশ্চিম হ্যান্"বংশের আমলে ভারতবর্ষের কোন প্রবল-প্রতাপ নরপতির রাজত্ব ছিল না। তাতার জাতীয় শক এবং য়ুয়েচিগণ মধ্য-এশিয়ার গ্রীক-রাষ্ট্রপুঞ্জ ধ্বংস করিতে-করিতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা তাতারজাতীয় হুনগণের আক্রমণে ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই য়ুয়েচিদিগের সাহায্যেই হ্যান্ সম্রাট উতি হুন-বন্যা হইতে চীন-সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

এই যুগে ইয়ুরোপে রোমীয় বীরগণ দিগ্বিজয় করিতেছিলেন। পরে তুমুল ঘরোয়া দাঙ্গাকাণ্ডের পর রোমান জাতীর "স্বরাজ"প্রথা বিনষ্ট হয়; এবং তাহার স্থানে "সাম্রাজ্য"-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অগষ্টাস সীজার "সাম্রাজ্যের" প্রথম অধীশ্বর হন (খৃঃ পূঃ ২৭-১৪ খৃঃ অঃ)। এই যুগকে রোমীয় (ল্যাটিন) সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে। বস্তুতঃ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সম্রাট অগাষ্টাসের নাম অনুসারেই জগতের যে কোন স্বর্ণযুগের নাম দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিভাষিক অনুসারে আমাদের বিক্রমাদিত্যের আমলকেও "অগাষ্টান" "যুগ" বলা হইবে।

(খ). পূর্ব্ব হ্যান্‌বংশ (খৃঃ অঃ ২৫-২২০ খৃঃ অঃ। এই আমলে রাজধানী পূর্ব্বদিকে স্থানান্তরিত হয়। পশ্চিম হ্যান্‌বংশের সাম্রাজ্য-গৌরব এই দুইশত বৎসর চীনারা ভোগ করে নাই। অশান্তি, বিদ্রোহ, দুর্ব্বলতা চীনে সর্ব্বদা বিরাজ করিত।

এই বংশের সম্রাট মিঙ্‌-তি একটা স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্ন অনুসারে তিনি মধ্য-এসিয়ায় এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের ফলে সংস্কৃত পুঁথি, বুদ্ধমূর্ত্তি এবং শাক্যসিংহের মত চীনে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় (খৃঃ অঃ ৬৭)।

মধ্য-এশিয়া এই সময়ে ভারতবর্ষের একটা প্রদেশমাত্র ছিল, বলা যাইতে পারে। ভারতীয় ভাষা, লিপি, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, ধর্ম্ম, টোল, সবই মধ্য-এশিয়ায় সুপ্রচলিত ছিল। আর মধ্য-এশিয়ার লোকজন এবং উত্তর-ভারতের লোকজন একই গোত্রের অন্তর্গত ছিল। তাহারা সকলেই তাতার জাতীয়। অথবা অন্ততঃ তাতার রক্ত-মাংসে গঠিত।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সকল অঞ্চলে তাতারগণের উপনিবেশ স্থাপন সুরু হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে য়ুয়েচি (ইণ্ডো-তাতার) বা কুষাণ নরপতি কাণিষ্ক (খৃঃ৭৮-১২৩?) এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। কাণিষ্কের সন তারিখ এখনও সুনির্দ্ধারিত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ এই নরপতির প্রভাবে কাশগর, ইয়ারকণ্ড ও খোতান ইত্যাদি জনপদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। কাণিষ্কের সাম্রাজ্যের বাহিরেও য়ুয়েচি অথবা অন্যান্য তাতার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব

অবগত হওয়া যায়। সেই সমুদয়েও কাণিষ্কের প্রভাব বিস্তৃত হইত। সুতরাং তাতার জাতির সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতবর্ষের আয়তন সত্যসত্যই বাড়িয়া গিয়াছিল। চীনাদের "পূর্ব্ব হান্" আমলে মধ্য এশিয়ায় "বৃহত্তর ভারতে"র প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের এক প্রধান কথা। এই কার্য্যে তাতার বা মঙ্গোলিয় জাতির কৃতিত্বও বিশেষ স্মরণীয়।

হিন্দু-তাতারগণের গৌরব কথা এতদিন মরুভূমির বালুকার ভিতর লুকাইয়া ছিল। সম্প্রতি ষ্টাইনের (Stein) "Ruins of Desert Cathay" বা মরু-চীনের ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাহার বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে খননকার্য্য হইয়াছে এবং হইতেছে। আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের বিবরণ এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র রাজবংশের (খৃঃ পূঃ ২০০ খৃঃ অঃ ২২৫) প্রতিপত্তি ছিল। হিন্দু-কুষাণ এবং অন্ধ্র উভয়েই রোমীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে কারবার চালাইতেন। সুতরাং স্থলপথে চীনের সঙ্গে ভারতের যোগ ছিল ; আর, স্থলপথে এবং জলপথে রোমনজাতির সঙ্গে হিন্দুদিগের কারবার চলিত। ট্রাজানের (Trajan) আমলে (খৃঃ অঃ ৯৮-১১৭) রোমীয় সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি হইয়াছিল। স্থলপথের কারবারে মধ্য-এশিয়ার স্থান সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য। কুচা এবং খোতানের বাজারে-বাজারে রোম,ভারত এবং চীনের সকল প্রকার দালাল ও ব্যাপারীরা সম্মিলিত হইতেন। মধ্য-এশিয়ার হাটে আদার ব্যাপারী হইতে আধ্যাত্মিক মালের আড়তদার পর্য্যন্ত সকল ব্যবসায়ীরই লেনদেন চলিত। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের বিনিময় এই মধ্য-এশিয়াতেই প্রধানভাবে সাধিত হইত। এই যুগে মধ্য-এশিয়া নগণ্য জনপদ ছিল না—এখানকার মেলায় মেলায় এশিয়া-য়ুরোপের সকল মাল কেনা-বেচা হইত। বর্ত্তমান যুগে এই কথা বুঝিতে পারা অতি দুরূহ। কিন্তু হান্

আমলে চীন হইতে ভারত পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা ছিল, আবার চীন হইতে এশিয়া-মাইনারের রোমাণ সাম্রাজ্য পর্য্যন্তও বাণিজ্যপথ ছিল। কাজেই গ্রীক, রোমাণ, মিশরীয়, সীরিয়, পারসী, হিন্দুস্থানী, চীনা, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শৈব, কণফিউশিয় ইত্যাদি ছত্রিশ জাতির সম্মিলন ঘটিতে পারিত।

(৩) মাৎস্য-ন্যায়ের যুগ (খৃঃ অঃ ২২০-৫৮৯)।

(ক) প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯০ খৃষ্টাব্দে হান্ বংশের লোপ হয়। এই সময় চীনে এক সঙ্গে তিন বংশ রাজত্ব করেন। হান্ বংশের প্রভুত্ব সঙ্কীর্ণ জনপদে সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরে উ-ই (wei) বংশ এবং দক্ষিণ উ (wu) বংশ স্থাপিত হয়। ২৬৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তিনটা খণ্ড-চীনের আমল।

(খ) "পশ্চিম-চীন" বংশ (খৃঃ অঃ ২৬৫—৩২২)।

হূনেরা এই আমলে চীনের নানা অঞ্চল দখল করিয়া বসে। অখণ্ড চীনের সম্রাট্ এই বংশে কেহ ছিলেন না বলিলেই চলে। খাঁটি চীনারা ইয়াংসির দক্ষিণে কোনমতে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

(গ) "পূর্ব্ব-চীন"বংশ (খৃঃ অঃ ৩১৩—৪১৯)। এই আমলে ফাহিয়ান ভারতে আগমন করেন। ভারতমণ্ডল হইতেও বহু প্রচারক চীনে আসিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রসিদ্ধের নাম কুমারজীব। ভারতবর্ষে তখন দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের যুগ। এই যুগে চন্দ্রবর্ম্মা নামক একজন ভারতীয় নেপোলিয়নের দিগ্‌বিজয় কথাও অবগত হওয়া যায়। রোমান সাম্রাজ্য এই সময়ে দুইটুকরা হইয়াছে (৩৯৫ খৃঃ অঃ)। পুরাতন অংশের রাজধানী রোমেই রহিল—নূতনের রাজধানী হইল রুম বা কন্‌ষ্টান্টিনোপলে। পূর্ব্ব-চীন বংশের শেষ ভাগে

হূণ-সেনাপতি এটিলা (Attila) রোমাণ সাম্রাজ্য-ধ্বংসের সূত্রপাত করেন (৪৫০)।

(ঘ) "উত্তর সঙ্"বংশ (খৃঃ অঃ ৪২০—৭৯)। মাৎস্যন্যায়ের এবং বিদেশীয় আক্রমণের সকল লক্ষণই এই যুগে বিরাজমান। হূণেরা উত্তর-চীন বা চীনা "আর্য্যাবর্ত্তের" নানাস্থানে নূতন-নূতন রাজ্য-গঠন করিয়া বসিয়াছেন। ভারতবর্ষে গুপ্ত সম্রাটগণের গৌরব যুগ চলিতেছে। ইয়োরোপে রোমাণ সাম্রাজ্যের পুরাতন অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে (খৃঃ ৪৫৫—৭৬)।

(ঙ) চি-(Tsi) বংশ (৪৭৯—৫০২)। নান্‌কিঙে এই বংশের রাজধানী ছিল। এই সময়ে হূণ উপদ্রব চীনে ত ছিলই, ভারতেও দেখা দিল। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর (৪৫৫) হইতে গুপ্তসাম্রাজ্যের গৌরব কমিতে সুরু হইয়াছে। ইয়োরোপে নব নব রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোগ হইতেছে মাত্র। টিউটনেরা প্রদেশে-প্রদেশে বসতি স্থাপন করিতেছে।

(চ) লিয়াঙ্ (Liang) বংশ (৫০২—৫৭)। এই আমলে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের আদান-প্রদান প্রচুর পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। চীনের "দাক্ষিণাত্যে" অর্থাৎ ইয়াংসির দক্ষিণে এই বংশের কর্ত্তৃত্ব ছিল। প্রসিদ্ধ নরপতির নাম উ-তি। ইনি যৌবনে কন্‌ফিউশিয়াস-ভক্ত ছিলেন—প্রৌঢ় বয়সে ভারতীয় মহাত্মার শরণাপন্ন হন। তিনি গুপ্তসম্রাটের নিকট লোক পাঠাইয়া স্বদেশে বৌদ্ধ-সাহিত্য আমদানি করেন। তাঁহার অভিযান জলপথে প্রেরিত হইয়াছিল। সিংহল দ্বীপে তখন চীন ও ভারতের জলবাণিজ্যের প্রধান আড়ত ছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজপুত্র বোধিধর্ম্ম এবং উজ্জয়িনীর পণ্ডিত পরমার্থ উ-তির রাজত্বকালে জলপথে চীনে উপস্থিত হন। দুইজনেই ক্যাণ্টন বন্দরের ষ্টেশনে জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন। বোধিধর্ম্ম চীনা বৌদ্ধ-মহলে

প্রসিদ্ধ। তাঁহার ধ্যান-ধারণা এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা
কাহিনী প্রচলিত আছে। চীনা চিত্রকলায়ও বোধিধর্ম্মের অনেক কথা
জানিতে পারা যায়। লিয়াঙ্ আমলে ভারতীয় গুপ্ত-সম্রাট্গণের রাষ্ট্রীয়
ক্ষমতা কমিলেও কীর্ত্তি কমে নাই। ইয়োরোপের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে
তখন জাষ্টিনিয়ান (৫২৭—৬৫) প্রবল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। জাষ্টিনি-
য়ানই (Justinian) এই যুগের রাষ্ট্রমণ্ডলে সর্ব্বপ্রধান নরপতি।
তাঁহার মাথা একসঙ্গে নানাদিকে খেলিত। ইউরোপীয় আইন সঙ্ক-
লনের জন্য জাষ্টিনিয়ান প্রসিদ্ধ।

(ছ) চিন (Chin) বংশ। (৫৫৭—৮৯) নামেমাত্র এই বংশের
কর্ত্তৃত্ব ছিল। চীনের সমগ্র "আর্য্যাবর্ত্তে"ই বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া
হূণ রাজ্য চলিতেছে। হূণ আমলে চীনের সঙ্গে উত্তর-এশিয়া, প্রাচ্য-
তম এশিয়া এবং প্রতীচ্যতম এশিয়া নানাসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল।
কোরিয়া হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত চীনাদের বাণিজ্য বিস্তৃত
হইয়াছিল। কুষাণদিগের আমলে যেমন হিন্দু-প্রভাব মধ্যএশিয়ার
তাতার মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে—সেইরূপ হূণদিগের আমলে চীনের
প্রভাব সমগ্র এশিয়ার তাতার-মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূণ-মণ্ডল এশিয়ার সকল জনপদেই বিস্তৃত
ছিল। চীন, ভারতবর্ষ, মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্থান, পারস্য সর্ব্বত্রই
হূণপ্রতাপ বিরাজ করিত। চীনে হূণ-সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব করিতেন ওয়ে
(Wie) বংশ (খৃঃ অঃ ৩৮৬—৫৩৪)। ভারতে হূণ-সাম্রাজ্যের রাজ-
ধানী পঞ্চনদের সাকল নগর (বর্ত্তমান সিয়ালকোট)। তোরমাণ
(৫০০) এবং মিহিরগুল (৫১০—৪০ ?) ভারতীয় হূণগণের মধ্যে
প্রসিদ্ধ। মিহিরগুল ৫২৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সম্রাট নরসিংহ বালাদিত্য কর্ত্তৃক
পরাজিত হন। ভারতীয় হূণেরা শৈব ছিলেন।

ভারতের দাক্ষিণাত্যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২২৫ অব্দ পর্য্যন্ত অন্ধরাজগণ কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। এই যুগ চীনা হ্যান্ বংশের যুগ। তাহার পর তিনশত বৎসরের কোন কথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং চীনা মাৎস্যন্যায়ের যুগের দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস অলিখিত রহিয়াছে।

চীনের এই রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতার যুগ সম্বন্ধে কয়েকটা মোটা কথা পাওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ তাতার বা মোগল জাতীয় লোকেরা হ্যানসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়াছে। এই জাতীয় লোকেরাই তাহার পূর্ব্বে ভারতীয় মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শেষ নিদর্শন লুপ্ত করিয়াছিল। আবার এই জাতীয় লোকেরাই পরবর্ত্তীকালে রোমণ সাম্রাজ্য-ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। কালানুসারে জগতের প্রথম সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পূঃ ৩২৩) —দ্বিতীয় সাম্রাজ্য চীনে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পূঃ ২২১)—তৃতীয় সাম্রাজ্য রোমে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পূঃ ২৭)। * ঠিক এই ক্রমানুসারেই তাতারজাতি কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংস-সাধনও হইয়াছে। কুষাণেরা ভারতে সর্ব্বপ্রথমে তাতার-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হুণেরা তাহার পর চীনে তাতার সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পর হুণ সেনাপতির আক্রমণে টিউটন জাতি রোমণ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাতার জাতির ইতিহাস-কথা এশিয়া এবং ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আলোচনা অতি অল্পই হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গিবন (Gibbon) প্রণীত "Decline and Fall of the Roman Empire" অর্থাৎ "রোমান সাম্রাজ্যের ক্রমপতন" নামক গ্রন্থে তাতার বা মোগল বা সীথিয় বা হুণ বা শ্বেতহুণ জাতি সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। এতদ্ব্যতীত (Howarth)

হাওয়ার্থ-প্রণীত "History of the Mongols" বা "মোগল জাতির ইতিহাস" নামক বিরাট গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ চীনমণ্ডল যখন নানা খণ্ড চীনে বিভক্ত, ভারতবর্ষ তখন দিগ্‌বিজয়ী হিন্দু নেপোলিয়ানগণের অধীনতায় ঐক্যবদ্ধ। এই সময়ে রোমাণ সাম্রাজ্য গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় বিক্রমাদিত্যগণের সমান নামডাক এই যুগে দুনিয়ার কোন নরপতির ছিল না। মৌর্য্য আমলে প্রথমবার ভারতবর্ষের এই মর্য্যাদা হইয়াছিল—আবার গুপ্ত আমলেও হিন্দুগণ সেই গৌরবের অধিকারী হইল। পাটলিপুত্র এই দুই যুগেই জগতের শীর্ষস্থানীয় নগর। কনষ্টাণ্টিনোপলে জাষ্টিনিয়ানের আমলে প্রাচ্য য়ুরোপের গৌরব বাড়িয়াছিল—কিন্তু তখনও গুপ্ত সম্রাট্‌গণের কীর্ত্তি লুপ্ত হয় নাই। বরং শক-বিজয়ী এবং হূণ-বিজয়ী ভারতীয় রাজগণ নূতন উদ্যমে রাষ্ট্র গঠন করিতে তৎপর ছিলেন। প্রাচীনকালের ইতিহাসে পাটলিপুত্র সত্য-সত্যই এক "ইটার্ন্যাল সিটি" বা অমর নগর।

তৃতীয়তঃ, এই যুগে তাতার-প্রভাবে সমগ্র এশিয়ার ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন নামে তাতারজাতীয় লোকেরা চীন, মধ্য-এশিয়া, ভারতবর্ষ, পারস্য, ইত্যাদি দেশে বসতি ও উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের রক্তসংমিশ্রণ বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছিল। তাহারা ধর্ম্ম, সাহিত্য, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব কিছু আনে নাই। চীনে তাহারা চীনা হইয়াছিল—ভারতে তাহারা হিন্দুস্থানী হইয়াছিল। কিন্তু রক্তের প্রভাবে সমগ্র তাতার-মণ্ডলে নানা ক্ষেত্রে লেন-দেন, বিনিময় ও আদান-প্রদান সহজসাধ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান-কালে এশিয়াবাসীদিগের মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঐক্যের মূল অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইলে, এশিয়ায় মোগল-

প্রভাব ধরা পড়িবে। মৌর্য্যবংশের ধ্বংসের পর হইতে প্রায় এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে শক, কুষাণ ও হূনজাতীয় লোকের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে ;—তাহারা হিন্দু, বৌদ্ধ, সৌর, শাক্তদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সেইরূপ চীনেও হ্যান্ সম্রাট্‌গণের আমল হইতে মাৎস্যন্যায়ের যুগের অবসান পর্য্যন্ত, হূণ-আক্রমণ অথবা হূণরাজ্য-স্থাপন বন্ধ হয় নাই। হূণেরা চীনাদের আবেষ্টনে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়াছে, কনফিউশিয় হইয়াছে, তাও-ধর্ম্মী হইয়াছে। কিন্তু তাওপন্থী চীনা তাতারের জীবনে এবং সৌরপন্থী হিন্দু তাতারের জীবনে অনেক সাম্য আছে।

চতুর্থতঃ, এই যুগে ভারতের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মুখ্যতঃ, ধর্ম্মের ব্যাপারীরাই আসা-যাওয়া করিতেন। বীল্ (Beal) প্রণীত "Buddhist Literature in China" অর্থাৎ "চীনের বৌদ্ধ সাহিত্য" গ্রন্থে এইরূপ কয়েকজনের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে গৌণভাবে অন্যান্য বিষয়েরও আদান-প্রদান এই দুই জাতির মধ্যে যথেষ্টই হইয়াছিল। ভারত-প্রভাব মৌর্য্য আমলে পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে ; কুষাণ আমলে মধ্য-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে ; গুপ্ত আমলে চীনে বা পূর্ব্ব-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

পঞ্চমতঃ, চীনে যাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলা হয়—তাহা শাক্যসিংহ-প্রচারিত নির্ব্বাণ নয়—তাহা অশোক প্রতিষ্ঠিত "ধর্ম্ম"ও নয়। উহা বর্ত্তমান ভারতের তথাকথিত "হিন্দু" নামক ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই উনিশ-বিশ মাত্র। সেই বৌদ্ধধর্ম্মের সাহিত্য সংস্কৃতে লিখিত, 'পালি'তে নয়। এই ধর্ম্মের "বুদ্ধ" একজন দেবতা—ধর্ম্মপ্রচারক মানুষ ন'ন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিকগণের সুপরিচিত। প্রতিমা-পূজা তাহার বিশেষ লক্ষণ। এই ধর্ম্ম হিন্দু-তাতার নরপতি

কণিকের আমলে তাতার-মণ্ডলের প্রধান কেন্দ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই কেন্দ্র হইতেই উহা মধ্য-এশিয়ার কেন্দ্রে-কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়াছিল। মধ্য-এশিয়া হইতে হ্যান্-সম্রাট মিংতি এই মাল চীনে আমদানি করেন। হ্যান্ আমলের পর তাতার সম্রাটগণই বিশেষভাবে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত হইতে নব শক্তি লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম তাতার-মুলুকে উৎপন্ন হইয়া তাতারমণ্ডলে প্রসার লাভ করিয়াছে—সাধারণভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে।

তাঙ ও সুঙ আমল।

মাৎস্য-ন্যায় নিবারিত হইল। শি-হোয়াংতি এবং হান্-উতির গৌরবযুগ ফিরিয়া আসিল। সমগ্র চীনমণ্ডল অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইল।

(১) সুই (Suy) বংশ (৫৮৯-৬১৯)। এই বংশের প্রবর্ত্তক 'উতি' অর্থাৎ দিগ্‌বিজয়ী বা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। এই আমলে চীনে নাকি ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। একমাত্র এই তথ্য হইতেই হিন্দু প্রভাবের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। এই আমলে দক্ষিণে আনাম ও টংকিন এবং উত্তর পূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত চীনের সেনা প্রেরিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এই আমলে পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত-সাম্রাজের উত্তরাধিকারিগণ লুপ্ত-কীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে যত্নবান্। তাঁহাদের মধ্যে শশাঙ্ক অন্যতম।

শেষ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জের এক নূতন বংশ ধীরে-ধীরে মাথা তুলিতে সমর্থ হইলেন। হুন-বিজয়ী বৰ্দ্ধন-বীরের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তে এখন একরাট্ (৬০৬)। দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। দক্ষিণ অঞ্চলে ৬২০ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের পর হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্ত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলেন।

এদিকে আরবে মহম্মদের জন্ম হইয়াছে (৫৭০)। এক্ষণে এই যুগপ্রবর্ত্তক বীরবর যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতল নূতন করিয়া গড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মুসলমানদিগের দিগ্‌বিজয় শীঘ্রই সুরু হইবে। আর, জাপানে শোতোকু তাইশি (৫৭৩-৬২১) চীনা ও ভারতীয় মাল আমদানি করিতেছেন। জাপানী সভ্যতার জন্ম হইল।

এখন ইয়োরোপে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং ইংলণ্ডেই সাত-সাতটা স্বাধীন রাজ্য। ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, স্কাণ্ডিনাভিয়া ইত্যাদি জনপদে নিত্যনূতন পরিবর্ত্তন, আর মধ্য-ইয়োরোপের বর্ব্বরমণ্ডল ত সকল প্রকার ঝটিকার কেন্দ্র। অধিকন্তু কনষ্টাণ্টিনোপলের জাষ্টিনিয়ান-স্থাপিত সাম্রাজ্যও এই সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র এশিয়াতেই সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক বিরাট কাণ্ডের আয়োজন চলিতেছে—ইয়োরোপের এখন ঘোর অমানিশা বা "ডার্ক এজ"। পূর্ব্বেও কয়েকবার দেখা গিয়াছে যে, এশিয়া ইউরোপের আগে-আগে চলে।

---

(২) তাঙ্ (৬১৮-৯০৫) বংশ

এই বংশের নাম ও বৃত্তান্ত না জানিলে চীনের কথা জানা হইল না। তিন শতাব্দী ধরিয়া এই বংশের রাজত্বকাল,—কিন্তু যথার্থ ক্ষমতাবান্ চীনেশ্বরের সংখ্যা অতি অল্প। পৃথিবীর সকল নেপোলিয়ান-বংশেরই এই অবস্থা। দুই পুরুষ বা তিন পুরুষের অধিককাল কোন বংশে নামজাদা লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। একজন নেপোলিয়নের পর দশজন রামা-শ্যামার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই চীনা বিক্রমাদিত্যগণের বংশেও দু-একজনের বেশী বিক্রমাদিত্য জন্মেন নাই। তাঙবংশে একুশ জন সম্রাট্ হন—তাঁহাদের অধিকাংশই দুর্ব্বল ও নগণ্য ছিলেন। অশান্তি এবং অন্তর্ব্বিদ্রোহ ও শত্রুর আক্রমণ চীনে প্রায়ই দেখা দিত। অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রিবর্গ অথবা কর্ম্মচারিগণ কিংবা সেনাপতিরা সম্রাটের উপর কর্তৃত্ব করিতেন।

সর্ব্বপ্রসিদ্ধ তাঙ্ সম্রাটের নাম তাই-চুঙ্ (Tai Tsung)। ৬২৭ হইতে ৬৫০ পর্য্যন্ত তাই-চুঙের রাজত্বকাল। সমগ্র চীন-মণ্ডল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। তিনি চীনের বাহিরে একটা "বৃহত্তর চীন" গঠনেরও প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার বাহুবলে মধ্যএশিয়া চীনের অধীন হয়। কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে পারশ্য, দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও হিমাচল, উত্তরে সাইবিরিয়া এবং পূর্ব্বে মহাসাগর তাই-চুঙের সাম্রাজ্যসীমা। কোড়িয়া দখল করিবার জন্য তিনি সেনা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোড়ীয়া চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

শিহোয়োংতি চীনের আধখানা পাইয়াই চীনেশ্বর হইয়াছিলেন। চীনা-দাক্ষিণাত্যে তাঁহার আদেশ স্বীকৃত হইত কি না, জানা যায় না।

হ্যান আমলে চীনা-দক্ষিণাত্য বোধ হয় চীনা-আর্য্যাবর্ত্তের সামিল হয়। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান চীনের সকল প্রদেশেই মোটের উপর চীন-মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, বলা চলিতে পারে। মাৎস্যন্যায়ের যুগে এই জনপদে অনেকগুলি স্বস্বপ্রধান রাষ্ট্র ছিল সত্য,—কিন্তু বর্ত্তমান চীনের কোন অংশই তখন চীনা-সভ্যতার বাহিরে ছিল না। তবে দক্ষিণ অঞ্চলের পার্ব্বত্য-প্রদেশের অধিবাসিগণ পূরাপুরি চীনা হইতে পারে নাই;—বস্তুতঃ আজও তাহারা সম্পূর্ণ চীনা নয়।

তাই-চুঙের আমলে চীন-মণ্ডল'ত ঐক্যবদ্ধ হইলই—অধিকন্তু একটা বৃহত্তর-চীনও গড়িয়া উঠিল। চীন-সাম্রাজ্য বলিলে আমরা বর্ত্তমান কালে চীনমণ্ডলের বহির্ভূত তিব্বত, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং কোরীয়া এই পাঁচ প্রদেশও চীনের সামিল করিয়া থাকি। সেই চীন-সাম্রাজ্য তাই-চুঙের পূর্ব্বে কখনও ছিল না। তাঁহার বাহুবলেই চীন-সাম্রাজ্য প্রথম স্থাপিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কোড়ীয়া দখল হইলে, আজকালকার চীন-সাম্রাজ্য সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ হইল। তাঙ্-আমলের ইহাই প্রথম গৌরব। তাঙ্-যুগের আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। চীনে সভ্যতার ধারা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে নামিয়া আসিয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ব্ব-অঞ্চল পশ্চিমের রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলকে চীনা করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। তাঙ্ যুগে সমুদ্রকূলের কোয়াংটুঙ্ প্রদেশ চীনের অন্তরতম চীনে পরিণত হইল। দক্ষিণের লোকেরা উত্তরের আদর্শ ও রীতিনীতি অনুসারে জীবনগঠন করিতে সুরু করিল; এমন কি তাহারা তাঙ্-সন্তান বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিত।

ভারতবাসীর পক্ষে তাই-চুঙ্ পরিব্রাজক যুয়ান-চোয়াঙের আশ্রয়-

দাতা ও সংরক্ষক বলিয়া চিরস্মরণীয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে ভারতে আসেন। তখন তাই চুঙের রাজ্যত্বকাল আরম্ভ হইয়াছে। ১৬ বৎসর পরে য়ুয়ান্ দেশে ফিরিয়া যান। তখন চীনের নেপোলিয়ান নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কার্য্যে লিপ্ত। য়ুয়ান্ মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতে আসিয়াছিলেন,—এই পথেই আবার ফিরিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মধ্য-এশিয়া তখন বৃহত্তর চীনেরই অংশমাত্র,—কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার হিসাবে মধ্য এশিয়া তখনও "বৃহত্তর ভারতের" অন্যতম কেন্দ্র।

তাঙ্ আমল ভারতবাসীরও গৌরব-যুগ। মৌর্য্য-ভারত ও গুপ্ত-ভারত আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাই-চুঙের সম-সাময়িক দুইজন হিন্দু নেপোলিয়ানের কথা য়ুয়ান-চোয়াঙ্ চীনদিগকে জানাইয়াছিলেন। কারণ তিনি দুইজনেরই রাজ-অতিথি ছিলেন। আর্য্যবর্ত্তের হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৪৭) এবং দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৮-৫৫) ভারতের তাই-চুঙ্। এসিয়ায় একসঙ্গে তিন জন নেপোলিয়ানের অভ্যুদয় হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

তাহার পর তাই-চুঙের বংশধরগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন—ভারতবর্ষে নব নব বংশে নব নব নেপোলিয়ানের জন্ম হইতেছিল। এই সময়ে ভারতীয় সমাজেরি পরদায়-পরদায় হিন্দুপ্রভাবান্বিত তাতার জাতির অস্থিমজ্জা মিশ্রিত ছিল। কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতিহার বংশ ৮১৬ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশের সন্তানগণ আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঙ্-যুগের মধ্যে সম্রাট মিহিরভোজ (৮৪০-৯০) গুর্জ্জর-বংশের তাই-চুঙ্ পদবাচ্য হন। আর এই যুগেই প্রাচ্য ভারতের বরেন্দ্রমণ্ডলে বাঙ্গালী তাই-চুঙ্ বা নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই নেপোলিয়ান বংশের নাম

পালবংশ (৭৩০-১১৭৫)। তাঙ্ আমলের মধ্যে ধর্ম্মপাল এবং দেবপাল ৭৮০ হইতে ৮৯২ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে বঙ্গ-মণ্ডল স্থাপন করিয়াছিলেন। কবি সুব্রত চক্রবর্ত্তীর বচন উদ্ধৃত করিয়া সেই 'বৃহত্তর বঙ্গের' পরিচয় দিতেছি :—

"অবন্তি ভোজগুর্জ্জর কীর বার্য্যে যাহার নমিতশির,
মাৎস্যন্যায়ের কণ্টক যেবা উপাড়িল বলে ধরিত্রীর ;
কান্যকুব্জে খণ্ডিতারাতি স্থাপিল যে পুনঃ সিংহাসন ;
কাশ্মীরে রামস্বামীর ধ্বংস করেছে যাহার পুত্রগণ,
হৈহয় আর রাঠোর ধন্য কন্যা যাহারে করিয়া দান ;
সে বীরমাতার"—

প্রভাব-মণ্ডলে হিন্দুস্থানের নরনারীগণ চীনা তাঙ্-যুগে জীবনযাপন করিত।

জাপানে তাই-চুঙের আমলে নারা নগরীতে চীনা ও হিন্দুসভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইতেছিল (৭১০-৯৪)। পরবর্ত্তীকালে জাপানের রাষ্ট্রকেন্দ্র কিয়োতো নগরে স্থানান্তরিত হয়। সেইখানেও জাপানীরা ভারতীয় ও কন্‌ফিউশিয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিল। জাপান প্রথম হইতেই ভারত ও চীনের শিষ্য। দুই দেশের সকল উৎকর্ষই জাপানী-সমাজে পুঞ্জীকৃত। ক্ষুদ্র জাপানে তাঙ-যুগে রাষ্ট্রীয়-গৌরব বিশেষ কিছু নাই। জমিদারেরা লাঠালাঠি করিতেছে—মিকাদোর ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে জাপান এশিয়ার "জের" মাত্র।

এদিকে পশ্চিম-এশিয়ায় মহম্মদ দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়। তখন তাই-চুঙ, হর্ষবর্দ্ধন এবং পুলকেশীর গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন-গগনে অবস্থিত। কিন্তু মহম্মদের

মৃত্যুতে মহম্মদের গৌরব কিছুমাত্র কমিল না। বরং সত্তর আশী বৎসরের ভিতর আরব, পারস্য, সীরিয়া, মিশর, আফ্রিকার উত্তর কূল এবং স্পেনে পর্য্যন্ত মহম্মদের নাম প্রচারিত হইল। অষ্টম শতাব্দের প্রথম ভাগেই (৭১২) এক বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য এশিয়াবাসীর কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং ইয়োরোপীয়ানের আতঙ্কস্থল হইয়া পড়িল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে একটা ভাঙ্গিয়া তিনটা স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র দাঁড়াইয়া গেল। এশিয়ার মুসলমানসাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইল বাগদাদ (৭৪৯)। ইয়োরোপে মুসলমান-সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইল কর্ডোভা (৭৫৬)। আফ্রিকায় মুসলমান কেন্দ্র হইল কাইরো (৭৮৫)। মুসলমান সাম্রাজের অধীশ্বরগণ "খলিফা" নামে পরিচিত। নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে হারুণ আল্‌রশিদ বাগ্‌দাদের জগদ্বিখ্যাত খলিফা। তাঁহাকে মুসলমানদিগের বিক্রমাদিত্য বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাঁহার সমসাময়িক ভারতবীরের নাম বঙ্গের ধর্ম্মপাল।

তাঙ্‌-যুগের মধ্যে (৬১৮-৯০৫) মুসলমানেরা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত হম্লা চালাইয়াছেন। মুসলমান জাহাজ ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। চীনের বন্দরে-বন্দরে মস্‌জিদ মাথা তুলিয়াছে। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনে প্রথম মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। উহা আজও দণ্ডায়মান। প্রসিদ্ধ চীনা সহরে মুসলমান-পাড়া বেশ জমকাল ভাবে দেখা দিয়াছে। ভারত-মহাসাগরের বাণিজ্যে মুসলমান জাতি এক্ষণে বোধ হয় অগ্রণী। এদিকে মধ্য এশিয়ার হিন্দুমণ্ডলও লুপ্ত হইয়াছে—স্থলপথে চীনের সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গেল। চীনের রাজধানীতে অসংখ্য খৃষ্টান এবং জারাথুষ্ট্রপন্থী পার্শী ইস্‌লামের আক্রমণ হইতে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। সমগ্র এশিয়ায় ভূমিকম্প উৎপন্ন হইল। ইতিপূর্ব্বে ইয়োরোপে ত ধূমকেতু উদিতই হইয়াছে।

ইয়োরোপে এতদিন অমানিশা ছিল; সর্ব্বত্রই মাৎস্যন্যায় অথবা বর্ব্বরগণের আক্রমণ। তাহার উপর মুসলমান উৎপাত আসিয়া জুটিল। ইয়োরোপের সীমানা কমিতে থাকিল—মুসলমান-প্রভাবে ইয়োরোপের বুকের ভিতর এশিয়ার সীমানা বাড়িতে লাগিল।

কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটগণ প্রথমেই মুসলমানদিগের ধাক্কা খাইতে বাধ্য হইলেন—একে একে পরাজয়-স্বীকার করিতে লাগিলেন। ৭১৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা কনষ্টান্টিনোপল দখল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে উদ্যম সফল হয় নাই। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সাত শতাব্দীরও অধিক পরে রুম মুসলমানের দখলে আসিয়াছে।

অপর দিকে খাঁটি ইয়োরোপে একমাত্র ফরাসীরাজ নামজাদা হইয়াছেন। তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত শার্ল্যমান (৭৬৮-৮১৪)। ইনি হারুণ আল্‌রসিদ এবং ধর্ম্মপালের সমসাময়িক। ইঁহাকে নেপোলিয়ন, তাই-চুঙ্ বা বিক্রমাদিত্যের গৌরব প্রদান করা হইয়া থাকে। শার্ল্য-ম্যানের বড় সাধ, তিনি একবার ট্রাজানের সিংহাসনে বসিবেন—একবার "রোমেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" রূপে অভিনন্দিত হইবেন। অতবড় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তবে আজকালকার গোটা ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইটজর্ল্যাণ্ড, গোটা জার্ম্মানি এবং আধখানা ইতালী তাঁহার বশে আসিয়াছিল। ইহাকেই তিনি ফরাসী 'রোমান সাম্রাজ্য' বিবেচনা করিতেন। তাঁহাকে মুসলমানের সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেই ইয়োরোপের পোড়া কপালে আবার মাৎস্যন্যায় আসিয়া জুটিল। তাঙ্ আমলের শেষভাগে ইংলাণ্ডে সবেমাত্র ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) মাৎস্যন্যায়ের দ্বিতীয় যুগে (৯০৭-৬০)

বংশপঞ্চক

চীনে এখন আর একবার "ষ্টেট্ অব্ নেচার" বা অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় উপস্থিত। তাঙ-যুগের পরেই বহুসংখ্যক খণ্ড-চীন। এই যুগে তাতারেরা বারবার উত্তর-চীনে দৌরাত্ম্য করিতেছে। তাহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে সম্রাট্গণ অসমর্থ। সম্রাটেরা অতি দুর্ব্বল; সেনাপতিগণের অঙ্গুলিসঙ্কেতে উঠিতেছেন, বসিতেছেন। আর সাম্রাজ্যের একতিয়ার মাত্র ইয়াংসির উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার দক্ষিণের নবাবেরা রাজধানীতে কোন সংবাদ পাঠান না। অর্দ্ধশতাব্দীকালের মধ্যে নামে মাত্র চীনসম্রাট হইবার জন্যই পাঁচটা বংশ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিলেন।

(ক) অর্ব্বাচীন-লিয়াঙ্ বংশ (৯০৭-২৩)।

(খ) অর্ব্বাচীন-তাঙ্ বংশ (৯২৩-৩৬)।

(গ) অর্ব্বাচীন-চীন বংশ (৯৩৬-৪৬)।

এই বংশের প্রবর্ত্তক অর্ব্বাচীন-তাঙ্ বংশ ধ্বংস করিবার সময়ে তাতারগণের সাহায্য লইয়াছিলেন। সাহায্যের মূল্য স্বরূপ তিনি রাজা হইবার পর তাতারদিগকে রাজ্যের কিয়দংশ দান করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু তাতারেরা তাঁহার নিকট কিছু বার্ষিক করও আদায় করে। এইরূপ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া, চীনা-সমাজে তিনি নিকৃষ্ট জঘন্য নরপতিরূপে আজও নিন্দিত হইয়া থাকেন।

(ঘ) অর্ব্বাচীন-হ্যান্ বংশ (৯৪৭-৫১)

(ঙ) অর্ব্বাচীন-চাও বংশ (৯৫১-৬০)

এই যুগে আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম পাল-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাতার বা মঙ্গোলিয় তিব্বতী জাতি বরেন্দ্র দখল করিয়াছে। গুর্জ্জর প্রতিহার বংশের গৌরব কমিতেছে। দাক্ষিণাত্যের নরপতিগণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন। পশ্চিমপ্রান্তে মুসলমান-বিজয় সুরু হইয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষেও দশমশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ মাৎস্যন্যায়েরই যুগ।

এদিকে মুসলমান কেন্দ্রের সর্ব্বত্রই ভাঙ্গন লাগিয়াছে। এক-রাষ্ট্রের স্থানে চারি রাষ্ট্র দেখা দিতেছে। কিন্তু স্পেনের মুসলমান খলিফা এক্ষণে খুব প্রবল। তাঁহার নাম তৃতীয় আবদুল রহমাণ (৯১২-৬১)। খাস ইয়োরোপে এই সময়ে একজন জার্ম্মাণ নরপতি ফরাসী শার্লাম্যানের দৃষ্টান্তে একটা সাম্রাজ্য গড়িতেছেন। তাঁহার নাম প্রথম অটো। অটোর (৯৩৬-৭৩) সাম্রাজ্যের নাম জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য। ট্রাজানের ত্রিভুবনব্যাপী সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিবার সাধ সকলেরই! ভারতীয় 'বত্রিশ সিংহাসনের'র কাহিনী মনে পড়ে।

(৪) সুঙ্-বংশ (৯৬০-১১৭৯)

তাঙ্-বংশের সমর-গৌরব ও রাষ্ট্র-গৌরব ছিল। কিন্তু সুঙ্-বংশের গৌরব প্রধানতঃ সাহিত্যে, দর্শনে ও শিল্পে। সুঙ্-বংশে নেপোলিয়ান বা নেপোলিয়ান-কল্প কোন সম্রাট্ জন্মেন নাই। বস্তুতঃ চীনা সভ্যতার চরম বিকাশ চীনাদের অতি দুঃসময়ে দেখা দিয়াছিল। চীনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লোপ এবং চীনা প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি সমসাময়িক!

(ক) অখণ্ড চীনে সুঙ্-রাজত্ব (৯৬০-১১২৭)।

দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ব্বত্র শান্তি এবং শৃঙ্খলা ছিল। কিন্তু উত্তরে তাতার-উপদ্রবে সম্রাটেরা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য চীনেশ্বরগণ নিন্দাজনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন এবং বার্ষিক কর দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে তাতার-জাতীয় দুই বংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। একবংশ মোগল, অপর বংশ মাঞ্চু। মোগল তাতারদিগের সঙ্গে চীনাদের পরিচয় আজ নূতন নয়। মাঞ্চুরাই চীনের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে নূতন উৎপাত দাঁড়াইল। একজন সম্রাট্ মাঞ্চুদিগকে মোগলের বিরুদ্ধে লড়াইবার ফন্দি করিলেন। তাহাতে মোগলেরা হারিল বটে—কিন্তু মাঞ্চু-তাতা-রেরা চীন সম্রাট্‌কে পাইয়া বসিল। চীন সম্রাট্ সত্যসত্যই "catch a Tartar" বা "হাম্ কমলি ছোড় দিয়া, লেকিন কমলি হাম্‌কো নেহি ছোড়তা" অবস্থায় পড়িলেন। ভারতের রাণা সংগ্রামসিংহও একবার এইরূপে তাতার-প্রেমে মজিয়াছিলেন। তাতারের পাল্লায় পড়িয়া উদ্ধার পাওয়া কঠিন। চীনের "আর্য্যাবর্ত্ত" মাঞ্চুদের দখলে আসিল। ১১২৭ হইতে ১২৪১ পর্য্যন্ত মাঞ্চুরা কর্ত্তৃত্ব করিলেন। সুঙ্‌রা ইয়াংসির দক্ষিণে বসবাস করিতে বাধ্য হইলেন।

এইআমলের দুইজন চীনা-রাষ্ট্রবীর সুপ্রসিদ্ধ। একজনের নাম ওয়াঙ-আন্-শি (১০২১-১০৮৬)। অপর জনের নাম ছি-মা-কিয়াঙ (১০১৯-৮৬)। এই দুইজনে সর্ব্বদা আড়াআড়ি চলিত। ছি (Sze) পুরাতন-পন্থী ছিলেন—আর ওয়াঙ্ (Wang) ছিলেন নব্যতন্ত্রের প্রবর্ত্তক। ছি মান্ধাতার আমলের কন্‌ফিউশিয়-সংহিতার সূত্র আওড়াইয়া রাষ্ট্র-শাসন করিতে চাহিলেন। ওয়াঙ্ একদম নূতন প্রণালী চালাইতে চাহিলেন। ওয়াঙ্ কয়েক বৎসরের জন্য তাঁহার মত কার্য্যক্ষেত্রে

প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ছি একজন সুকবি ছিলেন—তাঁহার প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ।

এই সময়ে প্রাচ্যভারতে প্রথম মহীপাল (৯৮০-১০২৬) দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে পাহাড়ী কাম্বোজ বা তাতারবংশ ধ্বংস করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। প্রাচ্য-ভারতের স্বাধীনতা টিকিয়া গেল—কিন্তু ইতিমধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ মুসলমানের অধিকারে আসিয়াছে। এই যুগে দাক্ষিণাত্যের চোল-বংশীয় রাজ রাজ (৯৮৫-১০১৮) এবং রাজেন্দ্র (১০১৮-৩৫) ভারতের নেপোলিয়ান-কল্প সম্রাট্। তাঁহাদিগের নৌশক্তি অতিশয় প্রবল ছিল।

দক্ষিণে চোল-সাম্রাজ্য ৯০০ হইতে ১৩০০ পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে থাকিল। এদিকে প্রাচ্যভারতে পালের গৌরব লুপ্ত করিয়া সেনবংশ মাথা তুলিল। মাঞ্চুরা যখন সুঙ্-সম্রাট্গণকে ইয়াংসির দক্ষিণে পলাইতে বাধ্য করে, তখন রণকুশল বিজয়সেনের (১০৬০-১১০৮) বঙ্গসাম্রাজ্যে পরাক্রান্ত লক্ষ্মণসেন উপবিষ্ট (১১২০-৭০)। বিজয়সেন বাঙ্গালীর শেষ সমুদ্রগুপ্ত, আর লক্ষ্মণসেন শেষ বিক্রমাদিত্য।

এই যুগে মুসলমান জাতির বিজয়গৌরব কিছুমাত্র কমে নাই—বরং এশিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু বহুসংখ্যক স্ব-স্বপ্রধান রাষ্ট্র মুসলমান-মণ্ডলে উৎপন্ন হইতেছে। মুসলমানেরা মাৎস্যন্যায়ের কুফলে ভুগিতেছেন। ইয়োরোপের সকল জাতীয় খৃষ্টান মিলিত হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে একবার ধর্ম্মযুদ্ধে ব্রতী হইলেন (১০৯৫)। তাহাতে খৃষ্টানদিগের জয় হইল।

এদিকে ইংলণ্ড ফরাসী নরমানজাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছে (১০৬৬)। জার্ম্মাণ—"রোমাণ" সাম্রাজ্য চলিতেছে। ইতালীর লোকেরা জার্ম্মাণ-সম্রাট্গণের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। রোমের ধর্ম্মযাজক পোপের সঙ্গে জার্ম্মাণ-সম্রাটের কলহ উপস্থিত হইয়াছে।

ফলতঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই স্বাধীনতা নাই—এবং চিরস্মরণীয় নেপোলিয়ান-কল্প ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। দুনিয়া ভরিয়াই মাৎস্যন্যায় চলিতেছে বলিলেও দোষ হইবে না।

(খ) দক্ষিণ সুঙ্ (১১২৭-১২৭৯)।

সুঙরা প্রথমে নানকিঙে রাজধানী প্রবর্ত্তন করেন। পরে আরও দক্ষিণে হ্যাঙচাওয়ে রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। এদিকে চীনের আর্য্যাবর্ত্তে মঞ্চুরা বারবার মোগল আক্রমণ ভোগ করিতেছেন তাহাদের রাজধানী বর্ত্তমান পিকিঙের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। মোগল দলপতি চেঙ্গিজ খাঁ উত্তর চীন বিধ্বস্ত করিলেন। (১২১১-২৭)। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরা মোগল কর্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তাহার পর মোগলেরা চীনা-দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিল। ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে কুবলা খাঁ মোগল দলপতি হন। সুঙেরা কোন মতেই মোগলের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। হটিতে-হটিতে সাম্রাজ্যের দক্ষিণতম সীমায় উপস্থিত হইলেন। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে সুঙ্ বীরগণের শেষ যুদ্ধ হয়। স্বদেশরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সেনাপতি লু-সিন-ফু (Lu-Sin-fun) স্বকীয় পুত্রকলত্রের আত্মহত্যায় সাহায্য করিলেন—অবশেষে শিশু-সম্রাট্কে কোলে করিয়া সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া মরিলেন। ভারতীয় রাজপুত বীরগণের আদর্শেই চীনা স্বদেশসেবকগণও অসিধারণ করিলেন।

এই যুগে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানের অধীন। দক্ষিণ ভারতে মুসলমান-প্রতাপ অগ্রসর হইতেছে। ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে পোপের সঙ্গে জার্ম্মাণ-সম্রাটের লড়াই (১০৫৬—১২৫৪) প্রধান ঘটনা। তুর্কীরা কন্‌ষ্টান্টিনোপলের সম্রাট্‌কে বিব্রত করিতেছে। বিলাতে স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সের সঙ্গে লড়াই চলিতেছে। এদিকে মোগল বা তাতারবংশের প্রভাবে সমগ্র রুশিয়া কুব্‌লা খাঁর পদানত। বৌদ্ধ মোগল আমলে চীনারা পরাধীন—কিন্তু এই সময়ে "বৃহত্তর এশিয়ার" প্রতাপ ইয়োরোপখণ্ডে বিরাজমান। এশিয়ার বিস্তার-সাধনই গোটা মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রধান কথা।

এতদিন মুসলমানেরা দক্ষিণ দিক হইতে ইয়োরোপের চৌহদ্দি সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার বৌদ্ধমোগলেরা পূর্ব্বদিক হইতে ইয়োরোপের ভিতর এশিয়ার সীমানা লইয়া গেল। বস্তুতঃ তুর্কী-দিগের কন্‌ষ্টান্টিনোপল দখলের (১৪৫৩) পর একশত বৎসর পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়েরা, সর্ব্বদা এশিয়াবাসীর ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিত।

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সর্ব্বসমেত সাতবার খৃষ্টা-নেরা মুসলমানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধ বা 'ক্রুজেড্'গুলির বৃত্তান্ত হইতেই বুঝা যায় যে ইয়োরোপীয় নরনারী এশিয়াবাসীর আক্রমণ হইতে কোনমতে আত্মরক্ষার জন্য যারপর নাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। এশিয়া আক্রমণ করে, ইয়োরোপ আত্মরক্ষা করে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য এইরূপ।

চীনাদের ইতিহাস-সাহিত্য।

ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস-গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, তামিল, হিন্দী, মারাঠি, বাঙ্গালা ইত্যাদি কোন ভাষায়ই বোধ হয় খাঁটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ইহা ভারতবাসীর কলঙ্ক। দুনিয়ার যাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানের খতিয়ান করিয়া থাকেন তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এই কলঙ্ক কখনই মাফ করিবেন না। দুনিয়ার সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই বর্ত্তমান ভারতের সন্তানগণ মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে বাধ্য হন। প্রাচীন সাহিত্যের তরফ হইতে ইতিহাস শাখার কথা উঠিবামাত্র আমরা ঘাড় গুঁজিয়া বসিতে বাধ্য।

হিন্দু সমাজে রাজরাজড়া ছিল—রাষ্ট্রশাসন ছিল—যুদ্ধব্যবসা ছিল রক্তারক্তি ছিল—জয় পরাজয় ছিল—দেশলুণ্ঠন ছিল। হিন্দুসমাজে বড় বড় সেনাপতি জন্মিয়াছেন—নামজাদা মন্ত্রী জন্মিয়াছেন, প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী জন্মিয়াছেন। শার্ল্যমান, পিটার, ফ্রেডারিক, নেপোলিয়ান বিসমার্ক, কাভুর ইত্যাদির সমান রাষ্ট্রবীর ও রণবীর ভারতমাতা প্রত্যেক পঞ্চাশ বৎসরে অন্ততঃ একজন করিয়া প্রসব করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কৌটিল্য, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন, ধর্ম্মপাল, দর্ভপানি সোমেশ্বর, বিজয়সেন, রাজেন্দ্র চোল কুলোত্তুঙ্গ ইত্যাদি করিত-কর্ম্মা লোক ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রান্তে গণ্ডা গণ্ডা জন্মিয়াছেন। তাঁহারা কি "নির্ব্বিকার" চিত্তে দেশ জয় করিতে সমর্থ হইতেন? রক্তগঙ্গা বহাইবার সময়ে এই সকল বীরগণ কি "অহিংসার" দোহাই দিতেন? তাঁহাদের কি জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার সাধ

ছিল না? যাঁহারা সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য চাহিতেন তাঁহারা মানব-সমাজে অমর হইতে চাহিবেন না কি?

অথচ আমরা সেই সকল দেশজয় ও নগরলুণ্ঠনের কোন কথা ভারতীয় সাহিত্যে পাই না। "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং" যাহারা ভোগ করিলেন তাঁহাদের সেনাপতিগণের নাম পর্য্যন্ত জানি না। হাজার বার ভারতভূমিতে রক্তগঙ্গা বহিয়াছে, কিন্তু কোনবারকার বৃত্তান্তই ভারতবাসীর চিন্তায় স্থান পাইল না। প্রবলপ্রতাপ হিন্দু নেপোলিয়ানগণের রাজদরবার হইতে একখানাও বার্ষিক বা অন্য কোন প্রকার রিপোর্ট বাহির হইল না! রক্ত মাংসের মানুষ একথা বিশ্বাস করিতে পারে না। আমি শত্রু ধ্বংস করিবার জন্য দিনরাত নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতেছি। ঢাক ঢোল পিটাইয়া লক্ষ লক্ষ ফৌজ লইয়া হাজার হাজার শত্রুর কেল্লা ফতে করিতেছি। বড় বড় শত্রুর মাথা সম্মুখে আনাইয়া হয়ত আনন্দে নৃত্যও করিতেছি। নূতন দেশ দখল করিয়া নিজের আইন, মুদ্রা ও বিচারব্যবস্থা সর্ব্বত্র জারি করিতেছি। সকল উপায়ে নিজের নাম এবং নিজ রাজধানী ও পিতৃভূমির নাম জগতে জাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তা উপায় ভুলিয়া গেলাম! অগণিত তলোয়ারের খোঁচা মারিতে আমি সুপটু—আর দুইচারিদশ গণ্ডা লেখকের কলমের খোঁচার মূল্য আমি বুঝি না! আমার প্রজারা নিজে গায়ে পড়িয়া হয়ত আমার দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী না লিখিতে পারে। কিন্তু কয়েকজন চাটুকার কবি জুটান কি আমার পক্ষে কঠিন? তাহা ছাড়া, আমার আফিসের দলিলগুলিতে আমার বাহবা লিখাইতে আমি ভুলিয়া যাইব কি? কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে হিন্দুস্থানের সার্লম্যান, ফ্রেডারিক, বিসমার্কগণ এইরূপ

বেকুবিই করিয়াছেন। এই ধরণের বেকুবি নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগলের সাজে। কিন্তু ভারতীয় নেপোলিয়ানগণকে পাগল বেকুব বা কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে সাধ্য কার?

তাহা হইলে ভারতীয় ইতিহাস-সাহিত্য কোথায় গেল? রাজাদিগকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য যে সমুদয় কবি-প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল সে গুলি কোথায় গেল? আর রাজদরবারে অন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত পণ্ডিতেরাই দিগ্‌বিজয়ের একমাত্র কাহিনীলেখক হইতেন—এরূপ ভাবিবারও বিশেষ কোন কারণ নাই। দুই হাজার বৎসরের মধ্যে অনেক পণ্ডিতেরা স্বাধীনভাবে রাজ-কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইটুকু বিশ্বাস করিতে বেশী কল্পনা আবশ্যক হয় না। কবিপ্রশস্তি, চাটুকারের বচন এবং রাজদরবারের সরকারী ইস্তাহার ছাড়াও জনগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত ইতিহাসরচনা প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা চলিতে পারে। রক্ত মাংসের মানুষ গৌরব চায়, কীর্ত্তি চায়, প্রশংসা চায়। এই জন্য গৌরব প্রচার করা, দেশের যশোগান করা, স্বজাতিকে অমর করা, মানুষমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ।

অথচ হিন্দুস্থানে আজও কোন ইতিহাস গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইল না। দুনিয়ার লোকে ভারতবাসীকে সৃষ্টিছাড়া মানুষ ভাবিতেছে। এই কলঙ্ক মুখের বক্তৃতায় ঘুচিবে না। এই কলঙ্ক সম্পূর্ণ অসম্ভব—ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ধরণের অসম্ভব অথচ সত্য কথা বিচিত্র নয়।

আমাদের বাঙ্গালা দেশ কবে কোন্ যুদ্ধের পর মুসলমানের দখল হইল? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আজিও সুকঠিন। ইতিহাসের বিচারক বলিবেন—"আর ও প্রমাণ চাই—খাঁটি তথ্য এখনও বাহির হয় নাই"। অথচ বাঙ্গালা দেশ যে মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল তাহা

ত নিরেট সত্য। লক্ষ্মণসেনের সন তারিখ লইয়া যথেষ্ট গণ্ডগোল আছে। বস্তুতঃ গোটা সেনবংশই অনেকাংশে অজানা রহিয়াছে। এই বংশের কথাত কালকার কথা—অথচ বিজয়সেন, বল্লালসেন, ও লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে কয়টা কথা জোর করিয়া বলা যায়? জানি মাত্র কৌলীন্যপ্রথা। তাহাও বোধ হয় কাহিনীসুলভ আজগুবি গল্প! কাজেই সেন আমলের কোন ইতিহাসগ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত চক্ষুগোচর না হইলেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ধর্ম্মপাল ও দেবপাল দুইজনে ১১২ বৎসর বরেন্দ্র মণ্ডল হইতে আর্য্যাবর্ত্তের উপর শাসন চালাইয়াছিলেন। একথা জানা গেল গত কল্য। কিন্তু এই ১১২ বৎসরের ঘটনা আমরা কি জানি? প্রাণান্ত চেষ্টা করিলেও বোধ হয় ১১২ লাইনের বেশী কাগজ ভরা কঠিন হইবে! কাজেই পালের বাঙ্গালায় কোন ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল কিনা তাহার সংবাদ আজই পাইতে পারি কি? ভারতীয় নেপোলিয়ান-স্থানীয় সমুদ্রগুপ্ত আবিষ্কৃত হইলেন পরশু—এইরূপ কত সমুদ্রগুপ্ত এখনও অনাবিষ্কৃত কে জানে? শুনা যাইতেছে গুর্জ্জর প্রতিহার বংশে কয়েকজন জবরদস্ত নরপতি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদের পাল নেপোলিয়ানগণের সমসাময়িক্। আবার শুনিয়াছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একজন মরুবাসী নেপোলিয়ানের দিগ্‌বিজয়ের কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নাম চন্দ্রবর্ম্মা। ইনি সাগর হইতে সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত দখল করিয়াছিলেন। নামজাদা সমুদ্রগুপ্ত এই চন্দ্রবর্ম্মার সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত করেন।

আমাদের দেশের নেপোলিয়ানগণকেও অন্ধকার হইতে টানিয়া লোকের সম্মুখে বাহির করা আবশ্যক। তাঁহাদের সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি কত খানি? অমুক নামধারী একজন রাজা

ছিলেন। এই "ছিলেন" পর্য্যন্তই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর, কাহারও কাহারও সম্বন্ধে কিছু বেশী জানা গিয়াছে। "অমুক নামধারী অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ছিলেন" ইত্যাদি। রাখাল-দাসের "বাঙ্গালার ইতিহাসে" এবং ভিনসেণ্ট স্মিথের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" এই ধরণের কয়েক গণ্ডা নাম সকলেই দেখিয়াছেন। আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক চলিতেছে—বিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষে এই নামগুলিও জানা ছিল না। কাজেই ভারতীয় নেপোলিয়ান-গণের দরবার হইতে সরকারী ইতিহাস প্রকাশিত হইত কি না তাহার সাক্ষ্য আজ কে দিতে সমর্থ? সেই সকল রাজচক্রবর্ত্তীর আমলে পণ্ডিতেরা স্বাধীনভাবে দেশের কথা ইতিহাসাকারে লিখিতেন কিনা তাহাই বা আজ কে বলিতে পারে? এই জন্যই অসম্ভব সত্য কথা আজ শুনিতেছি—"ভারতবাসী তুমি দিগ্‌বিজয় করিতে জান, কিন্তু তুমি দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী প্রচার করিতে জান না।"

যাহা হউক, ভারতবাসী দিগ্‌বিজয় করিতে পারিত। ইহা অলীক নয়, খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য। এইটুকু জানাই বর্ত্তমানে ভারতীয় ইতি-হাস-রসিকের প্রথম খুঁটি থাকিবে। ভারতবাসী দুনিয়াখানিকে মায়ার রচনা বিবেচনা করিত না। প্রথম খুঁটি হইতে অন্ততঃ এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অর্থাৎ যে ধরণের মাথা থাকিলে ইহজগতের সুখদুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে মানুষের খেয়াল চাপে সেই ধরণের মাথা ভারতবাসার ছিল। অতএব ভারতীয় মস্তিষ্ক হইতে ইতিহাস-সাহিত্য বাহির না হইবার কোন কারণ নাই।

যাহারা জগৎকে অলীক বা মায়া বা মিথ্যা বিবেচনা করে তাহারা জগতে রাজ্যসুখ চাহে না—তাহারা রাজরাজেশ্বর হইতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং তাহারা এই সংসারের ঘটনাবলীকে সাহিত্যে স্থান না

দিতেও পারে। কিন্তু ভারতসন্তানের ন্যায় যাহারা সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের জীবননাশ করিয়া আনন্দ পায়, তাহারা এই "রূপরসগন্ধস্পর্শময় ধরাখানাকে ভোগ্যাই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। আর, যাহাদের চরিত্র এইরূপ, তাহারা সেই ভোগ্যা ধরিত্রীর কাহিনীতেও মুগ্ধ থাকিবার কথা। অর্থাৎ তাহাদের সাহিত্যে রক্তারক্তির বৃত্তান্ত এবং দেশজয়, নগরশাসন, রাজস্বসংগ্রহ, বিচারব্যবস্থা, মুদ্রাপ্রচলন ইত্যাদির বিবরণ প্রকাশিত হওয়া অতি স্বাভাবিক।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—ভারতে কবিপ্রশস্তি, চাটুকারের বচন, তাম্রানুশাসন, প্রস্তর-লিপি ভাটচারণের গান ইত্যাদি কম আছে কি? প্রতিদিনই এই ধরণের অনেক বস্তু আবিষ্কৃত হইতেছে। এইগুলির মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান্ দলিল বহুসংখ্যক বাহির হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সমুদয় রচনা ইতিহাসের উপকরণ মাত্র। এই সকল মশলা সাজাইয়া গুছাইয়া ব্যবহার করিলে ইতিহাস রচিত হইতে পারে। এই কার্য্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরই করা উচিত ছিল।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যেও অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। তামিল ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলী ঘুঁটিলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। মহারাষ্ট্রের সাহিত্যে "বাখার" বা পেশোয়াদিগের সরকারী চিঠিপত্র অনেক আছে। আসামে "বুরঞ্জী" আছে। বলা বাহুল্য এইগুলির বড়াই করিয়া আমরা ঐতিহাসিক সাহিত্যের পরিচয় দিতে পারি না।

অধিকন্তু বিরাট ভারতীয় সাহিত্য-সমুদ্রের বিশ্লেষণ সুরু করিলে প্রাচীন জীবনের বহু তথ্যই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র,

অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, বস্তুশাস্ত্র, ইত্যাদি সাহিত্যের নানা বিভাগে ইতিহাসের অনেক কথাই আছে। তাহা ছাড়া কাব্য, নাট্য, গদ্য, গীত এবং সাধারণ সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও ভারতীয় জীবনধারার আদর্শ ও লক্ষ্য এবং গতি বুঝা সম্ভব। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যনীতি, কামসূত্র, শুক্রনীতি, রঘুবংশ যুক্তিকল্পতরু, মানসার, ইত্যাদি গ্রন্থকে ইতিহাস বলিতে হইলে হোমার ইস্কীলাস, প্লেটো, দান্তে, সেক্স্‌পিয়ার, মিল্টনকেও ঐতিহাসিক বলিতে হয়! সেক্স্‌পিয়রের "ম্যাক্‌বেথ", "কিংলিয়ার" আর "জুলীয়াস সীজার" পড়িয়া ষোড়শ শতাব্দীর বিলাতী ইতিহাস কতখানি বুঝিতে পারি? কবিকঙ্কন চণ্ডী পাঠে আক্‌বরের ভারত অথবা মোগল বাঙ্গালা প্রায় ততখানি বুঝা যাইবে—"রঘুবংশেও" গুপ্ত ভারত তাহা অপেক্ষা বেশী বুঝা যাইবে না।

পুরাণগুলি বিশ্বকোষ। যুগে যুগে ভারতবাসী যাহা কিছু শিখিয়াছে সবই তাহার পুরাণে স্থান পাইয়াছে। এই হিসাবে পুরাণগুলি অন্যান্য সকল গ্রন্থের চুম্বক অথবা "সর্ব্বগ্রন্থসংগ্রহ"। কাজেই পুরাণগুলিকে প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান্ দলিল বা উপকরণ বিবেচনা করিতে আপত্তি নাই। তথাপি পুরাণ ইতিহাস্ নয়। "মৎস্য", "বায়ু" "ভবিষ্য", "বিষ্ণু" এবং অন্যান্য পুরাণে রাজবংশের তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এই সকল রাজকুলজী বা বংশাবলীর জোরে ভারতীয় সাহিত্যের কলঙ্ক দূর হইবে না।

মানুষের লিখিত সকল সাহিত্যই তাহার জীবনের ইতিহাস। কাজেই যে কোন লেখা পুঁথিকে ইতিহাস ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ইতিহাস নামক একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহারা সাহিত্য এবং জীবনের নানা বিভাগ হইতে অশেষ

প্রকার তথ্য খুঁটিয়া খুঁটিয়া এই ইতিহাস-সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশের মতন গ্রন্থ সকল দেশেই আছে—এইগুলি ছাড়াও খাঁটি ইতিহাস ঐ সকল দেশের পণ্ডিতেরা লিখিয়া গিয়াছেন। সেই ইতিহাস গ্রন্থ আমাদের কোথায়?

আজকাল ভারতীয় পণ্ডিতমহলে একটা নূতন "বাতিক" দেখা দিয়াছে। আমরা মাঝে মাঝে শুনিয়া থাকি ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজবংশের কাহিনী নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস জনগণের লড়ালড়ি বা রক্তারক্তির গল্প নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস জয় পরাজয়ের বৃত্তান্ত নয়। ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস জ্ঞানবিজ্ঞানের কাহিনী। ভারতবর্ষের আসল কথা সভ্যতাবিকাশের বিবরণ। ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় ভারতবাসীর দর্শন, সাহিত্য ও ধর্ম্ম। এই কথা অন্যান্য দেশের লোকেরাও ঠিক এই ভাবেই বলিতে অধিকারী নয় কি? সকল দেশেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে—সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে—দর্শনের চর্চ্চা হইয়াছে—সর্ব্বত্রই জ্ঞান বিজ্ঞান, আচার বিচার, লেন, দেন ও সৌজন্য শিষ্টাচারের ধারা আছে। তাহার উপর রক্তারক্তি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারকাট, লুটপাট, ইত্যাদিও সকল দেশেই অনেক হইয়াছে। আর এই সকল কাণ্ডের বিবরণও অন্যান্য দেশের সাহিত্যে পাই। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে অন্যান্য সকল বস্তুই পাই—কেবল এই রক্তারক্তির কথাটাই পাই না। পাইনা বলিয়াই আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার মত প্রচার করিতে ব্রতী হইয়া থাকি।

বস্তুতঃ, লড়াইয়ের কথাই ইতিহাসের মেরুদণ্ড। দেশজয়, নগর লুণ্ঠন, রাজবংশের উঠানামা, প্রজাবৃদ্ধি, প্রজাক্ষয় ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যই আসল ইতিহাসের তথ্য। জনগণের সাময়িক এবং রাষ্ট্রীয় ভাগ্য আলোচনা করাই ঐতিহাসিকের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। জয় পরাজয়ের

কথা না বুঝিলে কোন জাতির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষের কথা বুঝা অসম্ভব। কতখানি দেশ জুড়িয়া একটা শাসন চলিতেছে এই কথাটা যিনি না জানেন, তিনি লোকজনের বিবাহপ্রথা, সমাজ কথা, আর্থিক অবস্থা ও আচার-বিচার বুঝিতে অসমর্থ। কোন রাষ্ট্রের সীমানা বাড়িতেছে কি কমিতেছে এই কথাটা যিনি না জানেন তিনি জনগণের সুখদুঃখ, ধনদৌলত, আশা ভরসা, উৎসবব্যসন বুঝিতে পারিবেন না। অর্থাৎ তিনি দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা ও দর্শনাদির মর্ম্ম ধরিতে অসমর্থ থাকিবেন।

গানের সুর শুনিয়া বুঝা যায় গায়ক মরা না জ্যান্ত। চিত্রের আঁচড় দেখিয়া ধরা যায় শিল্পী সাহসী না কাপুরুষ। দর্শন বিজ্ঞানের দৌড় দেখিয়া আন্দাজ করা যায় লোকটার কল্পনার সীমানা কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের পেটে দুই বেলা ভাত পড়িতেছে কি না। সাহিত্য, দর্শন, শিল্পবিজ্ঞানের সীমানাগুলা রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে। গানের সুর, গলার আওয়াজ, ভাস্কর্য্যের রেখা, আর চিন্তার দৌড় বা খেয়ালের রং জনগণের সামরিক বলের (ও আর্থিক ক্ষমতার) উপর নির্ভর করে:—দেশের চৌহদ্দির উপর নির্ভর করে,—সৈনিক পুরুষদের লাঠালাঠি ও রাজরাজড়াদের জয়পরাজয়ের উপর নির্ভর করে। কাপুরুষের ও নপুংসকের সমাজে গীতা, রঘুবংশ অথবা কৌটিল্যনীতি প্রচারিত হইতে পারে না। রক্তের কথাই ইতিহাসের গোড়ার কথা।

লাঠালাঠী, মারকাট, ও লুটপাটের তথ্য জানা হইয়া গেলে পর মানুষের জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বুঝা সম্ভব। তাহার পূর্ব্বে নয়। এই জন্য দেশের স্বাধীনতা পরাধীনতাটা চতুঃসীমাটা এবং লোকসংখ্যাটা (ও আর্থিক সুযোগ সুবিধাটা) সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক।

তাহা হইলে সমাজ ব্যবস্থা আপনা আপনিই ধরা পড়িবে। তবে বিবাহে রক্তসংমিশ্রনের কথা, জাতিতত্ত্ব, লোকাচার-তত্ত্ব, কৌলীন্য, বংশমর্য্যাদা ইত্যাদি "সামাজিক" তথ্য আপনাআপনিই পরিস্কার হইতে থাকিবে।

চোখের সম্মুখে ইয়োরোপে আজকাল কি দেখিতেছি? লক্ষ লক্ষ লোক প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া লড়াইয়ের মাঠে উপস্থিত। ইতিমধ্যেই কত হাজার লোক মারাও গিয়াছে। ইহাদের পত্নীরা কি সব ব্রহ্মচারিণী রহিয়া যাইতেছে? পুরুষ সংখ্যা প্রত্যেক দেশেই কমিয়া গেল ও যাইবে। এই সকল দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেকেই স্বামী পাইবে না। কিন্তু তাহারা কি অবিবাহিতা অথবা ব্রহ্মচারিণী থাকিবে? না থাকিতেছে? দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ডে, জার্ম্মানিতে, ফ্রান্সে বহু অবিবাহিতা নারীর সন্তান জন্মিয়া গেল। ইহাদিগকে "ওয়ার-মাদার" (বা যুদ্ধ জননী) রূপে সগর্ব্বে জাতিতে তুলিয়া লওয়াও হইতেছে। ইহাদের জারজ সন্তানেরাই কালে বহুপ্রসিদ্ধ কুলীন বংশের পূর্ব্বপুরুষ জ্ঞানে সমাদৃত হইবে।

এই 'ত গেল মাত্র একদিককার কথা। মানবজীবনের সকল দিকেই লড়াইয়ের প্রভাব বিপুল। আর একটা কথা মাত্র সম্প্রতি উল্লেখ করিব। বেল্‌জিয়ান্ স্ত্রী পুরুষেরা পলাইয়া বিলাতে ও ফ্রান্সে আসিয়াছে। ফরাসীরা পলাইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছে। বিলাত হইতে, জার্ম্মানি হইতে, ফ্রান্স হইতে বহু নরনারী আমেরিকায় আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। এক যুদ্ধের ধাক্কায় হাজার হাজার লোক দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের কয়জনই বা স্বদেশে ফিরিতে পারিবে? ইতিমধ্যে ইহারা যে যেখানে পাইতেছে বিবাহ করিয়া বসিতেছে। এদিকে যাহাদের আইনতঃ বিবাহ হইতেছে না তাহাদেরও সন্তান জন্ম বন্ধ থাকিতেছে না। জগতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনায়

অসংখ্যবার জাতিসংমিশ্রণ দেখা গিয়াছে। ইয়ুরোপে এই ধরণের একটা বড় সামাজিক খিঁচুড়ি বা বর্ণসঙ্কর নেপোলিয়ানি সমরে সাধিত হইয়াছিল। লড়াই হাঙ্গামাই রক্তমিশ্রণের একমাত্র কারণ নয়; কিন্তু প্রধানতঃ যুদ্ধের প্রভাবেই সমাজ-শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সৃষ্টিছাড়া মুল্লুক নয়। বড় বড় কুরুক্ষেত্রের পর ভারতেও নব নব কৌলিন্য, নব নব আভিজাত্য ও নব নব জাতিভেদ সংগঠিত হইয়াছে। কোন এক কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে যে বংশ বা যে জাতি উঁচু ছিল কুরুক্ষেত্রের হিড়িকে এবং পরে তাহাদের স্মৃতি পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। আবার যে জাতি বা যে পরিবার বা যে বংশ সমাজে হয়ত একদম অজানা ছিল তাহারাই নূতন ঘটনাসমাবেশে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। বর্ণসঙ্কর, সমাজ সংস্কার বংশগৌরব ইত্যাদির মূল কারণই কুরুক্ষেত্র।

তাই বলিতেছি যে, সংগ্রামের কথা এবং রক্তারক্তির কথাই ইতিহাস-বিদ্যার ভিত্তি। ইহাতে রাজা এবং প্রজা দুই তরফের অবস্থাই বুঝা যায়,—কেবল রাজ রাজরাজড়াদের তরফ মাত্র নয়। এই ভিত্তিটা না ধরিতে পারিলে কোন জাতির অর্থশক্তি, সমাজব্যবস্থা বা বিদ্যার পরিধি বুঝা অসাধ্য। ভারতবর্ষে এখনও আমাদের প্রাচীন কালের লড়ালড়ির বৃত্তান্ত সবিশেষ পরিষ্কার হয় নাই। কাজেই প্রাচীন ভারতকে এখনও আমরা বুঝিতে অসমর্থ। রাজবংশের বৃত্তান্ত, রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমা, জনগণের সংখ্যা, সন্ধিবিগ্রহ, আন্তর্জাতিক লেনদেন ও জয়পরাজয় ইত্যাদি তথ্য সনতারিখসমন্বিতভাবে প্রচারিত হইতে থাকুক, তাহার পর আমরা ভারতীয় ধনসম্পত্তি, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইতে পারিব; অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব (আর্কিওলজি) এবং

কালতত্ত্ব (ক্রনলজি) সুনির্দ্ধারিত না হইলে ইতিহাস (অর্থাৎ মানব-জীবনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা) রচনা করা অসাধ্য।

ইতিহাসবিদ্যার এই অ্যানাটমী, অস্থিকঙ্কাল বা কাঠামো ও উপকরণগুলা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া যান নাই। ইহা তাঁহাদের ও আমাদের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক বিনা বাক্য-ব্যয়ে সুধীজনের বৈঠকে সহ্য করিতেই হইবে।

যাহা হউক, দুনিয়ার সর্ব্বত্র আজ বিংশ শতাব্দীতে "ইতিহাস বিজ্ঞান" আলোচিত হইতেছে। যুবক ভারত সবেমাত্র প্রত্নতত্ত্বের অ, আ, ক, খ, সাধিতে সুরু করিয়াছে। মন্দের ভাল সন্দেহ নাই।

কোন ভারতসন্তানকে জিজ্ঞাসা করা যাউক—"ভারতবর্ষে কয়টা রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে ? সর্ব্বসমেত কয়জন রাজার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে জানিতে পারা যায় ?" এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ভিন্সেট স্মিথকেও মাথা চুলকাইতে হইবে। কাগজ পেন্সিল লইয়া হয়ত তিনি বসিবেন। পরে বলিবেন—"ওহে অমুক সাল হইতে অমুক সাল ২৫০ বৎসরের একটা তথ্যও এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। অমুক সাল হইতে অমুক সাল পর্য্যন্ত ৫০ বৎসরের ইতিহাসকথা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহা ছাড়া, কতকগুলি নূতন নাম পাওয়া যাইতেছে। এইগুলি রাজার নাম না উজীরের নাম তাহা বলা মুস্কিল।" ইত্যাদি। কিন্তু কোন চীনাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক চীনা রাজবংশের কথা আর চীনা সম্রাট-গণের কথা। এক নিঃশ্বাসের চীনা শিশু খাঁটি উত্তর দিতে পারিবে। একশত বৎসর পূর্ব্বেও পারিত, তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও পারিত। মান্ধাতার কাল হইতে চীনা পণ্ডিতেরা এই সকল কথা লিখিয়া আসিতে-ছেন। কাজেই বর্ত্তমানের কোন বালককে অঙ্ক কষিয়া চীনেশ্বরগণের সংখ্যা স্থির করিতে হয় না। সে ধাঁ করিয়া বলিয়া দিবে—"বংশসংখ্যা,

২৫, সম্রাট সংখ্যা ২৫১। হিয়াবংশের (খৃঃ পূঃ ২২০৫) প্রবর্ত্তক পুণ্যশ্লোক য়ু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্রাট (খৃ ১৯১২) পর্য্যন্ত এই গণনা।”

এতদিন আমরা কলহন্ প্রণীত রাজতরঙ্গিনীর দোহাই দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিভাগের মুখ রক্ষা করিতাম। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ লিখিত। প্রায় সমসাময়িক কালের কাশ্মীর দেশীয় রাজরাজড়াদের কথা ইহাতে আছে। খাঁটি ইতিহাসপদবাচ্য আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু কলহনের অনেক তথ্যই আজগুবি গল্পমাত্র। হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি হর্ষচরিত লিখিয়াছেন। ইহাতে সমসাময়িক কথা আছে। কিন্তু ইহা কি ইতিহাস? য়ুয়ান চুয়াঙের ভারতবিবরণের পাশে সপ্তম শতাব্দীর বাণ প্রণীত এই কবিপ্রশস্তি দাঁড় করান চলিতে পারে না। সম্প্রতি এইরূপ একখানা “চরিত” শাস্ত্রীমহাশয় নেপাল হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে পালের বাঙ্গলার অনেক কথা জানিতে পারা যায়। উহা সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত “রামরচিত”। ইহাতে আমাদের রামপালের কথা আছে (১০৬০—১১০০)। বাল্মীকির রামচন্দ্রের সঙ্গে পাল সম্রাট্ রামপালের তুলনা করিয়া সন্ধ্যাকর এই কাব্য রচনা করেন। নন্দী রামপালের একজন বড় কর্ম্মচারির পুত্র।

এই ধরণের আর এক খানা “চরিতে”র নাম বিক্রমাঙ্কচরিত। গ্রন্থকার বিহ্লন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। এক জন চালুক্যবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতির (১০৭৬—১১২৬) বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। “পৃথ্বীরাজ চরিত” নামেও একখানা ঐতিহাসিক ঘটনামূলক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এক খানা কবিপ্রশস্তির নাম “গৌড় বাহো” বা “গৌড়বধ”। কবি বাকৃপতি এই গ্রন্থে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার গৌড়বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যশোবর্ম্মার সময়ে গৌড়রাজ

কে ছিলেন এখনও জানা যায় না। যশোবর্ম্মা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক।

বৌদ্ধ "জাতক" সাহিত্য এবং জৈন গ্রন্থমালা নিংড়াইলে ঐতিহাসিক তথ্য কিছু পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, যে কোন সাহিত্য নিংড়াইলেই ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। সিংহলের কথা-সাহিত্যে "দ্বীপবংশ" এবং "মহাবংশ" পালিভাষায় লিখিত। বোধ হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীর রচনা। রাজতরঙ্গিনীর ন্যায় এই দুই কাহিনীও সাবধানে গ্রহণীয়।

আউফ্রেক্ট (Aufrecht) প্রণীত ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগোরাম (Catalogus Catalogorum) গ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির ক্যাটালগের (বা তালিকার) ক্যাটালগ্। ইহাকে "পুঁথির বিশ্বকোষ" বিবেচনা করা চলিতে পারে। ইহাতে বোধহয় পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক সংস্কৃত পুঁথির নাম আছে। এইগুলি ছাড়াও আর কত লক্ষ সংস্কৃত পুঁথি দুনিয়ার নানা স্থানে পাওয়া যাইতে পারে তাহা কে জানে? হয়ত কালে এই সমুদয়ের মধ্যে "চরিত" জাতীয় বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেও পারে। এমন কি খাঁটি ইতিহাসও এক আধ খানা বাহির হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে ইতিহাস-হীন সাহিত্যের দেশ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাবীর শাক্যসিংহ লাওট্জে এবং কন্ফিউসিয়াসের আমলে, একটা বড় রকমের রুশ জাপানী যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে এসিয়ার পারসীরা হারিয়া যায়। গ্রীসের ইয়োরোপীয়ানদিগের জয় লাভ হয়। সেই মহাসমরের পোর্ট আর্থার (১৯০৫) ছিল গ্রীসের মারাথন (খৃঃ পূঃ ৪৯০) ও থার্ম্মাপলি (খৃঃ পূঃ ৪৮০)। এই বিরাট কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন

হেরোডোটস্। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রন্থরচনা করেন। হেরোডোটাসকে ইতিহাস সাহিত্যের জন্মদাতা বলা হইয়া থাকে। হেরোডোটাসের সময়ে গ্রীসে আর একজন ঐতিহাসিক দেখা দেন। তাঁহার নাম থুসিডিডিস। গ্রীসে তখন এক লঙ্কাকাণ্ড চলিতেছিল। গ্রীসের নগরগুলি দুই দলে বিভক্ত হইয়া আপোষে লড়িতেছিল। সেই মাৎস্যন্যায় বা ঘরোয়া লড়াইয়ের (খৃঃ পূঃ ৪১১—৪০৫) ইতিহাস লিখিয়া থুসিডিডিস সুপ্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর একজন গ্রীক ঐতিহাসিক আছেন। তাহার নাম জেনোফন (Xenophon) থুসিডিডিসের পরবর্ত্তী কালের ঘটনা (খৃঃ পূঃ ৪১১—৩৬২) জেনোফনের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক হিসাবে থুসিডিডিস শীর্ষস্থানীয়। হেরোডোটাস তাঁহার গ্রন্থে পৌরাণিক গল্প গুজব এবং উপকথা বাদ দেন নাই। প্রাচীন ভারত বিষয়ক কিছু কিছু আজগুবি কথা হেরোডোটাসের গ্রন্থে আছে। কিন্তু থুসিডিডিস বিচারকভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসালোচনার প্রবর্ত্তক রূপে থুসিডিডিস চিরস্মরণীয়। অধিকন্তু থুসিডিডিসের রচনাকৌশল বা ষ্টাইল অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। ঐ যুগে গ্রীসে বাগ্মিতা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। এথেন্সের প্রায় প্রত্যেক লোকই সুবক্তা ছিলেন। থুসিডিডিসের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন গোলদীঘিতে দাঁড়াইয়া আমাদের বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা শুনিতেছি। এই ধরণের ইতিহাসই জাতীয় জীবন গঠন করে।

বলা বাহুল্য আমাদের কহ্লন মিশ্র থুসিডিডিস নন। রোমের জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি সীজার (খৃঃ পূঃ ১০০—৪৪) ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি জেনোফনের ন্যায় সৈনিক পুরুষের চোখে দুনিয়ায় দৃষ্টিপাত করি-

তেন। তাঁহার রচনায় সরল সহজভাবে তথ্যসমূহ বিবৃত হইয়াছে। সীজারের সমসাময়িক আর একজন রোমাণ ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার নাম স্যালাষ্ট (Sallust)। তিনি মুন্সীয়ানা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিতেন। তাঁহার রচনায় থ্যুসিডিডিসের আভাষ পাই। তিনি রোমের সেই সময়কার ঘরোয়া লড়াইয়ের সম্বন্ধে দুই তিন খানা বই লিখিয়াছেন। তাঁহার কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮৭ হইতে ৩৪।

হেরোডোটাস, থুসিডিডিস, জেনোফন, সীজার ও স্যালাষ্ট এই পাঁচ জনই লড়াইয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। এইরূপ লড়ায়ের ইতিহাস ভারতবর্ষে নাই। রামায়ণে রামরাবণের লড়ায়ের কাহিনী যদি ইতিহাস হয়, তাহা হইলে হোমারের ইলিয়াডও ইতিহাস!

তার পর দুনিয়ায় রোমিয় প্রতাপ সুরু হইল এবং গ্রীসের রাষ্ট্রীয় জীবন অস্তমিত হইল। কিন্তু রোমাণদিগের শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু থাকিলেন গ্রীক দাসেরা। গ্রীক স্বাধীনতার ক্রমিক লোপ সম্বন্ধে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রীক ইতিহাস আছে। লেখকের নাম পোলিবিয়াস (Polybius)। ইনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৬৪ হইতে খৃঃ পূর্ব্ব ১৪৬ সাল পর্য্যন্ত গ্রীসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রীক ঐতিহাসিকের রচনায় থ্যুসিডিডিসের রচনাকৌশল দেখা যায়। ইনি স্বয়ং একজন করিতকর্ম্মা সেনাপতি ও রাষ্ট্রবীর ছিলেন। পোলিবিয়াসের সময়ে গ্রীস দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের লোক।

তাঁহার পর গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্লুটার্ক (Plutarch) সর্ব্ব বিখ্যাত। ইনি প্রাচীন কালের গ্রীক এবং রোমাণ বীরগণের জীবন বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "লাইভ্‌স্‌" বা "চরিতমালা" গ্রন্থের পাশে "হর্ষ চরিতের" নাম করিতেও লজ্জা বোধ হইবে। কয়েক জন গ্রীক ঐতিহাসিকের রচনায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে

কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে আরিয়ান (Arrian) এবং ষ্ট্র্যাবো (Strabo) এই দুইজনের কথা ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সুবিদিত। ইহারা সকলেই গোলাম গ্রীসের গ্রীক সাহিত্যবীর।

ইহাদের পরবর্ত্তী কালে ল্যাটিন (রোমান্) সাহিত্যের ইতিহাসক্ষেত্রে প্লিনি (খৃঃ অঃ ৬১—১১৫) বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্লিনির (Pliny) নামও ভৌগোলিক ষ্ট্র্যাবো এবং ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতন শিক্ষিত ভারতে সুপ্রচলিত। ল্যাটিন সাহিত্যের সর্ব্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিকের নাম ট্যাসিট্যাস (Tacitus)। ইনি প্লিনির সমসাময়িক। ট্যাসিট্যাস (খৃঃ অঃ ৫৪—১১৯) একাধিক ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার লিখিত জার্ম্মাণ "বর্ব্বর" দিগের সমাজকথা অতিশয় প্রসিদ্ধ। বিদেশী সমাজ সম্বন্ধে এই ধরণের গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ট্যাসিটাস এবং প্লিনি উভয়েই সম্রাট্ ট্রাজানের (৯৮—১১৭) আমলের লোক অর্থাৎ রোমাণ সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতির সময়ে জীবিত ছিলেন। এই সময়ে আমাদের কুষাণ এবং আন্ধ্র নরপতিগণের গৌরব যুগ চলিতেছে। এই রোমের সঙ্গে হিন্দুজাতির কারবার এই যুগে অনেক হইত।

ল্যাটিন সাহিত্যের "স্বর্ণযুগ" এই আমলের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। তখনকার দিনে লিভি (Livy) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। লিভি (খৃঃ পূঃ ৫৭—খৃঃ অঃ ১৭) রোমাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান। তাঁহার সময়ে রোমীয় বীরগণের ঘরোয়া লড়াই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রোমাণ জাতির দিগ্ বিজয়ের ফলসমূহ ঐক্যগ্রথিত সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই গৌরবের কালে লিভি কল্পনার দুয়ার খুলিয়া একবার প্রাচীন রোমের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়াছিলেন। থুসিডিডিসের ন্যায় বিচারকের আসনে বসিতে লিভি চেষ্টা করেন নাই। রোমের প্রাচীন কীর্ত্তি আবেগময়ী কবিতার ভাষায় প্রচার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া

ছিল। দিগ্‌বিজয়ী রোমের আশা, স্বপ্ন ও ভাবুকতা বুঝিবার জন্য ল্যাটিন সাহিত্যের এই স্বদেশ প্রেমিক ইতিহাসলেখকের রচনা পাঠ করা আবশ্যক। ভারতীয় বিক্রমাদিত্যের আমলে এইরূপ ঐতিহাসিকের উদ্ভব হইয়াছিল আন্দাজ করিতে পারি। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকের পরিচয় না পাইয়া কালিদাসের "আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম" বাক্যে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছি। কবি কালিদাসকে ভারতের লিভি বলা চলেনা। কারণ লিভির আমলে ল্যাটিন সাহিত্যের কালিদাস ও জীবিত ছিলেন। তাঁহার রঘুবংশের নাম ঈনীড্ (Aeneid)। ভার্জিল (Virgil) রোমের কালিদাস। তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭০ হইতে খৃঃ পূঃ ১৯ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাজেই প্রশ্ন করিতেছি ভারতীয় অগষ্টান এজ্ বা স্বর্ণযুগের লিভি কোথায়?

ভারতে স্বাধীন গ্রীসের হেরোডোটাস থুসিডিডিসও নাই, গোলাম গ্রীসের পোলিবিয়াস—প্লুটার্কও নাই, অথবা ল্যাটিন-গৌরব লিভি ট্যাসিট্যাসও নাই। কিন্তু চীনে ইতিহাস-সাহিত্য প্রচুর। চীনারা এই বিষয়ে হিন্দুর ঠিক উল্টা। ইতিহাস রচনায় চীনারা ইয়োরোপীয়ান দিগকেও কানা করিয়া দিতে পারে। চীনারা ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছেও অনেক—আর ইহাদের লিখনপ্রণালীও পাকা। ফাহিয়ানাদি পর্য্যটক গণের ভারত বিবরণ হইতেই আমরা চীনাদের ইতিহাস লিখিবার ক্ষমতা আন্দাজ করিতে পারি। তথ্য সঙ্কলনে এবং তথ্য নির্ব্বাচনে চীনা লেখকগণ খুবই মজবুদ। অবশ্য ইহাদের রচনায় বাজে ভূষিমালও রাশি রাশি আছে।

ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস গ্রন্থ পাই না। কিন্তু "ইতিহাসনামক" বিদ্যা ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ৩২ "বিদ্যার" এবং ৬৪ কলার উল্লেখ আছে। ইতিহাস এই সমুদয়ের অন্যতম। বাৎস্যায়নের

সনতারিখ এখনও সুনির্দ্ধারিত নয়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত আমলের কোন এক যুগে তাঁহার তারিখ ফেলা হইয়া থাকে। চীনা সাহিত্যে সর্ব্ব প্রথম ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে, অর্থাৎ গ্রীক সাহিত্যের সর্ব্ব প্রথম ইতিহাস রচনার প্রায় দুইশত বৎসর পরে চীনাদের ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। চীনের হেরোডোটাসের নাম ছি-মা-চিয়েন। ছির জন্ম ১৪৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে।

চীনাভাষায় ইতিহাসের প্রতিশব্দ "শিহ" অথবা "ভু"। ভারতীয় বিদ্যাগুলি কোন কোন হিসাবে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) ধর্ম্মশাস্ত্র (২) অর্থ শাস্ত্র (৩) কামশাস্ত্র (৪) মোক্ষশাস্ত্র। চীনাদের শাস্ত্র-গুলিও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। পিকিঙের রাজকীয় গ্রন্থা-গারের ক্যাটালগ্ বা তালিকাসমূহে প্রায় একলক্ষ গ্রন্থের নাম এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। (১) "ক্লাসিক" বা "বেদ" তুল্য গ্রন্থ (২) "শিহ" বা ঐতিহাসিক সাহিত্য (৩) দর্শন (৪) সুকুমার সাহিত্য।

শিহ সাহিত্য বিপুল। অন্ততঃ পনর শ্রেণীর রচনা এই সাহিত্যের অন্তর্গত। ওয়াইলি (Wylie) প্রণীত চীনা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে এই পনর দফা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই। চীনের সাহিত্য সম্বন্ধে বনিয়াদ পাকা করিতে হইলে ওয়াইলির Nopeson Chinese Literature ঘাঁটিতেই হইবে। জাইল্স্ প্রণীত "চাইনীজ" লিটরেচর গ্রন্থে চীনা সাহিত্যের নিদর্শন উদ্ধৃত আছে; এই জন্য এই পুস্তক আদরনীয়। কিন্তু নিরেট তথ্য ওয়াইলির গ্রন্থেই বেশী।

এক্ষণে পনর শ্রেণীর চীনা ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিবরণ দেওয়া যাই-তেছে। (১) "চিং শিহ" বা রাজবংশের ইতিহাস। সুইরাজবংশের (খৃঃ অঃ ৫৮৯—৬১৯) ইতিহাস-লেখক এই পারিভাষিক শব্দ প্রথম ব্যব-

হার করেন। তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতেই রাজবংশের ইতিহাস রচিত হইয়া আসিতেছে।

হ্যান্‌বংশের (খৃঃ পূঃ ২১০—খৃঃ অঃ ২২০) আমলে সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাসলেখক রাজদরবারের ডায়েরি বা রোজনামা হইতে তথ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন। রোজনামাকে চীনা ভাষায় 'জিহ-লি' বলে। পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস-লেখকগণও রাজদরবারের এই সকল "জিহ-লি" অবলম্বন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজগুলি প্রতিদিন কাছারীতে রক্ষিত হইয়া থাকে। রাজবংশের লোপ না হওয়া পর্য্যন্ত এইগুলি হইতে গুছাইয়া ইতিহাস লিখিবার দস্তর নাই। মাঞ্চু আমল ১৯১২ সালে শেষ হইয়াছে—কাজেই মাঞ্চু আমলের ইতিহাস সঙ্কলন মাত্র আজকাল সুরু হইবার কথা। মাঞ্চু সম্রাট্‌গণের সময়ে (৬৪৪—১৯১২) মিঙবংশের শেষ পর্য্যন্ত চীনা ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছিল। সুপ্রাচীন কাল হইতে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চব্বিশ খানা বংশেতিহাস বা চিং-শিহ্‌ এক্ষণে দেখিতে পাই। এই ২৪ খানা "ডাইন্যাষ্টিক হিষ্টরি" বা রাজবংশের ইতিহাস ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত করা হয়। এইগুলি ২১৯ স্বতন্ত্র খণ্ডে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছিল। আজকাল চীনা রাজবংশের চীনা ইতিহাস বলিলে ১৭৪৭ সালের সংস্করণ বুঝা হইয়া থাকে।

প্রায় প্রত্যেক চি-শিহ্‌ বা "রাজবংশের ইতিহাস"-গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবৃত দেখা যায়:—

(ক) "রাজচরিত" বা সম্রাট্‌গণের কার্য্যাবলী। এই অংশে রাজরাজড়াদের কথা যেরূপ থাকা উচিত সেইরূপই আছে।

(খ) বিবিধ প্রবন্ধ। (১) মাসপঞ্জী বা বর্ষপঞ্জী (২) উৎসব পার্ব্বন নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি ইত্যাদি (৩) সঙ্গীত (৪) আইনকানুন (৫) আর্থিক

অবস্থা (৬) সরকারী পূজা (৭) জ্যোতিষ (৮) জলবায়ু আব্‌হাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা (৯) ভৌগোলিক তথ্য (১০) সাহিত্য সংবাদ। এই দশ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ প্রণীত হয়।

(গ) দেশের কথা। (১) দেশীয় নামজাদা স্ত্রীপুরুষগণের বৃত্তান্ত (২) বিদেশপ্রসঙ্গ বা "বর্ব্বর"মণ্ডলের কথা। এই প্রসঙ্গ আমাদের পরিভাষায় "ম্লেচ্ছ" পুরাণ।

চব্বিশ খানা বংশেতিহাস হইতে 'বিদেশ-প্রসঙ্গ' নামক অধ্যায়গুলি বাছিয়া লইলে আধুনিক পণ্ডিতগণ চীনাদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির লেনদেন সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাপক হার্থ তাঁহার China and the Roman Orient অর্থাৎ "চীনের সঙ্গে রোমক এশিয়ার কারবার" নামক গ্রন্থে এশিয়া মাইনর বিষয়ক তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন। এইরূপে ভারতবিষয়ক চীনা তথ্যসমূহও সঙ্কলিত হইতে পারে। চীনা ঐতিহাসিকগণ শৃঙ্খল-পটু। আমাদের পুরাণকারদিগের রচনায়ও এই শৃঙ্খলা দেখা যায়। চীনা ইতিহাসে হুণ-"অধ্যায়", ভারত-"খণ্ড" বর্ব্বর-মণ্ডল ইত্যাদি পরিচ্ছেদবিভাগ আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীনারা যুগে যুগে নব নব জ্ঞান লাভ করিয়াছে। চব্বিশ খানা ইতিহাসে এই জ্ঞানবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ সাধারণতঃ "তিয়েন-চু" (স্বর্গ) নামে পরিচিত। অনেক স্থলে "পাশ্চাত্য বর্ব্বরগণের দেশ" এই নামও দেখিতে পাই। চীনাদের ধারণায় তাহারাই দুনিয়ার একমাত্র সভ্য জাতি এবং তাহাদের জন্মভূমিই "মিডল কিংডম্' অর্থাৎ "দুনিয়ার মধ্যবর্তী বা কেন্দ্র-দেশ" অর্থাৎ "ভূমধ্য জনপদ"। সুতরাং চীনের উত্তর প্রান্তের লোক উত্তরবর্ব্বর ম্লেচ্ছ বা বিদেশী, দক্ষিণ প্রান্তের লোক দক্ষিণবর্ব্বর ইত্যাদি। প্রাচীন কালে চীনারা তাহাদের দেশের পশ্চিম দিকে মধ্য এশিয়ায় সর্ব্ব প্রথমে বিদেশী বা

"বর্ব্বর"গণের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে। মধ্য-এশিয়া হইতে তাহারা ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদ পায়—পরে মধ্য-এশিয়ার পথেই ভারতবাসীর সঙ্গে চীনাদের কারবার সুরু হয়। এইজন্য ভারতবর্ষ চীনাদের ধারণায় "পশ্চিম" বর্ব্বরদিগের দেশ এবং আমরা 'পশ্চিম বর্ব্বর'। মাঞ্চু আমলে ভারতবর্ষের নাম হয় "ইন্দো"। কিন্তু চীনা সাহিত্যে ভারতবর্ষের কথা জানিতে হইলে "তিয়েন-চু" এবং "পশ্চিম বর্ব্বরদিগের দেশ" এই দুই বিষয়ের স্বচী দেখিতে হইবে। এই স্বচীগুলির অন্তর্গত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইলে একদিন ভারতবর্ষের চীনা ইতিহাস বুঝিতে পারিব।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর চীনা ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম "পীন্-নীন্"। ইংরেজিতে ইহার প্রতিশব্দ "অ্যান্যাল্‌স্" অর্থাৎ বার্ষিক বিবরণী। এই সকল বিবরণীতে বংশেতিহাসের সকল তথ্যই থাকে কিন্তু তথ্যগুলি সাজাইবার কায়দা স্বতন্ত্র। বৎসর অনুসারে পরিচ্ছেদ বিভাগ করা হয় এবং পরিচ্ছেদগুলি বিভিন্ন তথ্যানুসারে বিভাগ করা হয়। বৃটিশ ভারতীয় সরকারী রিপোর্টগুলি পীন্-নীন্ জাতীয় গ্রন্থ। বার্ষিক বিবরণী সমূহের সংখ্যা চীনা সাহিত্যে প্রচুর। প্রত্যেক রাজবংশের আমলেই একাধিক ঐতিহাসিক এই প্রণালীতে দেশের কথা বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন সময়ে সম্রাট্‌গণের আদেশেও পীন্ নীন্ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুঙ আমলে ছি-মা-কোয়াঙ্ একখানা "বার্ষিক বিবরণী" প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে সুঙ্ আমলের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ৯৬০) ১৩৬০ বৎসরের কথা বৎসর হিসাবে সাজান আছে। গ্রন্থ ২৯৪ অধ্যায়ে বা খণ্ডে বিভক্ত। ছি-মা-কোয়াঙের নাম এই ধরণের ইতিহাস-সাহিত্যে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। কন্‌ফিউসিয়াস্ স্বয়ং এই রচনা-প্রণালীর প্রবর্ত্তক ছিলেন।

তাঁহার "বসন্ত ও শরৎ" ("স্প্রিং অ্যাণ্ড অটাম্") নামক বার্ষিক বিবরণী এই জাতীয় ইতিহাসগ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম।

(৩) চীনা লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ বংশবৃত্তান্ত এবং বার্ষিক বৃত্তান্ত এই দুই বৃত্তান্তের মাঝামাঝি পথে চলিয়াছেন। ঘটনাবলী সাজাইবার জন্য তাঁহারা কোন বাঁধাবাধির মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে তাঁহারা এই দুই ধরণের গ্রন্থাবলী হইতে তথ্য বাছিয়া লইয়াছেন এবং সেইগুলি খুলিয়া ফলাইয়া বাড়াইয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ধরণের আলোচনা-প্রণালীকে ইতিহাসের ব্যাখ্যা বলা চলিতে পারে। ব্যাখ্যা, টীকা, ভাষ্য ও সমালোচনা সম্বন্ধে লেখকের স্বাধীনতা যথেষ্টই থাকে। আর, লেখকের পেটে যেরূপ বিদ্যা এইগুলির মূল্য ও আদর তদনুরূপ হইবারই কথা। কন্‌ফিউশিয়াসের সঙ্কলিত প্রসিদ্ধ "শু-কিঙ্" বা "ইতিহাস-গ্রন্থ" এই প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস। কন্‌ফিউসিয়াসের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন চীনা পণ্ডিত এই প্রণালীতে দেশের তথ্য ঘাঁটিতে প্রবৃত্ত হন নাই। সুঙ্ আমলে একজন প্রথম হাত দেন তাঁহার নাম য়ূয়েন্-চু। য়ূয়েনের নূতন প্রণালী রাজদরবারে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। য়ূয়েন্ তাঁহার সমসাময়িক ছিনা-কোয়াঙের বার্ষিক বিবরণী হইতে তথ্য লইয়াছিলেন। এই সকল তথ্যের ব্যাখ্যা এবং সমালোচনাই য়ূয়েনের গ্রন্থ। ইহা ৪৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ। য়ূয়েনের পথে পরবর্ত্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক অগ্রসর হইয়াছেন।

(৪) চতুর্থ শ্রেণীর ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম "পী-শিহ্"। পী-শিহ্‌গুলি চিং-শিহ অর্থাৎ বংশেতিহাসের প্রায় অনুরূপ। এইগুলির তথ্য বংশ অনুসারে সাজান। তবে চীনা হেরোডোটাস ছি-মা-চীয়েনের প্রবর্ত্তিত তথ্যতালিকা হইতে পী-শিহর তথ্যতালিকা কোন কোন

অংশে স্বতন্ত্র। পী-শিহ্ জাতীয় ইতিহাস-গ্রন্থের সংখ্যাও বেশ মোটা। প্রায় প্রত্যেক যুগেই এই ধরণের গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। মিঙ্ আমলের ইতিহাস সম্বন্ধীয় একখানা গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত চোদ্দ দফা তথ্য আছে :—(১) সরকারী দলিল দস্তাবেজ (২) সিংহাসনবর্জ্জনের কথা (৩) রাজকুমারগণের কুলজী (৪) রাজকুমারগণের কথা (৫) সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত বংশীয়গণের বৃত্তান্ত (৬) অমাত্য, সচিব এবং অন্যান্য রাষ্ট্র কর্ম্মচারীদিগের তালিকা (৭) দুই মহানগরীর শাসন-কর্ত্তাদিগের তালিকা (৮) প্রসিদ্ধ মন্ত্রীদিগের বৃত্তান্ত (৯) বংশলোপের সময়কার দুর্দ্দশা-গ্রস্ত অমাত্যবর্গের কথা (১০) দিন ক্ষণ গ্রহ নক্ষত্র (১১) ভৌগোলিক তথ্য (১২) পূজাপার্ব্বন, নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি, আচার বিচার ইত্যাদি (১৩) শাসন-বিভাগের কাগজপত্র (১৪) বিদেশ-প্রসঙ্গ বা বর্ব্বর ও ম্লেচ্ছদিগের কথা। এইগ্রন্থ ৬৯ খণ্ডে বিভক্ত।

(৫) পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাসকে "চা-শিহ্" বলে। কোন বিশিষ্ট নিয়ম অনুসারে এই ধরণের গ্রন্থ লেখা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর কোন লক্ষণই চা-শিহ্ গ্রন্থে নাই। হিন্দু সাহিত্যের অনেক গ্রন্থে "মিশ্র" অধ্যায় দেখিতে পাই। তাহাতে "পাঁচফুলে সাজি"র পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান মাসিক পত্রের সুপরিচিত "বিবিধ প্রসঙ্গ" বা "নানা কথা" এই মিশ্র অধ্যায়ের অনুরূপ। চিনা "চা-শিহ্" গুলিও ঠিক তাই। একখানা গ্রন্থে কোন সম্রাটের সঙ্গে মন্ত্রিবর্গের কথোপকথন বিবৃত হইয়াছে। এই গল্পের ভিতর দিয়া রাষ্ট্র শাসনের নানা কথা বুঝানই উদ্দেশ্য। পুস্তকখানা তাঙ্ আমলে লিখিত হইয়াছিল। সুঙ আমলের একব্যক্তি ১৫ বৎসরের জন্য মাঞ্চুরিয়ার রাজদরবারে চীন প্রতিনিধি রূপে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি মুকডেন সম্বন্ধে নানা কথা ডায়রিতে লিখিয়া রাখেন। কিন্তু মাঞ্চু রাজার কর্ম্মচারিরা

তাহাকে এই ডায়েরি আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য করেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর রাষ্ট্রদুত মহাশয় তাঁহার পনর বৎসরের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই "জীবন স্মৃতি" ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। মিঙ্‌ বংশের শেষ সন্তানগণ মাঞ্চু আমলে কয়েকবার রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য বিদ্রোহী হন। এই বিদ্রোহের কথাও কয়েক খানা গ্রন্থে বিবৃত আছে। এই ধরণের "বিবিধ-প্রসঙ্গ" পূর্ণ চা-শিহ্‌ গ্রন্থ চীনা সাহিত্যে অনেক।

এই সমুদয় "মিশ্র" ইতিহাসের মধ্যে একখানা বিশেষ প্রসিদ্ধ হই-য়াছে। উহা চিত্তাকর্ষক উপন্যাসরূপে পঠিত হইয়া থাকে। হান্‌বংশের পর চীনে মাৎস্যন্যায়ের ঘটা দেখা গিয়াছিল। এই মাৎস্যন্যায়ের বৃত্তান্ত "কাও-চি" অর্থাৎ "খণ্ড-চীনের কাহিনী" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইহাতে লেখক ১৭০ খৃঃ অঃ হইতে ৩১৭ পর্য্যন্ত কালের বিবরণ দিয়াছেন। লেখক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

(৬) সরকারী দপ্তরের খাতা পত্র সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য চীনে অনেক পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন। রাজদরবার হইতেও উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। তাঙ্‌ আমলের দলিলগুলি সুঙ্‌ আমলে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ১৩০ খণ্ডে এই সঙ্কলন বিভক্ত। অন্যান্য আমলের "বাখার" ইস্তাহার এবং "গেজেট"ও একত্র হইয়াছে। এই সকল "সরকারী কাগজে"র মধ্যে এক প্রকার সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঞ্চুবংশের প্রথম পাঁচ সম্রাট্ আমাদের অশোকের কায়দায় মাঝে মাঝে "অনু-শাসন" জারি করিতেন। এইগুলি আইন বা আদেশ নয়—বক্তৃতা ও উপদেশ মাত্র। কথাচ্ছলে সম্রাটগণ জনসাধারণকে রাষ্ট্রশাসনের নানা বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। প্রাচীন ইতিহাসের অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাগুলি সরল ও সহজ-বোধ্য করা হইত। এই সমুদয় অনুশাসন.

রাজোপদেশ বা রাজ বক্তৃতা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সাজাইয়া গুছাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ১১২ খণ্ডে এই "উপদেশামৃত" বিভক্ত।

(৭) চুয়েন্‌-কিহ্‌" অর্থাৎ জীবন-চরিত ইতিহাস সাহিত্যের অন্তর্গত। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগেও চীনারা জীবনচরিত লিখিত। কন্‌ফিউশিয়াস-ভক্ত দার্শনিক মেন্‌শিয়াস খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন দার্শনিক "মিহ্‌-ট্জে"। মিহ্‌ট্জের এক শিষ্যের নাম গান্‌-য়াঙ্‌। এই "গানের" চরিত-কথা পাওয়া যায়। লেখকের নাম অজ্ঞাত। "গান্‌ চরিত" হইতে আমরা চীনা দার্শনিক মহলের অনেক তথ্য পাইতে পারি। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিশ প্লেটো ইত্যাদির মতবাদ আমরা তাঁহাদের কথোপকথন হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নারীগণের এক আখ্যায়িকা প্রণীত হইয়াছিল। "নারী-চরিত" চীনা সাহিত্যে অনেক। মোটের উপর জীবন-চরিতের সংখ্যা অগণিত বলিলেই চলে। কোন গ্রন্থে ৯৬ জন পণ্ডিতের কথা, কোন গ্রন্থে ৩৯জনের কথা, কোন গ্রন্থে ৫৯জনের কথা, কোন গ্রন্থে ৩৯৭ জনের কথা জানিতে পারি। মোগল আমলের ৪৭ জন প্রধান মন্ত্রীর জীবন-চরিত একখানা ১৫ খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থে বিবৃত আছে।

১১৭২ খৃষ্টাব্দে একজন বড় কর্ম্মচারী রাজধানী হইতে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতেছিলেন। পথে তিন মাস কাটে। এই তিন মাসের ডায়েরী পাওয়া যায়। লেখকের নাম ফান্‌-চিং-তা। ইনি ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে আর একবার ছি-হোয়ান প্রদেশ হইতে হ্যাং-চাও নগরে আসিতেছিলেন। পথে পাঁচ মাস কাটে। এই পাঁচ মাসের বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ১১৭৭ সালের ডায়রিতে ভারতবাসীর জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। বৌদ্ধ-সাহিত্য সংগ্রহের জন্য ৩০০ চীনা পুরোহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিযানের কথা এবং ভারত-পরিচয় ও ফান্‌ মহাশয়ের

দ্বিতীয় আত্মজীবনী গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ৩০০ পুরোহিত কোন্ কোন্ যুগের লোক জানি না।

এই শ্রেণীর ডায়েরি বা ভ্রমণবৃত্তান্ত চীনা সাহিত্যে আরও আছে। এতদ্ব্যতীত সেনাপতিদিগের লিখিত "ডিপ্লোম্যাটিক" অভিযানের বিবরণ, বিদ্রোহদমনের বিবরণ ইত্যাদিও পাই।

সরকারী চাকরীতে লোক বাহাল করা চীনে এক বিরাট কাণ্ড। কেতাবী শিক্ষার পরীক্ষা না লইয়া রাষ্ট্রবীরগণ কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন না। লোক বাছায়ের জন্য "আদ্য" পরীক্ষা, "মধ্য" পরীক্ষা এবং "উচ্চ" পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে মিঙ্ আমলে সর্ব্বপ্রথম "উচ্চ" পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই কাণ্ডের এক সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক খানা সচিত্র গ্রন্থে কনফিউশিয়াস এবং তাহার ৭১ জন শিষ্যের কথা আছে। প্রত্যেকের ছবিও ছাপা হইয়াছে। বিবরণ গদ্যে এবং পদ্যে প্রদত্ত। পদ্যাংশে প্রত্যেকের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার নাম "চাও-জিন্-চুয়েন" অর্থাৎ "গণিতজ্ঞ জীবনী"। প্রাচীনতম কাল হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চীনা গণিতকারের বিবরণ ইহাতে আছে। ৪৬খণ্ডে এই গ্রন্থ বিভক্ত। শেষ তিন খণ্ডে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়:—যথা এরিষ্টার্কাস, ইউক্লিড, ক্ল্যাভিয়াস, নিউটন, ক্যাসিনি। অধিকন্তু চীনে যে সকল জেস্যুট পাদ্রী গণিত-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের পরিচয়ও পাই। রিচ্চি (Ricci), শাল (Schaal), ভার্বিয়েষ্ট (Verbiest) ইত্যাদির নাম চীনা মধ্যেযুগে প্রসিদ্ধ।

(৮) "শিহ্-চ্যাও" অর্থাৎ "ইতিহাস চুম্বক" এবং "ঐতিহাসিক চয়ন" চীনা ইতিহাসের এক বিভাগ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে বাছিয়া

কিয়দংশ প্রকাশ করা অনেকে বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিতেন। কন্‌ফিউশিয়াস স্বয়ং এই পথের প্রবর্ত্তক। তাঁহার "শু-কিঙ" বা "ইতিহাস-গ্রন্থ" একশত অধ্যায়ে বিভক্ত। তিনি নাকি ৩২৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত মহাভারত-কল্প গ্রন্থের সারাংশ শুকিংএ ঢালিয়াছেন। ভারতবর্ষের সাহিত্যে এইরূপ সারাংশ বা চুম্বক বা সংক্ষেপ সুপরিচিত। চিকিৎসা-বিভাগে, নীতি-শাস্ত্র বিভাগে, নাট্যশাস্ত্র বিভাগে, এবং অন্যান্য বিভাগে, নাকি বড় বড় মহাভারত ছিল। স্বল্পায়ু মানুষের প্রতি দয়া করিয়া আয়ুর্ব্বেদাদি বিদ্যার প্রবর্ত্তকেরা লাখ শ্লোকের কথা নাকি দশ শ্লোকে বলিয়াছেন। শুক্রনীতির লেখক ভূমিকায় একথা বলিয়া গ্রন্থ সুরু করিয়াছেন। সাঙ আমলে চীনে ১৭ রাজবংশের ইতিহাস ছিল। সেইগুলি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ একজন সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই চয়নিকাই ২৭৩ খণ্ডে বিভক্ত। এইরূপ চয়নকার্য্য চীনে সর্ব্বদাই চলিয়াছে।

(৯) "সমসাময়িক দলিল" নামে এক প্রকার ইতিহাসগ্রন্থ চীনে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় দলিলে ছোট ছোট রাজবংশের বৃত্তান্ত আছে। চীনে বড় বড় সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব প্রায় সকল শতাব্দীতেই দেখা গিয়াছে। অখণ্ড চীনের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র কখনও বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। কাজেই স্বত্ব-প্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ইতিহাস চীনা সাহিত্যের এক বড় বিভাগ।

(১০) "শিহ্-লিঙ্" বা ঋতু-তত্ত্ব বা কালতত্ত্ব ইতিহাসের অন্যতম শাখা। প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আব্‌হাওয়ার পরিবর্ত্তন এই সকল গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

(১১) "তে-লে" বা ভূগোল ও প্রকৃতি-পরিচয়। চীনাদের ভূগোল-সাহিত্য বিরাট্। জগতের আর কোন জাতি স্বদেশের নদ নদী বন পর্ব্বত এরূপ বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিতে চেষ্টা করে

নাই। রাজবংশের ইতিহাস এবং অন্যান্য খাঁটি ইতিহাসগ্রন্থে ভৌগোলিক তত্ত্ব আছেই। স্বতন্ত্র ভৌগোলিক গ্রন্থের পরিমাণও প্রচুর। প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক জেলা, এমন কি প্রত্যেক পল্লীর কথা চীনা "তে-লে" সাহিত্যে বিরাজ করিতেছে। কন্‌ফিউশিয়াসের "শু-কিঙ্" গ্রন্থের যুগ হইতেই চীনাদের ভূগোল-বিদ্যার অনুরাগ বুঝিতে পারি। ভারত-বর্ষের ভূগোল নামক স্বতন্ত্র বিদ্যার অস্তিত্ব ৩২ বিদ্যার তালিকায় পাই না। পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে যত খানি ভূগোল আছে তাহার জোরে ভারতবাসীকে ভূগোলতত্ত্ববিৎ বলা চলে না। স্কন্দ-পুরাণের "কাশীখণ্ড" "সহ্যাদ্রি-খণ্ড" ইত্যাদি নামের উল্লেখ করিলে আমাদের লজ্জা বাড়িবে বৈ কমিবে না।

(১২) "চিহ্ কোয়ান্" বা "রাষ্ট্রসেবকগণের কর্ত্তব্য"। এই নামে এক প্রকার সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। খৃঃ পূঃ নবম দশম শতাব্দীতে "চাও-লি" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। চাও রাজ-বংশের আমলে (খৃঃ পূঃ ১১২২-২৪৯) এই গ্রন্থবর্ণিত নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রকর্ম্ম পরিচালিত হইত। ইহা চীনের "অর্থশাস্ত্র," বা কৌটিল্য-নীতি। দুনিয়ার সাহিত্যে এত পুরাতন "নীতিশাস্ত্র" এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। চাও-লির পর তাঙ্ আমলে রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। তাহার পর অন্যান্য আমলেও চি-কোয়ান্ রচিত হইয়াছে।

(১৩) "চিং-শু" বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা শাসন-বিজ্ঞান। চীনা ইতিহাস-সাহিত্যে এই গ্রন্থাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমুদয়ের সংখ্যাও অনেক। সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থের নাম "তুং-তীয়েন্"। ২০০ খণ্ডে উহা বিভক্ত। ইহা তাঙ যুগের রচনা। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়-(১) ধনবিজ্ঞান ও দেশের আর্থিক অবস্থা (২) সাহিত্য ও শিক্ষার কথা (৩) সরকারী

কাছারীর কথা (৪) নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি (৫) সঙ্গীত (৬) সমরবিভাগ, (৭) ভূগোল (৮) দেশ রক্ষার বিভিন্ন উপায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একখানা গ্রন্থ বিদেশীয় পণ্ডিত মহলে আজকাল বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহার নাম "ওয়ান্-হীয়েন্-তুঙ্-ক্যাও"। লেখকের নাম মা-তোয়াম্-লিন্। প্রত্যেক যুগেই চীনে এইরূপ "শুক্রনীতি" প্রণীত হইয়াছে। আবুল ফজলের "আইনি আকবরীর" মতন হাজার হাজার গ্রন্থ চীনা সাহিত্যে পাওয়া যায়।

(১৪) "গ্রন্থতালিকা" নামক গ্রন্থের সংখ্যা চীনা সাহিত্যে অপর্য্যাপ্ত। চীনারা লেখা পড়ায় ওস্তাদ। প্রত্যেক যুগেই তাহারা গ্রন্থশালায় আদর করিয়াছে। কাজেই গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করাও আবশ্যক হইয়াছে। এই তালিকাগুলি আলোচনা করিলে চীনা শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বুঝা যাইতে পারে। ভারতবাসী এ বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র নহেন। গ্রন্থশালায় মর্য্যাদা এবং গ্রন্থতালিকার মূল্য প্রাচীন এবং মধ্য যুগের হিন্দু পণ্ডিতেরা ও রাজ-রাজড়ারা বেশ বুঝিতেন। এখনও প্রত্যেক অর্দ্ধ স্বাধীন বা করদ রাষ্ট্রের সরকারী লাইব্রেরী সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমুদয়ের গ্রন্থতালিকাও আছে। এই তালিকাগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া আউফ্রেক্ট্ "ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম" প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৫) "শিহ্-পিঙ্" বা "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।" লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ঐতিহাসিক তথ্যের ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এইগুলিকে চীনা "ইতিহাস-বিজ্ঞান" বলিতে পারি। একাদশ শতাব্দীর একজন লেখক পূর্ব্ববর্ত্তী তাঙ্ আমলের চীনাজীবন সমালোচনা করিয়া একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক রাজকর্ম্মচারী আফিস হইতে ছুটি লইয়া

একখানা বই লেখেন। তাহাতে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহায় সময় পর্যান্ত প্রসিদ্ধ চীনা রাষ্ট্রবীরগণের কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইয়োরামেরিকানেরা এশিয়াবাসীকে কাণ্ডজ্ঞানহীন গরু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা চীনা সাহিত্যের এই পনর দফা ইতিহাস-গ্রন্থাবলীর তালিকা দেখিলেই নিজেদের বেকুবি বুঝিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন—"পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থাবলীর পাশে চীনা ইতিহাস-গ্রন্থসমূহ নিতান্ত ছেলেখেলা নয় কি?" জবাব—"উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস-সাহিত্য ইয়োরোপে সে দিন মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সাহিত্যসংসারে ইতিহাসের মতন ইতিহাস ছিল না।" বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ গিবন ইংরাজি সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হিউম্ এবং রবার্টসন দুইখানা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। আজকাল সেই গ্রন্থদ্বয়ও "বাতিল" হইয়া গিয়াছে। একমাত্র গিবন-প্রণীত "রোমান সাম্রাজ্যের ক্রমপতন" বিংশ শতাব্দীতেও পণ্ডিতগণের শিরোধার্য্য। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৭৭৬—১৭৮৮। অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অন্যান্য ইতিহাস-গ্রন্থ আজকাল ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় না। বড় বড় ইংরেজ ঐতিহাসিক সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর লোক। ভূ-তত্ত্ব (জিয়লজি) এবং প্রাণ-বিজ্ঞান (বায়োলজি) এই দুই বিদ্যার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-রচনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং এই যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থের সঙ্গে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগের ইতিহাস-লেখকের রচনা তুলনা করা চলে না। এই কথা মনে রাখিলে বুঝিব যে চীনারা ইতিহাস-সাহিত্যে জগতে অদ্বিতীয়।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের চীনা অনুবাদ।

চীনে ভারত-প্রভাব একমাত্র ধর্ম্মক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল না। চীনা-জাতির সমগ্র জীবনধারাই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল। সেই বিরাট ভারত-প্লাবনের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। চীনারা নিজে এই প্লাবনের ধর্ম্ম-বিভাগটার ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্য চীনা ভাষায় অসংখ্যবার অনূদিত হইয়াছে। চীনা পণ্ডিত এবং ভারতীয় পণ্ডিত উভয়ের সমবায়ে এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। অনুবাদগুলি অনেকবার সম্রাটগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইয়াছে। অনেকবার এই গ্রন্থসমূহের তালিকা-গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে। অনেকবার অনুবাদ গ্রন্থগুলি মুদ্রিত করানও হইয়াছে।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, অন্ততঃ দ্বাদশ বার বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদগুলি রাজদরবার কর্ত্তৃক লাইব্রেরিতে একত্র করা হইছিল।

(১) ৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংগ্রহ হয়। লিয়াঙ্ বংশের প্রবর্ত্তক উ-তি (৫০২-৪৯) তখন রাজা ছিলেন।

(২) ৫৩৩-৩৪ সালে দ্বিতীয় সংগ্রহ। উত্তর উ-ই বংশের তখন রাজত্বকাল।

(৩) ৫৯৪ (৪) ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ও চতুর্থ সংগ্রহ। এই সংগ্রহের প্রবর্ত্তক ছিলেন সুইবংশের স্থাপয়িতা সম্রাট্ ওয়ান্-তি (৫৮৯-৬০৪)।

(৫) ৬০৫-৬১৬ সালে পঞ্চম সংগ্রহ। সুইবংশের দ্বিতীয় সম্রাট প্রবর্ত্তক।

(৬) ৬৯৫ সালে ষষ্ঠ সংগ্রহ। তাঙ্ বংশের সম্রাজ্ঞী উ (৬৮৪-৭০৫) এই সংগ্রহের প্রবর্ত্তক।

(৭) ৭৩০ সালে সপ্তম সংগ্রহ। তাঙ্ সম্রাট হুয়েন-চুঙ্ (৭১৩-৫৫) প্রবর্ত্তক।

(৮) ৯৭১ সালে অষ্টম সংগ্রহ। দ্বিতীয় সুঙ্ বংশের স্থাপয়িতা (৯৬০-৭৫) প্রবর্ত্তক।

(৯) ১২৮৫-৮৭ সালে নবম সংগ্রহ। মোগলবংশের স্থাপয়িতা (১২৮০-৯৪) ইহার প্রবর্ত্তক।

(১০) ১৩৬৮-৯৮ সালে দশম সংগ্রহ। মিঙ্ বংশের স্থাপয়িতা প্রবর্ত্তক।

(১১) ১৪০৩-২৪ সালে মিঙ্ বংশের তৃতীয় সম্রাট একাদশ সংগ্রহ প্রবর্ত্তন করেন।

(১২) ১৭৩৫-১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ সংগ্রহ। মাঞ্চু সম্রাট্ শি-চুঙ (১৭২৩-৩৫) এবং কাও-চুঙ্ (১৭৩৬-৯৫) এই সংগ্রহের প্রবর্ত্তক।

প্রত্যেক রাজবংশের আমলেই বৌদ্ধ সাহিত্যের সংগ্রহকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সংগ্রহ সরকারী সংগ্রহ। জনসাধারণ কর্ত্তৃক সংগ্রহের কথা স্বতন্ত্র। রাজ দরবারে লাইব্রেরিতে এই সকল গ্রন্থ রক্ষিত হইত।

চীনা অনুবাদগুলি বহুকাল পর্য্যন্ত হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নয়শত বৎসর কাল ভারতীয় ধর্ম্মের প্রচার হইবার পর ধর্ম্ম-সাহিত্যের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (৬৭) বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম অনূদিত হইয়াছিল। কিন্তু ৯৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের কোন অনুবাদই ছাপান হয় নাই। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত একহাজার বৎসরের ভিতর বহুবার

চীনা বৌদ্ধ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। কতিপয় মুদ্রিত সংস্করণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) ৯৭২ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় সুঙ্ বংশের স্থাপয়িতা মুদ্রণ-কার্য্যের প্রবর্ত্তক।

(২) ১০১০ সাল। কোড়ীয়ার নরপতি ক' ধর্ম্মসাহিত্যের মুদ্রণ করাইয়াছিলেন। এই সংস্করণের একখানা বই আজও জাপানে দেখা যায়।

(৩) ১২৩৯ সাল। দক্ষিণ সুঙ্ বংশের রাজত্বকালে এক ব্যক্তি এই সংস্করণ ছাপাইয়াছিলেন। প্রকাশকের নাম নাই। জাপানে এই বই আছে।

(৪) ১২৭৭-৯০ সাল মোগল আমলে এক ব্যক্তি এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। নাম জানা যায় না। এই বই জাপানে পাওয়া যায়।

(৫) ১৩৬৮-৯৮ সাল। মিঙ্ বংশের স্থাপয়িতা এই সংস্করণের প্রকাশক।

(৬) ১৪০৩-২৪ সাল। মিঙ্ বংশের তৃতীয় সম্রাট্ প্রকাশক।

(৭) ১৫০০ সাল। একজন চীনা ভিক্ষুণী প্রকাশক। নাম ফা-কান। ইনি খাঁটি চীনা কায়দায় বই বাঁধাইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে যে সমুদয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল সেইগুলি ভারতীয় পুঁথির আকারে বাহির করা হয়। গ্রন্থ ব্যবহার করিতে পাঠকগণের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই কারণে ফা-কান নূতন রীতি অবলম্বন করেন।

(৮) ১৫৮৬-১৬০৬। চীনা পুরোহিত মি-চাঙ্ প্রকাশক। তিনি ফা-কানের প্রদর্শিত প্রণালীতে বইগুলি ছাপাইয়াছিলেন।

(৯) ১৬২৪-৪৩ জাপানী পুরোহিত তেন্-কাই প্রকাশক। এই সংস্করণই জাপানী বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রথম স্বদেশী ছাপা বই।

(১০) ১৬৭৮-৮১। জাপানী পুরোহিত দো-কো বা তেৎ-চু-গেন প্রকাশক। ইনি জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া বই ছাপাইয়াছিলেন।

(১১) ১৭৩৫-৩৭। মাঞ্চুবংশের দুই সম্রাট ইহার প্রকাশক।

(১২) ১৮৬৯। একজন চীনা পণ্ডিত এবং একজন চীনা পুরোহিত সমবেতভাবে এই সংস্করণ প্রকাশ করেন।

(১৩) ১৮৮১। জাপানী বৌদ্ধ পরিষৎ হইতে এই সংস্করণের প্রকাশ হইয়াছে।

এই ধরণের নব নব সংস্করণ চীনে বহুবার হইয়াছে। সকল সংস্করণের সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সংস্করণের বইও আজকাল নাই। অসংখ্য বিপ্লবে পুস্তকাদি লুপ্ত হইয়াছে। অধিকন্তু অগ্নিকাণ্ডও গ্রন্থনাশের জন্য দায়ী।

এইবার চীনা বৌদ্ধ-সংস্কৃত-সাহিত্যের তালিকাগুলির নাম করিতেছি। সর্ব্বসমেত তেরবার এইরূপ ক্যাটালগ প্রকাশিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ সংখ্যক তালিকা মিঙ্ আমলে (১৩৬৮-১৬৪৪) প্রস্তুত করা হয়। তারিখ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ। এই তালিকাখানা জাপানী পণ্ডিত বুনিউ নানজিউ কর্ত্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে (১৮৮৩)। প্রকাশক অক্‌স্‌ফোর্ডের ক্লারেণ্ডন প্রেস। প্রবর্ত্তক বিলাতের ভারত-দরবার।

এই ক্যাটালগে ১৬৬২ খানা গ্রন্থের নাম আছে। এই সমুদয়ের মধ্যে ৩৪২ খানা বিবিধ—অপর গুলি "ত্রিপিটক" শাস্ত্রের অন্তর্গত। গ্রন্থসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) "সূত্র" পিটক

ক। মহাযান সূত্র

১। প্রজ্ঞাপারমিতা জাতীয় নং ১-২২		গ্রন্থ সংখ্যা।
২। রত্নকূট জাতীয়	২৩-৬০	,,
৩। মহাসন্নিপাত ,,	৬১-৮৬	,,
৪। অবতংশক ,,	৮৭-১১২	,,
৫। নির্ব্বাণ ,,	১১৩-১২৫	,,

৬। দুইখানা করিয়া অনুবাদ আছে এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫০। এইগুলি উপরের পাঁচ শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। নং ১২৬-৩৭৫ ,,

৭। একখানা মাত্র অনুবাদ আছে এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ১৬৬। এইগুলি উপরের পাঁচ শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। নং ৩৭৬-৫৪১ ,,

খ। হীনযান-সূত্র

১। আগম জাতীয়	৫৪২-৬৭৮	,,
২। অপর বিধ	৬৭৯-৭৮১	,,

গ। সুঙ্ (৯৬০-১২৮০) এবং মোগল (১২৮০-১৩৬৮) আমলে কতকগুলি মহাযান এবং হীনযান সূত্র অনূদিত হয়। এইগুলিও ত্রিপিটকের সামিল ৭৮২-১০৮১ ,,

(২) "বিনয়" পিটক

ক। মহাযান বিনয় নং	১০৮২-১১০৬	,,
খ। হীনযান বিনয়	১১০৭-১১৬৬	,,

(৩) "অভিধর্ম্ম" পিটক

ক। মহাযান অভিধর্ম্ম	১১৬৭-১২৬০	,,
খ। হীনযান অভিধর্ম্ম	১২৬১-১২৯৭	,,

গ। সুঙ্ এবং মোগল আমলে কতকগুলি অভিধর্ম্ম ত্রিপিটকের সামিল করা হয়।[1]—নং ১২৯৮-১৩২০

(৪) বিবিধ

ক। "পাশ্চাত্য দেশ" অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঋষি ও পণ্ডিতগণের বিরচিত গ্রন্থাবলী ১৩২১-১৪৬৭

খ ১। "এই দেশ" অর্থাৎ চীনের গ্রন্থাবলী ১৪৬৮-১৬২১

২। মিঙ্ আমলে কতকগুলি চীনা গ্রন্থ ত্রিপিটকের সামিল করা হয় ১৬২২-১৬৫৭

৩। মিঙ্ আমলে নান্‌কিঙ্ নগরে প্রথম ক্যাটালগ প্রস্তুত হয়। তাহার পর তৃতীয় সম্রাটের আদেশে পিকিঙ্ নগরে ক্যাটালগের নূতন সংস্করণ তৈয়ারি হয়। নান্‌কিঙের সংস্করণে কতকগুলি বেশী গ্রন্থের নাম ছিল। সেইগুলি পিকিঙের সংস্করণেও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ১৬৫৮-৬২।

মিঙ্ আমলের এই ক্যাটালগখানাই শেষ পর্য্যন্ত চীন, কোড়ীয় ও জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বেদস্বরূপ রহিয়াছে। ১৬৭৮-৮১ খৃষ্টাব্দে জাপানী ভিক্ষু দো-কো এই তালিকাই জাপানে প্রকাশ করিয়াছিলেন। চীনাদের বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই তালিকা ঘাঁটিতে হইবে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ত্রিপিটকসমূহের ক্যাটালগ চীনারা তৈয়ারি করিয়া আসিতেছে। কোনখানার নাম "ত্রিপিটক তালিকা," কোন খানার নাম "ত্রিরত্ন সংগ্রহ" কোনখানার নাম "শাক্যমুনির উপদেশ-সংগ্রহ," কোন খানার নাম "ধর্ম্মরত্ন তালিকা" ইত্যাদি। সর্ব্বসমেত ১৩ খানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ৫২০ খৃঃ অঃ। প্রথম ক্যাটালগ। এই তালিকায় ২২১৩ খানা গ্রন্থের নাম ছিল। সান্‌-ইউ নামক এক চীনা ভিক্ষু তালিকা প্রস্তুত করেন। ৬৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। অতএব দেখা

যাইতেছে যে, প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৪ খানা করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রাচীন তালিকায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ২১৬ খানা মিঙ্ আমলের ত্রিপিটক তালিকায় আজও পড়িয়া যায়।

(২-৪) সুই রাজবংশের আমলে তিনখানা ক্যাটালগ প্রস্তুত করান হয়। তারিখ ৫৯৪,৫৯৭, ৬০৩ খৃঃ অঃ। দ্বিতীয় ক্যাটালগে ২২৫৭ খানা, তৃতীয় ক্যাটালগে ১০৭৬ খানা, এবং চতুর্থ ক্যাটালগে ২১০৯ খানা গ্রন্থের নাম আছে। তিনখানা ক্যাটালগে তিন স্বতন্ত্র শ্রেণী বিভাগ অবলম্বিত হইয়াছিল। সুই সম্রাট্ অতিশয় ভারত-ভক্ত ছিলেন। তিনি চীনে "বর্ণাশ্রম" প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ করেন।

(৫) ৬৬৪ খৃঃ অঃ। ইহাতে ২৪৮৭ খানা গ্রন্থের নাম আছে।

(৬) এই বৎসরেই আর একখানা ক্যাটালগ প্রস্তুত হয়। তাহাতে গ্রন্থসংখ্যা ১৬২০।

(৭) ৬৯৫ খৃঃ অঃ। গ্রন্থসংখ্যা ৩৬১৬। এতদ্ব্যতীত ৮৯৫ খানা নূতন গ্রন্থ ত্রিপিটকের সামিল করা হয়। অধিকন্তু ২২৮ খানা "বিবিধ" গ্রন্থের নামও পাওয়া যায়।

(৮-১০) ৭৩০ খৃঃ অঃ। তিন খানা ক্যাটালগ তৈয়ারি হয়। প্রথম খানা সুবিস্তৃত। ২২৭৮ খানা গ্রন্থের নাম আছে। দ্বিতীয়খানা প্রথমের সংক্ষেপ মাত্র। তৃতীয়খানা প্রথমের জের। ১৬৩ নূতন গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

(১১) ১২৮৫-৮৭ খৃঃ অঃ। ১৪৪০ খানা গ্রন্থের নাম আছে।

(১২) ১৩০৬ খৃঃ অঃ। সুঙ্ আমলে আরম্ভ করা হয়—মোগল আমলে সমাপ্ত। এই ক্যাটালগ একাদশ সংখ্যকেরই অনুকরণ মাত্র।

(১৩) ১৬০০ খৃঃ অঃ। মিঙ্ আমলের ক্যাটালগ।

মিঙ্-আমলের চীনা "ত্রিপিটক" তালিকায় ৫৯ জন ভারতীয় গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ইহাঁদের কেহ কেহ বিশ পঁচিশখানা গ্রন্থের লেখক বলিয়া বিবৃত। নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) মৈত্রেয় (২) অশ্বঘোষ (৩) নাগার্জ্জুন (৪) দেব (৫) অসঙ্গ (৬) বসুবন্ধু (৭) স্থিরমতি (৮) আর্য্যশূর (৯) শুদ্ধমতি (১০) জিন (১১) স্থিত মতি (১২) অগোত্র (১৩) শঙ্করস্বামিন্ (১৪) ভাববিবেক (১৫) বন্ধুপ্রভা (১৬) ধর্ম্মপাল (১৭) জিনপুত্র (১৮) গুণদ (১৯) ধর্ম্মযশস্ (২০) পদ্মশীল (২১) সুমুনি (২২) বুদ্ধশ্রী জ্ঞান (২৩) ত্রিরত্নার্য্য (২৪) শ্রীগুণরক্তাম্বর।

এই চব্বিশ জন "বোধিসত্ত্ব" রূপে বিবৃত। নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণ "অর্হৎ" ও "আর্য্য" নামে পরিচিত।

(২৫) সারিপুত্র (২৬) উপতিষ্য (২৭) মহামৌদ্গলায়ন (২৮) কাত্যায়নীপুত্র (২৯) দেবশর্ম্মন্ (৩০) ঘোষ (৩১) ধর্ম্মত্রাত (৩২) পঞ্চমহাইকৃথতানি (?) (৩৩) বসুমিত্র (৩৪) তাও লুয়ে (এই ব্যক্তির আসল ভারতীয় নাম উদ্ধার করা কঠিন) (৩৫) সঙ্ঘরক্ষ (৩৬) বসুভদ্র (৩৭) সঙ্ঘসেন (৩৮) নাগসেন (৩৯) উপশান্ত (৪০) হরিবর্ম্মণ (৪১) চিয়া তিন (ভারতীয় নাম অনাবিষ্কৃত) (৪২) বুদ্ধিমিত্র (৪৩) বুদ্ধত্রাত (৪৪) বসু বর্ম্মণ (৪৫) গুণমতি (৪৬) ঈশ্বর (৪৭) উল্লজ্য (৪৮) সঙ্ঘভদ্র (৪৯) নন্দিমিত্র (৫০) সুগন্ধর (৫১) জিনমিত্র (৫২) বৈশাখ্য (৫৩) মাতৃকেত (৫৪) শাক্যযশস্ (৫৫) সমন্তভদ্র (৫৬) মুনিমিত্র। (৫৭)

গ্রন্থকারগণের মধ্যে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। শীলাদিত্য। ইহাঁর প্রণীত পুস্তিকার নাম "অষ্ট মহাশ্রীচৈত্য সংস্কৃত স্তোত্র।" ইহা প্রধান প্রধান আটটা চৈত্যের মঙ্গলাচরণ। ইনি কোন্ শীলাদিত্য কে জানে? দুই জন "তীর্থক" বা সদ্ধর্ম্মদ্রোহীর

নাম দেখিতেছি। (৫৮) কপিল। ইনি সাঙ্খ্যদর্শনের ঋষি বলিয়া পরিচিত। (৫৯) জ্ঞানচন্দ্র। ইনি বৈশেষিক দর্শনের অধ্যাপক।

এই ৫৯ ভারতীয় গ্রন্থকারের মধ্যে কেহ চীনে আসিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। বলা বাহুল্য ইহাঁরা কোন এক যুগ বা এক প্রদেশের লোক নন। ইহাঁরা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন। সংস্কৃত ভাষা শৈব বৈষ্ণব শাক্ত দিগেরই একচেটিয়া ভাষা নয়। বৌদ্ধধর্ম্মও সংস্কৃত ভাষায়ই প্রচারিত হইয়াছিল। পালিভাষায় শাক্যসিংহের মত প্রচারিত হয়। কিন্তু শাক্যসিংহ যখন বুদ্ধাবতার হইলেন তখন পালি সাহিত্যের পসার আর ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা শাক্যসিংহের প্রচারিত মতবাদ নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম শাক্যসিংহের তিরোধানের বহুশতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কৃতসাহিত্যে নিবদ্ধ। আর এই বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যই চীনা বৌদ্ধদিগের রসদ জোগাইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে চীনা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃত গ্রন্থগুলি চীনাভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য নানাদেশের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় এবং চীনা প্রচারকগণ ত ছিলেনই। অধিকন্তু মধ্য-এশিয়া আফগানিস্থান, তিব্বত, শ্যাম, ইন্দো-চীন ইত্যাদি জনপদের বৌদ্ধগণও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। সমগ্র এশিয়াই ভারততত্ত্বের প্রচারক ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবার সময় এ কথাটা মনে রাখা আবশ্যক।

মিঙ্-আমলের তালিকায় ১৭৩ জন অনুবাদকের নাম আছে। ইহাঁরা নানা যুগের লোক। এতদ্ব্যতীত বহু অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না।

বুনিউ নান-জিউ সম্পাদিত ক্যাটালগ খানা ভারতীয় পণ্ডিতমহলে

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা হইতে ঘাঁটিয়া ভারতীয় ইতিহাসের তথ্য এখনও বাহির করা হয় নাই। এই সঙ্গে বীল প্রণীত "চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য" গ্রন্থও আমাদের ঘাঁটা আবশ্যক।

চীনা "শিল্প-শাস্ত্র"।

আমরা ভারতে ৬৪ "কলা"র কথা জানি। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এই গুলির উল্লেখ আছে—শুক্রনীতিতেও আছে। ইংরেজীতে "আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌টস" বলিলে যাহা বুঝি আমাদের কলাশব্দে প্রায় তাহাই বুঝায়। 'ফাইন আর্টস্' বা সুকুমার শিল্প ছাড়াও অনেক বস্তু এই কলার অন্তর্গত।

৬৪ কলা সম্বন্ধে নানা গ্রন্থই ভারতীয় সাহিত্যে আছে। এই সমুদয় নানা নামে পরিচিত। সাধারণ নাম শিল্পশাস্ত্র। অন্যান্য নাম ময় শাস্ত্র, ময় মত, ময় বিদ্যা ইত্যাদি। ময় নামক মানুষ বা দেবতা বা অসুর এই সকল শাস্ত্রের প্রবর্তক। এতদ্ব্যতীত শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ অনুসারেও বিশিষ্ট সাহিত্যের নাম আছে—যথা, বাস্তবিদ্যা, "চিত্র লক্ষণ" ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থ আমরা অনেকেই চোখে দেখি নাই। কিন্তু প্রায় শতাধিক পুথির নাম আউফ্রেক্ট সম্পাদিত 'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম' গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ত্রিবেন্দ্রাম হইতে বাস্তবিদ্যা নামক একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে 'মানসার' নামক গ্রন্থের তথ্য মহিশূরের পণ্ডিত রামরাজ প্রণীত "হিন্দু আর্কিটেকচার" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। রামরাজের গ্রন্থ বিলাতে মুদ্রিত হয়। সে অনেক দিনের কথা। আজকাল

আমাদের দেশে সুকুমার শিল্পের নানা আলোচনা সুরু হইয়াছে। মনোমোহন গাঙ্গুলী প্রণীত "উড়িষা শিল্প" গ্রন্থে মানসার ব্যবহৃত দেখিতে পাই। মানসারের উল্লেখ সকলেই করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শুক্রনীতির ক্রেক অধ্যায়ে শিল্প বিষয়ক নানা কথা আছে। কালে শুক্রনীতির উল্লেখও আজকালকার শিল্পসমালোচনায় দেখিতে পাই। এই মানসার ও শুক্রনীতি ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ আমাদের পণ্ডিত মহলে এখনও সুপ্রচারিত নয় বলিতে হইবে। যুক্তিকল্পতরু নামক পুঁথি, রুদ্রসংহিতা এবং রামায়ণ মহাভারতও আধুনিক শিল্প সাহিত্যের আলোচনায় মাঝে মাঝে স্থান পায়। কিন্তু খাঁটি শিল্পশাস্ত্রের পরিচয় আজও আমরা পাই নাই বলিতে বাধ্য—তবে সঙ্গীত কলার বিভাগ হইতে কয়েকখানা সংস্কৃত গ্রন্থ আজকালকার সাহিত্য সংসারে দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

সকল প্রকার শিল্পেই চীনাদের নামডাক খুব বেশী। এই নামডাক আজকালকার কথা নয়। অতি প্রাচীন কালেও চীনা জাতিকে পাকা শিল্পী বলিয়া জগতের লোক জানিত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দুইজন মুসলমান পর্য্যটক সমুদ্রপথে চীনে আসেন। তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আরবী হইতে পারসীভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদক ছিলেন রেণদো (Renandot)। সেই ফরাসী অনুবাদের ইংরেজি অনুবাদ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য—কিন্তু নবম শতাব্দীর এশিয়া সম্বন্ধে নানা কথা ইহাতে জানা যায়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু আজগুবি গল্পও ইহার মধ্যে পাই। অধিকন্তু ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারত মহাসাগরের জাহাজকোম্পানী এবং চীনা, হিন্দু ও মুসলমান সমুদ্রবাণিজ্যের কথা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইবে।

দ্বিতীয় পর্য্যটকের নাম আবু জীদ্ আল হাসান। ইনি শিরাজের লোক। ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারত হইয়া চীনে আসেন। এই পর্য্যটক বলিতেছেন—"চীনারা জগতের সকল জাতিকেই যে কোন শিল্পে পরাস্ত করিতে পারে। চিত্রবিদ্যায় ইহারা বিশেষ পারদর্শী। চীনাদের হস্তশিল্প-নানাবিধ। এই বিষয়ে চীনাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে এমন কোন লোক নাই। বস্তুতঃ অন্যান্য জাতি চীনাদের হাত সাফাই দেখিয়া বিস্মিত হইবে। এমন কি চীনাদেরকে অনুকরণ করিয়া চীনা উৎকর্ষলাভ করাও অন্যের পক্ষে কঠিন।"

মুসলমান পর্য্যটক মহাশয় চীনা শিল্প-সংসারের একটা দস্তুর লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে শিল্প-সমালোচনার রীতি বুঝা যায়। ইনি বলিতেছেন— চিত্রকর তাঁহার হাতের কাজ লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন। বকশিষ বা ইনাম পাওয়াই উদ্দেশ্য। রাজা তৎক্ষণাৎ শিল্পীকে পারিশ্রমিক বা পুরস্কার প্রদান করেন না। রাজপ্রাসাদের ফটকের সম্মুখে শিল্পী তাঁহার চিত্র রাখিতে আদিষ্ট হন। এক বৎসর কাল ইহা ঐখানেই থাকে। রাস্তার লোক, বাজারে লোক, মুটে-মজুর, আর্দালী পেয়াদা, ম্যাণ্ডারিণ, পুরোহিত, পণ্ডিত, মন্ত্রী, আমীর ওমরাহ. ঝী, চাকর সকলেই চিত্রটা যখন তখন দেখিতে পায়। সকলেই একটা করিয়া ভালমন্দ বলিতেও অধিকারী। এইরূপে এক বৎসর ধরিয়া বাজারে যাচাই চলিতে থাকে। একবৎসরের মধ্যে এই খোলা মাঠের সমালোচনায় চিত্রের কোন দোষ বাহির না হইলে শিল্পী ইনাম পাইবেন। তখন শিল্পীকে শিল্পের ওস্তাদমহলে আসন দেওয়া হইবে। কিন্তু সামান্য মাত্র ত্রুটিও যদি রাস্তার কোন লোক দেখাইতে পারে তাহা হইলে শিল্পীকে সমাদর করা হইবে না। রাস্তার লোকেরাই এখানে সমজদার এবং পরীক্ষক। কিছুদিন হইল এক ব্যক্তি শস্যের

শীষ আঁকিয়াছিল। এই শীষের উপর একটা পাখী-বসান ছিল। রেশমের জমিনের উপর চিত্রটা আঁকা। রাজ-প্রাসাদের ফটকের সম্মুখে এইটা যথারীতি রক্ষিত হইল। সকলেই ইহার যারপরনাই তারিফ করিতে থাকিল। যে দেখিত সেই বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিত। কেহই কোন দোষ বাহির করিতে পারিল না। এমন সময়ে একটা বে-আক্কেল লোক বলিল-'এই ছবি পুরস্কার যোগ্য নয়। ইহাতে দোষ আছে। শিল্পীর হাত এখনও পাকে নাই।' রাজদরবারে লোকটার মত জানান হইল। সকলেই অবাক। এই ব্যক্তিকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল; দরবারে চিত্রকরও স্বয়ং উপস্থিত। লোকটা নির্ভয়ে রাজাকে বলিতে লাগিল 'শীষের উপর পাখী বসিয়াছে। বেশকথা। কিন্তু চিত্রে দেখিতেছি শীষটা খাড়াই রহিয়াছে। ইহা নোয়াইয়া পড়া উচিত ছিল না কি? পাখীটা তুলার মতন হালকা নয়! চিত্রকর এই সামান্য কথাটাই জানেন না। কাজেই এই শিল্প অতি নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য।' সভার লোকজন সকলেই 'সাধু' 'সাধু' করিয়া উঠিল। শিল্পী ইনাম পাইলেন না।

প্রাচীন গ্রীসের শিল্প সমালোচনাও ঠিক এই ধরণের ছিল। কেবল শিল্প কেন—গ্রীক জাতির সাহিত্যও বাজারের যাচাইয়েই চলিয়া থাকিত। বড় রাস্তার ধারে গ্রীক স্থপতিগণের হাতের কাজ সর্ব্বদা রক্ষিত হইত। "ফোরামে"র মাঠে ও হর্ম্ম্যে তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য জনগণের পরীক্ষার বস্তু ছিল। হাটে বাজারে বক্তৃতা করিয়া কর্ম্ম-কর্ত্তারা যশস্বী হইতেন। প্রকাশ্য সভায় সকল নগরের অধিবাসীদিগের সম্মুখে নাচিয়া গাহিয়া অভিনয় করিয়া গ্রীক সাহিত্যবীরগণ প্রশংসা লাভ করিতেন। ইস্কীলাস, সফক্লীস, ফিডিয়াস, প্র্যাক্‌সিটেলিস, ডিমস্থেনীস, আইসক্রেটিশ, ইহারা সকলেই বাজারের যাচাইয়েই মানুষ।

নিন্দা প্রশংসা, সুনাম কুনাম বিতরণের জন্য গ্রীক সমাজে কোন প্রকার দরজা-বন্ধ-করা পরীক্ষা গৃহ ছিল না। পাশ ফেল ছোট বড় বিচারের জন্য সময় নষ্ট করা হইত না। হাট বাজার মাঠ ঘাটই গ্রীক বীরগণের দর ঠিক করিবার আড্ডা। "জনসাধারণে"র বাণীই শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে চরম মত ছিল। উহাই খাঁটি জুরির বিচার—দেশের মত। মধ্যযুগে ধর্ম্মমন্দিরে এবং মঠে শিল্পকার্য্য প্রধানতঃ সংগৃহীত হইত। তখনও শিল্পীদিগের পরীক্ষক থাকিত জনসাধারণ। প্রকাশ্য স্থানে খোলা বাজারে ওস্তাদগণের কার্য্য পরীক্ষিত হইতে পারিত। লোক-মত উল্টা হইলে কোন ব্যক্তিই মন্দিরে মঠে চিত্রশালায় স্থান পাইতেন না। বাজে মাল শীঘ্রই ঝরিয়া পড়িত। এশিয়া ও ইয়োরোপ দুই ভূখণ্ডেই শিল্পসমালোচনার এই দস্তুর ছিল। এই জন্যই পুরাণা কারিকরগণের কাজ আজও এত প্রশংসিত হইতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে কিন্তু প্রাচীন শিল্পের মর্য্যাদা কমিতেছে না। জনসাধারণের রুচি এবং অন্য প্রদেশের কঠোর সমালোচনার কষ্টিপাথরে সেই শিল্প দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কাজেই তাহার মার নাই। বর্ত্তমান যুগের আর্ট্ গ্যালারিগুলি সেইরূপ জনসাধারণের "ফোরম" বা "প্রাসাদের ফটক" বা মন্দির মঠ বা "গোলদীঘি" নয়। এই জন্যই খোলা হাওয়ায় নিরপেক্ষ সমালোচনা আজকালকার শিল্প সম্বন্ধে না হইবারই কথা। এই কারণেই নব্য যুগের অনেক বস্তুই ঝরিয়া যাইতে বাধ্য। সাময়িক প্রশংসা লাভে শিল্পীরা শেষ পর্য্যন্ত অমর হইতে পারিবেন না। "লোকে যারে নাহি ভুলে" এইরূপ ভাগ্য একমাত্র জনসাধারণের বিচারেই সম্ভব—কোন দরজা-বন্ধ-করা সমালোচনা-পরিষদের সুনজর কুনজরে নয়। সেনেটহাউস, অ্যাকাডেমী বা পরিষদের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেই অমর

হওয়া যায় না। গোলদীঘির পরীক্ষায় যিনি পাশ হইবেন তিনিই অমর।

চীনারা শিল্পসৃষ্টি করিতে মজবুত ছিল। আবার শিল্পকর্ম্মের সংগ্রহ কার্য্যেও চীনারা খুব পাকা। আজকাল ইয়োরামেরিকায় ধনবান বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতেরা নানা বস্তু সংগ্রহ করিয়া থাকেন। একথা সকলেই জানি। কিন্তু চীনাদের এই বাতিক্ অতি প্রাচীন। মধ্য-যুগে অনেক ব্যক্তি শিল্প-সংগ্রাহক বা প্রত্নব্যবসায়ী হইয়া চীনা সমাজে নাম করিয়াছেন। আরও প্রশংসাযোগ্য কথা এই যে, চীনারা চিরকালই শিল্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ সম্বন্ধেও বিবরণ লিখিত হইয়াছে। শিল্পকর্ম্ম রাখিবার বা যাচাই করিবার প্রণালী সম্বন্ধেও নানা মত প্রচারিত হইয়াছে! এই জন্য শিল্প-সমালোচনার ঘর চীনাসাহিত্যে বেশ বড়। বস্তুতঃ সাহিত্য সমালোচনা এবং শিল্প সমালোচনা দুইই চীনা পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে নানা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনারা সমজদার জাতি।

(১) চিত্রকলা ও হস্তলিপি।

চীনা অক্ষরগুলি এক একটা ছবির মতন। অক্ষর লিখিতে পারা চীনে একটা বিশেষ বাহাদুরী। হাতের লেখা এই কারণে এক বড় শিল্প। ছবি আঁকা আর হস্তলিপি দুইই এক কলা। হাতের লেখায় উৎকর্ষের জন্য অনেকেই নামজাদা হইয়া গিয়াছেন। ভাল হাতের লেখার জন্য পুরস্কার বিতরণ আজকালও হইয়া থাকে। দরবারী উচ্চতম কার্য্যের জন্য এখনও চীনারা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য লয় না—পাকা লেখকের সাহায্য গ্রহণ করে। কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বা কর্ম্মবীরকে অভিনন্দন পত্র দিতে হইলে লম্বা রেশমের কাগজে হাতের লিখায়

বক্তব্য প্রকাশিত করা হয়। এই ধরণের এক এক খানা অভিনন্দন পত্রের খরচ প্রায় দুইশত তিনশত টাকা পড়ে। বলা বাহুল্য আরও বেশী খরচ হইতে পারে।

আমরা ভারতবর্ষে হস্তলিপিকে এত বড় সম্মান প্রদান করি না। ইয়োরোপেও ইহার এরূপ সমাদর নাই। অবশ্য মধ্যযুগে এশিয়ায় এবং ইয়োরোপে উভয়ত্রই হাতের লেখার মর্য্যাদা খুব বেশী ছিল। তখনকার দিনে হিন্দুশাস্ত্র, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে লিখিবার জন্য পণ্ডিত মৌলবী পুরোহিতেরা এবং এমন কি রাজরাজড়া-গণও চিরজীবন উৎসর্গ করিতেন। ঐরূপ লিপিকার্য্যে সময় প্রদান করাই ধর্ম্মও বিবেচিত হইত। সে দিন আর আজকাল নাই। ছাপা-খানার প্রভাবে হস্তলিপির আদর দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু চীনা সমাজে হস্তলিপির আদর ছাপাখানার প্রভাবেও কমে নাই। চীনারা অক্ষর ছাপিবার কৌশল অতি প্রাচীন কালেই আবিষ্কার করিয়াছিল। ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্র সেদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বহু পূর্ব্বে চীনারা অক্ষর ছাপিবার প্রণালী প্রবর্ত্তন করে। বস্তুতঃ চীনাদের দৃষ্টান্তেই ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। তথাপি চীনে হস্তলিপির আদর কমে নাই। তাহার একমাত্র কারণ চীনালিপির বিশেষত্ব। চীনা লিপিগুলি চিত্রবিশেষ। ছবি আঁকিতে যেরূপ নৈপুণ্য আবশ্যক, চীনা অক্ষর লিখিতেও সেইরূপ নৈপুণ্য আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে চীনারা চিত্রবিদ্যায় হাত দিবার পূর্ব্বে এই কারণে হস্তলিপিতে হাত মক্স করিয়া থাকে। হস্তলিপি চীনে চিত্রশিল্পেরই সামিল। নামজাদা চিত্রকরগণের অনেকে হাতের লেখায়ও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একখানা চিত্রশিল্পের পুস্তক আছে। তাঙ আমলেও একখানা দশখণ্ডে বিভক্ত বিরাট গ্রন্থ প্রণীত হয়। নাম

"লীহ-তায়-মিঙ্-হুয়া-কে"। গ্রন্থকারের নাম চাঙ্ য়েন-য়ুয়েন্। ইহাতে চিত্রশিল্পের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ আছে। লেখকের বংশে পুরাণা চিত্র বহুসংখ্যক সংগৃহীত ছিল। এই সংগ্রহের বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরাণা ওস্তাদগণের জীবন বৃত্তান্তও ইহাতে লিখিত আছে।

সুঙ আমলের চু-চাঙ্-ওয়ান্ হস্তলিপি সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মন্তব্য শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। নিজের মত অল্প বিস্তর আছে। হাতের লেখার উৎকর্ষ লাভের নানা উপায় ইহার আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থের নাম মিহ চে-পীন্। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে তুঙ্-শে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে সুঙ্ আমলের ওস্তাদ লেখকগণের বিবরণ আছে।

তাঙ্ আমলের উই-সুছ একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ৫৬ বিভিন্ন লিপি-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। এইগুলি সবই নাকি চীনে নানা যুগে প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষার জন্য ব্যবহৃত দেবনাগরী লিপির উল্লেখও আছে।

একখানা গ্রন্থ বিশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে নানা যুগে প্রকাশিত হস্তলিপির নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের নমুনা ইহাতে নাই। সম্রাট্ এবং রাজরাজড়াদিগের হাতের সইও এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁশ চিত্রণে চীনারা সিদ্ধ হস্ত। বাঁশ গাছ আঁকিবার প্রণালী একখানা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। ইহা ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। লেখকের নাম লে-কান্। পুস্তকের নাম "চুহ্-পূ-রেয়াংলুহ"। ইহাতে চারি অধ্যায় আছে—(১) বাঁশের সাধারণ আকৃতি বিষয়ক ছবি, (২) কতকগুলা এক রঙা ছবি, (৩) নানা অবস্থায় বাঁশ কিরূপ দেখায়,

(৪) নানা জাতীয় বাঁশের আকৃতি। গ্রন্থের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। বাঁশগাছ সম্বন্ধে অতি গভীর গবেষণাও ইহাতে আছে। ওয়াইলির মতে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলি নিখুঁত। ঠিক যেন প্রকৃতির বাগানে ও ময়দানে বাঁশগাছ গুলি দেখিতেছি। কাজেই পুস্তক খানা চীনা শিল্প শাস্ত্রের একখানা বেদ বিশেষ।

হুয়া-কীন গ্রন্থে চিত্র-শিল্পের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে মোগল আমল পর্য্যন্ত চীনা চিত্রকলার ধারা ইহাতে বুঝিতে পারা যায়। লেখকের নাম তাঙ্ হাও। বিদেশীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও সামান্য বিবরণ আছে। বোধ হয় ভারতীয় চিত্র-কলার কোন কোন তথ্য ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার চিত্রকলার নানা রীতি ("স্কুল") বা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কোন্ ছবি কোন্ রীতির অন্তর্গত তাহা বুঝিবার নানা সঙ্কেত গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হীয়া ওয়ান-য়েন চিত্রকরগণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নাম "তু-হুই-পাও-কীয়েন"। ইহাতে ১৫০০ ওস্তাদের নাম আছে। সুপ্রাচীন কাল হইতে মোগল আমল পর্য্যন্ত ইহাঁদের আবির্ভাব কাল।

এই ধরণের অসংখ্য গ্রন্থই আছে। লেখকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক-গণের ভুল ধরিতে ছাড়েন নাই। সমালোচনার সমালোচনা এইরূপে চীনা সাহিত্যে অনেক জমিয়াছে। মাঞ্চু আমলেও হস্তলিপি এবং চিত্রশিল্প সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং সমালোচনা ও ব্যাখ্যা পুস্তক বাহির হইয়াছে।

চীনে সীলমোহরের ব্যবহার অতি প্রাচীন। রাজরাজড়াগণ ত করিয়াছেনই—সাধারণ লোকেরাও শীলমোহর ব্যবহার করে। কাজেই

শীলমোহর প্রস্তুত করা চীনে একটা ব্যবসায় বিশেষ। মোহরে নামলেখা বা ছবি আঁকাও একটা কলা বিশেষ। সুতরাং এই সকল বিষয়ে সাহিত্য গড়িয়া উঠাও অতি স্বাভাবিক। বস্তুতঃ শীলমোহর সম্বন্ধীয় গ্রন্থের পরিমাণ চীনা শিল্প-সাহিত্যে বিশাল। চীনা সাহিত্যের যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই "বিশালং বিপুলং ভদ্রংস্কারং সমং বশিষ্ঠঞ্চ" দেখিতেছি। চীনারা "লিখিয়ে লোক।"

(২) সঙ্গীত।

সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক সমালোচনা নানা গ্রন্থেই আছে। অধিকন্তু বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ বিবরণ এবং যন্ত্রব্যবহার করিবার কৌশল সম্বন্ধেও বিশেষ সাহিত্যের পরিচয় পাই।

নবম শতাব্দীতে নান্-জো ঢাক বাজাইবার প্রণালী সম্বন্ধে এক খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিয়দংশ ঐতিহাসিক। গ্রন্থকার বলিতেছেন মধ্য এশিয়া হইতে ঢাক চীনে আমদানি হইয়াছে। তাঙ্ আমলে মধ্য এশিয়া বলিলে ভারত "মণ্ডল"ই বুঝিতে হইবে। নানা প্রকার ঢাকের জন্মকথা ও ইতিহাস এই গ্রন্থে আছে। ১২৯ প্রকার বাদ্যরীতি, সুর বা গৎ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ওয়াইলি বলিতেছেন —"অনেক গুলির নামেই বুঝিতে পারি এই সমুদয় ভারতীয়।" ভারতের ঢাকও চীনে আসিয়াছে। গ্রন্থের নাম কী-কুও-লুহ্।

দশম শতাব্দীতে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে নানা প্রকার সঙ্গীতের বিবরণ আছে। নৃত্যকলা সম্বন্ধে গবেষণা আছে। নটের অভিনয় সম্বন্ধেও প্রবন্ধ আছে। বাদ্যযন্ত্র এবং গীতও আলোচিত হইয়াছে। ২৮ প্রকার রাগ বা রাগিণী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাঙ্ আমলের নাচগান বাজনা বুঝিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। চীনের তাঙ্ আমল ভারতীয় প্রভাবের আমল।

কাজেই এই যুগের সকল চীনা গ্রন্থেই ভারতবর্ষকে পাইব—কোথাও মুখ্যভাবে কোথাও বা গৌণভাবে। ভারতবর্ষ চীনকে কেবল ধর্ম্ম প্রদান করে নাই—সমগ্র ভারতীয় সভ্যতারই নানা অঙ্গ প্রদান করিয়া ছিল।

"কিন্" বা বীণা সম্বন্ধে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে একখানা বই লেখা হয়। উহা দশখণ্ডে বিভক্ত। বহু পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের মত ইহাতে উদ্ধৃত আছে। বীণা বাজাইবার নানা রীতি ইহার আলোচ্য বিষয়।

বীণা সম্বন্ধে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে একখানা বই লেখা হয়। উহাও দশখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে—(১) শিক্ষার্থীদিগের পালনীয় নিয়ম, (২) সঙ্গীতকলার নানা রাগ রাগিণী সুর বা গতের নাম ও বিবরণ, (৩) এই সকল বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের তালিকা, (৪) বীণা প্রস্তুত করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এরূপ ওস্তাদ কারিগরগণের নাম। সংখ্যা বিপুল। (৫) স্বরলিপি।

৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জেড্ পাথরের বাদ্যযন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে চীনে আনা হয়। তোচুঙ্ তখন চীনেশ্বর। ফরাসী পণ্ডিত ব্যজাঁ (Bazin) তাহার "চীনা থিয়েটার" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নাট্যকলা ভারতবর্ষ হইতেই চীনে আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে চীনে রঙ্গমঞ্চ ছিল না। নাচগান সমন্বিত অভিনয় চীনারা ভারতীয় বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট প্রথম শিক্ষা করে। বৌদ্ধ বলিলে যে কোন ভারতবাসীকেই বুঝাইত। ভারতবর্ষের সকল বস্তুই চীনাদের বিবেচনায় "বুদ্ধমার্কা" ছিল।

(৩) শিল্প-সংগ্রহ ও বিবিধ "কলার" কথা।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাও-কীয়েন্-লুই নামক একখানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ছুরি ছোরা তলোয়ার খাঁড়া ও অন্যান্য শস্ত্র সম্বন্ধে

ইহা ইতিহাস পুস্তক। লোহা তামা ও সোনার তলোয়ারের উল্লেখ আছে। পাথরের নির্ম্মিত শস্ত্রের কথাও জানিতে পারি। সোনালি অক্ষরে নাম খোদাই করা হইত। এই ধরণের তলোয়ার প্রাচীন ও মধ্য যুগের রাজরাজড়াদের অনেক ছিল। জাপানের দাইম্যোগণও এই সকল হাতিয়ার রাখিতেন। গ্রন্থে মান্ধাতার আমলের তলোয়ারের বিবরণ আছে—সমসাময়িক চীনের পরিচিত শস্ত্রেরও বিবরণ আছে।

চিঙ্-লুই নামক একখানা গ্রন্থ ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত হয়। তাহাতে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। অধিকাংশই হান্-আমলের জিনিষ। ধাতু ঢালাই করিবার প্রণালী, পাত্রগুলির মাপজোক এবং নাম খোদাই সবই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ওয়াং-ফু নামক এক ব্যক্তি পুরানা জিনেষের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা একপ্রকার বিশ্বকোষ বিশেষ। নাম সুয়েন-হো-পো-কূ-তু। ত্রিশখণ্ডে বিভক্ত। নানা প্রকার পাত্র, আয়না, পেয়ালা, রেকাবি, ফুলদানের বিবরণ, ইহাতে আছে। চাঙ্ আমল হইতে হান্ আমলের বস্তু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। প্রত্যেক প্রবন্ধ সচিত্র। পাত্রের গায় খোদাইকরা অক্ষরগুলিও গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বস্তুগুলির বর্ণনায় ওয়াংফু নিজের কথা প্রায়ই বলেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সমুদয় সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন। ওয়াঙফু সেই সমুদয় সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ছবিগুলি নিখুঁত। প্রাচীন চীনের শিল্প বুঝিবার পক্ষে এই সংগ্রহ-পুস্তকখানা বিশেষ মূল্যবান্। ভারতীয় সাহিত্যে এই ধরণের একখানা পুস্তিকাও আছে কি? বোধহয় না।

এই ধরণের শিল্পসংগ্রহ-বিষয়ক গ্রন্থ চীনারা নানা যুগেই লিখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও এই সাহিত্য চলিতেছে। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে একখানা

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে শিল্পদ্রব্যের গাত্রে খোদাই করা রচনার বিবরণ দেখিতে পাই। এই গুলি চাঙ্ আমল হইতে তাঙ্ পর্য্যন্ত কালের বস্তু। পর বৎসর আর একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে কেবল আয়নার ছবি আছে। এই গুলিও চাঙ্-তাঙ্ আমলের দ্রব্য।

দোয়াত, কালী, কাগজ, তুলী ইত্যাদি হস্তলিপি এবং চিত্রশিল্পের উপকরণ সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ আছে। মোগল আমলের লুহ-ইউ একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নাম মিহ্-পে। তাহাতে কালী প্রস্তুত করিবার শিল্প বিবৃত আছে। ইহা ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। ১৫০ জন পুরাণা মসী-শিল্পীর কথা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। অধিকন্তু চীনের বাহিরে লোকেরা কিরূপে কালী প্রস্তুত করে তাহার বিবরণও আছে। কোড়ীয়ার মসী-শিল্প, তাতারজাতির মসীশিল্প এবং মধ্য এশিয়াবাসীদিগের মসী-শিল্পের কথাও ইহাতে জানিতে পারি। মধ্য এশিয়ার কথায় ভারতের কথাই আন্দাজ করা চলিতে পারে।

চীনে প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ আছে। পুরাণা অন্যান্য মুদ্রা সংগ্রহ করিবার বাতিক চীনাদের ছিল। সেইগুলির বিবরণ লিখিয়া রাখাও তাহাদের অভ্যাস ছিল। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে এই ধরণের মুদ্রাসাহিত্যের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। ১১৪৯ খৃষ্টাব্দের এক খানা গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে সুপ্রাচীন কাল হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের মুদ্রাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থ সচিত্র। প্রত্যেক মুদ্রার আকার পরিমাণ ও লিপি যথারীতি বর্ণিত আছে। বিদেশীয় রাষ্ট্রের মুদ্রার কথাও ইহাতে জানিতে পারি। লেখকের নাম হুং-চুন্। গ্রন্থের নাম চুয়েন-চে। ১৫ খণ্ডে বিভক্ত।

পিকিঙের রাজ-দরবারে পুরাণা মুদ্রার সংগ্রহ রক্ষিত হইয়া থাকে।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহের বিবরণ রাজাদেশে প্রকাশ করা হয়। ইহাতে এশিয়ার নানা দেশের মুদ্রাও বিবৃত আছে। নানা পদক বা মেডেলের বিবরণও দেখিতে পাই। গ্রন্থ সচিত্র।

প্রস্তর শিল্প চীনে অতি পুরাতন। কাজেই নানা প্রকার পাথর সম্বন্ধে চীনা সাহিত্যও রচিত হইয়াছে। সুগন্ধি দ্রবের তালিকা, কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কৌশল ইত্যাদিও চীনা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

চা চীনাদের খাঁটি স্বদেশী বস্তু। কাজেই চা গাছের কথা চীনা সাহিত্যে থাকিবারই কথা। চা-কিঙ্ নামক গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীর রচনা। ইহার আলোচ্য বিষয়—(১) চা গাছের উৎপত্তি (২) গাছ হইতে চয়ন করিবার প্রণালী (৩) চার পাতা প্রস্তুত করিবার নিয়ম (৪) এই সকল কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী পাত্রের বিবরণ (৫) চা-পান (৬) ঐতিহাসিক তথ্য (৭) কোন্ কোন্ জেলায় চা উৎপন্ন হয় (৮) বিবিধ (৯) চিত্র পরিচয়। চা সম্বন্ধে নানা গ্রন্থই রচিত হইয়াছে। কোন্ জলে চার স্বাদ উৎকৃষ্ট হয় সে বিষয়েও একাধিক গ্রন্থের পরিচয় পাই। এক লেখক সাত নদীর তুলনা করিয়া ইয়াংলির জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। চার জন্য জল গরম করিবার নিয়মও সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। তাঙ্ আমলের এক ব্যক্তি ষোলটা প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। তিন প্রবন্ধে জল ফুটিবার মুহূর্ত্তটা লক্ষ্য রাখিবার জন্য বিশেষ সঙ্কেত আছে। তিন প্রবন্ধে জল ঢালিবার নিয়ম বিবৃত হইয়াছে। কেট্‌লি ও অন্যান্য পাত্র সম্বন্ধে পাঁচ প্রবন্ধ লিখিত। আর জ্বালানি কাঠের কথা পাই পাঁচ প্রবন্ধে।

মদ চোঁয়ানো, বাগান তৈয়ারি করা, বাঁশের ঝোল প্রস্তুত করা, পাখী ধরা, মাছধরা ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়েই চীনা সাহিত্যে আছে।

ভারতীয় চৌষট্টি কলার মধ্যে এই ধরণের অনেক জিনিষ অন্তর্গত। সেই সকল কলা সম্বন্ধীয় সাহিত্য ভারতেও ছিল। সেই সমুদয়ের প্রাত্নিক আলোচনা অল্পবিস্তর আজকাল দেখা যাইতেছে।

চীনের কালিদাস লী-পো।

আমাদের কালিদাসকে আমরা ভারতের গ্যেটে অথবা শেক্‌স্‌পীয়ার বলিয়া জানি। জার্ম্মাণ কবিবরের রচনাপ্রণালী হইতে ইংরেজ কবিবরের রচনাপ্রণালী পৃথক্‌। আবার হিন্দু কবিবরের রচনাপ্রণালীও এই দুই জনের রচনাপ্রণালী হইতেই পৃথক্‌। এই তিন কবির তিন প্রকার ধরণ ধারণ। তাহা হইলে তিন জনকে এক গোলের অন্তর্গত করা হয় কেন? কেবল এই হিসাবে যে গ্যেটে জার্ম্মান সাহিত্যের ১ নং কবি, সেক্‌স্‌পীয়ার ইংরাজ সাহিত্যের ১নং কবি, আর কালিদাসও সংস্কৃত সাহিত্যের ১নং কবি। সেইরূপ লী-পো চীনাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। কোন চীনা বালককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"তোমাদের নং ১ কবির নাম কি?" সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিবে—"লী-পো।" এই জন্য লীকে চীনা সাহিত্যের কালিদাস বলিলাম।

লী নাটকও লিখেন নাই, নভেলও লিখেন নাই, আর এপিক বা মহাকাব্যও লিখেন নাই। লী ছিলেন গায়ক এবং গীতিকাব্যের লেখক। ছোট ছোট কবিতা, চৌকা, সনেট ও গান ছাড়া অন্য কোন

রচনা লীর ত্রিশখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। ইনি সর্ব্বদা মদের ভাটিতে ডুবিয়া থাকিতেন। মদের নেশায় "চূর" না হইলে নাকি লীর মাথা খুলিত না। চীনা কবি মাত্রেরই এই দস্তুর ছিল। শুনা যায় লী ফুলভক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ নদনদী পাহাড় পর্ব্বত গাছ পালা এক কথায় প্রকৃতি চীনা কবিমাত্রেরই অতি প্রিয় বস্তু। প্রকৃতি বিষয়ক কাব্য চীনা সাহিত্যে প্রচুর। অধিকন্তু সঙ্গীতে লীর ঝোঁক ছিল। এই ঝোঁকটাও চীনা কবিমাত্রের পক্ষেই স্বভাবসিদ্ধ। কবি বলিলেই চীনে সঙ্গীত-প্রিয় প্রকৃতি-পূজক পানাসক্ত লেখক বুঝায়। এই বর্ণনা বিশেষ ভাবে "লিরিসিষ্ট" বা গীতিকার সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। লী-পো তাঁহাদের মধ্যে সেরা।

চীনের কেন, দুনিয়ার সকল দেশের গীতিকার সম্বন্ধেই এই চীনা-বর্ণনা প্রয়োগ করা চলিতে পারে। হয়ত কোন কবি মদের নেশায় মাতাল না থাকিতেও পারেন। কিন্তু অন্ততঃ ভাবের নেশায় গীতি-কারকে মাতাল হইতেই হইবে। মাতাল না হইলে লিরিসিষ্ট হওয়া যায় না। মাতলামি ও পাগলামি গীতিকাব্যের প্রাণ। কেহবা মদে পাগল, কেহবা প্রেমে পাগল, কেহবা ধর্ম্মে পাগল, কেহবা স্বদেশ সেবায় পাগল। শেকস্পীয়ারও এক স্থানে এই চীনা মতে সায় দিয়াছেন। তাঁহার মতে "লাভার্, লুন্যাটিক অ্যাণ্ড দি পোয়েট" অর্থাৎ "প্রেমিক, পাগল এবং কবি" একই চরিত্রের লোক। জার্ম্মান শিলার, বাঙ্গালী হেম ও নবীন, ইংরেজ শেলী ও বায়রণ এবং ফরাসী লামারটিন্ সকলেই 'প্রেমিক, পাগল ও মাতাল ছিলেন। চীনা "কবি-লক্ষণ" অনুসারে ইঁহারা লী-পোর জুড়িদার—অর্থাৎ 'এক গ্লাসের ইয়ার'।

নব্য-ভারতের কবিবরও এইরূপ প্রেমিক, পাগল ও মাতাল। ঠিক বায়রনের বাঁধা নিয়ের কথা শুনিতে পাইতেছি না কি?

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে।"

এই জন্যই সেক্‌স্‌পিয়ার বলিয়াছিলেন—"প্রেমিক, পাগল এবং কবি এক উপাদানেই গঠিত। প্রেমিকের কল্পনায় পাগলের কল্পনায় আর কবির কল্পনায় কোন প্রভেদ নাই।" চীনা গীতিকারেরা সেক্‌স্‌পীয়ারের সার্টিফিকেট পাইবার উপযুক্ত। তবে চীনের সেক্‌স্‌পিয়ার ইংরেজ সেক্‌স্‌পীয়ারের অন্ততঃ আটশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ৬৯৯ হইতে ৭৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লী-পোর জীবনলীলা।

লী কোন বিশেষ এক বিষয়ে কবিতা লিখিতেন না। যখন যে বিষয়ে খেয়াল চাপিত, তখন সেই বিষয়ে কবিতা লিখিতেন। পৃথিবীর যে কোন ঘটনাই লীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে পারিত। দুনিয়ার যে কোন দৃশ্যেই তাঁহার কল্পনা তরঙ্গায়িত হইত। লীর বীণায় চড়া নরম কোন ঝঙ্কার বাদ পড়ে নাই। লী-পোর কাব্যে নয় রসেরই স্বাদ পাওয়া যায়। ছত্রিশ রাগিণীতেই গলা সাঁধিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। এই হিসাবে লী ঠিক যেন শেক্‌স্‌পিয়ার—গোটা দুনিয়াই লীর সাহিত্যে ছাপ মারিয়া দিয়াছে। লীর গ্রন্থাবলী বিশ্বকোষ। বীররস চাহ, বীররস পাইবে, শৃঙ্গার রস চাহ শৃঙ্গার রস পাইবে। তাণ্ডবের সৌন্দর্য্য চাহ তাহা পাইবে—চাঁদের সৌন্দর্য্য চাহ তাহাও পাইবে। হতাশের সহচর ভাবে লী-পো পাঠকের মন মুগ্ধ করিতে পারিবেন। আবার

তেজস্বী কঠোর ব্রতধারী ভাবুক ব্যক্তিও এই বিশ্বকোষ ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলে মাতোয়ারা হইয়া পড়িবেন।

লী লেখা পড়ায় পণ্ডিত ছিলেন। কেতাবিবিদ্যা তাঁহার বেশ ছিল। চীনা কবিরা সকলেই পণ্ডিত। কিন্তু লী-পো অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর লোকজনের তারিফ করিতেন। সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে পার্ব্বত্য বনজঙ্গলের অধিবাসীরা স্বাধীন জীবন যাপন করে। তাহাদের শরীর শক্ত, চিত্ত দৃঢ় এবং স্ফূর্ত্তি অগাধ। লী বলিতেছেন—"আমরা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দুনিয়ার কি বুঝিতেছি? কিছুই না। কতকগুলি পুঁথি ঘাটিতেছি বৈত নয়! কিন্তু এই পাহাড়ী পাড়াগেঁয়ে লোকেরা যেন পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ঘরকন্না করিতেছে। ইহারা কেতাবের ধার ধারেনা। গোটা জগৎই এই সকল নিরক্ষর লোকের কেতাব। আজ ইহারা পশু শীকার করিতেছে—কাল বনের গাছ কাটিতেছে,—পরশু সদল বলে নাচ গান করিতেছে।" জার্ম্মান-গ্যেটের 'গটজ্' এবং শিলারের "রবার্স" কাব্যদ্বয় এই স্বচ্ছন্দ জীবনের বার্ত্তা আনিয়াছিল। তাহা হইতেই ইয়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে রোমান্টিক ভাবুকতার আন্দোলন উপস্থিত হয়।

লী সৈনিক পুরুষের জীবন চিত্রিত করিতে ভাল বাসেন। ঠিক যেন তলোয়ার হাতে লইয়া কবিবর রাগিণী ধরিয়াছেন। পণ্টনী পোষাকের বর্ণনায়ও লীর দৃষ্টি আছে। যুদ্ধের সময়ে সৈন্যেরা সদর্পে কায়দা করিয়া পা ফেলিয়া থাকে। লী তাহাও বর্ণনা করিবেন। আবার অশ্বারোহী পল্টনের গতিবিধিও তাঁহার নজরে পড়ে। 'ইহারা পবনের বেগে দৌড়িতেছে। বলিতে কি, ঠিক যেন উল্কাপাত দেখিতেছি। সাদা ঘোড়ার উপর রূপার পাড়ওয়ালা জিন্। বরফের মতন পালিশ করা ও চক্ চকে তলোয়ার। ধন্য উ-দেশের কারিগর!

বাহবা চাওদেশের অশ্বারোহী!” এই ধরণের বর্ণনা লীর যুদ্ধ-সঙ্গীতে এবং শীকারের গানে অনেক পাওয়া যায়। কেজো জীবনের আনন্দ, সৎসাহসের আনন্দ, সুস্থ সবল শরীরের আনন্দ, তাজা প্রাণের আনন্দ লী প্রচুর দিয়াছেন।

চীনের ইতিহাসে তাতার বর্ব্বরদিগের আক্রমণ এক প্রকার কোন যুগেই বন্ধ ছিল না। লী প্রসিদ্ধ তাঙ্ বংশের (৬১৮-৯০৭) আমলের লোক। তাঁহার সময়ে হুয়ান-চুঙ্ বা মিঙ্-হুয়াঙ্ (৭১৩ ৫৬) সম্রাট্ ছিলেন। এই বংশের সর্ব্ব প্রধান নরপতি তাই-চুঙ্ (৬২৭-৫০) হুয়ানের ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। তাই-চুঙ্ চীনের নেপো-লিয়ান পদবাচ্য বীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার আমলে তাঙ্ বংশ অখণ্ড চীনের সাম্রাজ্য ভোগ করেন। কিন্তু লি-পো যে সময়ে কবি তখন চীন সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন লাগিয়াছে। প্রথমতঃ অন্তর্বিদ্রোহ, দ্বিতীয়তঃ তাতারদিগের আক্রমণ। এই দুই কারণে চীনে অশান্তি দেখা দিয়াছিল। চীনে এইরূপ অশান্তি লাগিয়াই আছে।

লী তাতার যুদ্ধের এক কবিতা লিখিয়াছেন। কত যুদ্ধের কত কবিতা লেখা হইয়াছিল কে জানে? ইংরেজিতে মাত্র—একটা পাইতেছি। বাডের (Budd) অনুবাদে এইটার নাম “যুদ্ধযাত্রার গান” চীনা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ—তস্যাপি বাঙ্গালা অনুবাদ—তাহাও আবার গদ্যে—সেই গদ্যও দুর্ভাগ্য ক্রমে নিতান্ত অকবির রচনা। কাজেই নিম্নের উদ্ধৃত অংশে চীনা কবিবরের “জাত মারা” হইতেছে বলিতে হইবে। দুধের সাধ ঘোলেই মিটানযাউক!

“তিয়েন্-শানের পাহাড় চূড়া এখনও ঝলকে
নির্ম্মল শ্বেত পোষাকে;

বসন্তের গান আমি চাই শুনতে
    (কিন্তু) ফুলের শোভা নাই কোথাও।
বিকট এই খোলা মাঠ,
    বসন্ত নীরব।
নীরস এক "উইলো-গীত" (সুরের নাম)
    বাজাই বাঁশীতে।
সকালে হইবে লড়াই ভেরীর আহ্বান ;
    নিশীথে অশ্বারোহী নিদ্রা যায় জিনে। *
পাশে তার তলোয়ার
    মরিচাহীন পরিষ্কার ;
জপিয়াছে দীর্ঘকাল ইহারই খোঁচায়
    পাঠাইবে তাতারেরে মরণ সীমায়।
তেজস্বী যুদ্ধাশ্বের হইয়া সওয়ার
    বায়ুরে ফেলিয়া ত্বরা সুদূর পশ্চাতে
ভয়ের না করি ভয়, না ভাবি মরণে
    "ওয়ে"নদের জলরাশি পলকে হইল পার।
ধনুক তাদের শক্ত বাঁধা
    বাণে ভরা তূণ,
হুনুনের সামনে তারা দাঁড়ায় নির্ভীক
    দুর্ব্বৃত্ত শত্রুর দল করিবারে খুন।
গুঁড়া হয় পাহাড় যেমন অশনিপাতে
    ছিঁড়িল তাতার-বূ্যহ চীন সেনাঘাতে ;

---

* জিনের সম্মুখ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ অনেকটা বাঁকাইয়া খাড়াভাবে উঠে। কাজেই বসিবার স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রবল ঝড়ের ধাক্কায় মেঘের মতন
কাপুরুষ বর্ব্বরেরা করে পলায়ন।
তারপর রক্তমাখা বালুকার উপর
ক্লান্ত বিজয়ী বীর পড়িয়া ঘুমায়।
তলোয়ার শোভা পায় শ্বেতোজ্জ্বল তুষারে
নিক্ষিপ্ত চৌদিকে হেরি ধনুকের কৃষ্ণচ্ছায়।
রক্ষা পাইল গিরি-পথ ;
দূর হ'ল শত্রু ;
আনন্দে সৈনিক বধূর
ঘর ভরপুর।"

ইংরেজ স্কটের বীরগাথা সমূহের ঠিক এই ধুয়া। আমাদের চারণ, জার্ম্মানদের "মিনেসিঙ্গার", করাসী "ক্রবেয়ার" আর বিলাতের "মিন্‌ষ্ট্রেল" সকলেই লী-পোকে আত্মীয় বিবেচনা করিবেন। বস্তুতঃ লীর জীবন অনেকাংশে চারণগণের মতনই ছিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তাঁহাকে নানা দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আজ সহরে, কাল পল্লীতে—আজ নৌকাবক্ষে কাল পর্ব্বত পৃষ্ঠে—এইভাবে লীর জীবন কাটিয়াছে। এই তিনি রাণীর রূপে মুগ্ধ—পরক্ষণেই তিনি তাঁতীকন্যার সূতাকাটা দেখিতেছেন। চাষীদের আলে দাঁড়াইয়া লী একবার গলা ছাড়িলেন, খানিক পরেই মাতালের পাল মদের দোকানে কবিবরের সঙ্গে মসগুল। আজ তিনি পণ্ডিতের অতিথি কাল এক জমিদার তাঁহার সেবক। লী অনেক ঘাটের জল খাইয়াছেন —দুনিয়ার কোন রস তাঁহার অ-চাখা ছিল না। এমন ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন—তাহার উপর সরস্বতীর কৃপা—কাজেই লীর কলমের (বস্তুতঃ তুলীর, চীনারা কলমে লেখে না) আগায় যাহা

আসিয়াছে তাহাই অমর হইয়াছে। ভাবিতেছি ইয়োরোপের রোমাণ্টিক ভাবুকতা যে বস্তু ঠিক সেই বস্তুই যেন হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনের এই কবিবরে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। বার্ণসের উন্মাদনা, শ্যাতোব্রিয়াঁদের অগাধ কল্পনা, যুবক জার্ম্মানির চরমপন্থিতা সবই এশিয়ার এই সাহিত্যবীর নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চীনের কালিদাস দুনিয়ার কবিসভায় কুলীনের আসন পাইবার যোগ্য।

চীনা-সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ডিভাইন কমেঁডি এবং প্যারাডাইজ লষ্ট নাই, অর্থাৎ চীনারা কেহই কখনও "মহাকাব্য" রচনা করেন নাই। চীনা সাহিত্যে নাটক আছে, নাটকগুলি ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের দৃষ্টান্তে প্রথম রচিত হইতে থাকে। তাঙ্ আমলের পূর্ব্বে চীনে নাটক ছিল না। লীর সময়ে চীনারা নাট্য সাহিত্যে হাত মক্স্ করিতে সুরু করে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল আমলে চীনা নাটককারগণ প্রসিদ্ধ হন। কাজেই লীর সময়কার কবিগণ ছোট কবিতায়ই হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিতেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতা, চতুষ্পদী কবিতা এবং অন্যান্য অল্পায়-তনের কবিতায় তাঙ্ যুগ চীনা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

ভারতবর্ষের পণ্ডিতমহলে একটা কথা অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যত কম শব্দে একটা "সূত্র" প্রচার করা যায় ততই আমাদের ধারণায় বাহাদুরী। কোন সূত্র হইতে একটা অনাবশ্যক শব্দ তুলিয়া দিতে পারিলে আমাদের পণ্ডিতগণ নাকি পুত্র লাভের সুখ অনুভব করিতেন। এই ধারণা জাপানেও দেখিয়াছি—চীনেও দেখিতেছি। "কম কথায় বেশী ভাব প্রকাশ কর"—ইহাই যেন এশিয়ার মূলমন্ত্র। জাপানী সাহিত্যে এক প্রকার কবিতা আছে—

তাহাতে থাকে মাত্র দুই লাইন। নাম "হোক্কু"। এগুলি ঠিক আমাদের দোঁহা। কবি দুই চারিটা মাত্র আওয়াজ করিবেন—শ্রোতারা সেই সামান্য আওয়াজেরই প্রভাব কানের ভিতর দিয়া মরম পর্য্যন্ত লইয়া যাউক হোক্কু বা দোঁহার লেখকগণ এইরূপ দাবি করিয়া থাকেন। চীনা সাহিত্যেও দেখিতেছি এই বাতিক অতি প্রবল। চীনা চতুষ্পদী কবিতার সংখ্যা বিপুল। এইগুলি সম্বন্ধে চীনের পুরানা সমালোচকেরা বলিয়াছেন—"বাক্য থামিয়া গেল—কিন্তু অর্থ ত থামেনাই।" কবি তোমার চোখের পরদাটা খুলিয়া দিলেন—তুমি দিব্য দৃষ্টি পাইলে—এখন নূতন চোখে দুনিয়াটা দেখিতে থাক। তোমার চামড়ার কানে এতদিন তুমি কয়টা ধ্বনিইবা ধরিতে পারিতে? চতুষ্পদীর কবিগণ তোমার কানের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিলেন। তোমার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া গেল—তোমার স্মৃতিশক্তি বাড়িয়া গেল—তোমার কল্পনার পাখা অবাধ হইল—কবির ইঙ্গিতে তুমি নবজীবন লাভ করিলে। চতুষ্পদীর সঙ্কেতগুলি তোমাকে নূতন ভাবে মাখাইয়া রাখিল। ফুল শুকাইয়া গেলেও ফুলের গন্ধে তুমি আকুল থাকিতে পারিবে। ইহাই চতুষ্পদীর মাহাত্ম্য। কবি পথ দেখাইয়াই খালাস।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে। তাহাতেও বাক্‌সংযম, নীরবতা, বাজে কথা বর্জ্জন ইত্যাদির প্রশংসা পাই। সেই প্রবাদে কথা বলাটা রূপার মতন সস্তা আর কথা না বলাই সোনার মতন দামী। হোক্কু, দোঁহা এবং চতুষ্পদীর প্রচারকগণ শব্দসংযম সম্বন্ধে আরও বলিতে পারেন—"সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুঃখ অনুভব করে কে? যাহার বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বদমায়েস কে? যে বদমায়েসির কথা একদম বলে না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু কে? যে শত্রুতার

কথা মুখেও আনে না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে কে? যে ভালবাসার কথা প্রকাশই করে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী কে? যে বাজারে জ্ঞানের জাহির করে না ইত্যাদি। আরও চরম ভাবে বাক্যসংযমের তারিফ করা চলিতে পারে। "তত্ত্ব"দর্শী কে? যে লোকজনের নিকট ধরা ছোঁয়া দেয় না। সংসারের গূঢ় রহস্য বুঝিয়াছে কে? যে একদম নির্ব্বাক্, মৌনব্রতাবলম্বী "মুনি"। জীবনের চরমকথা জানে কে? যোগী, সাধক, ও ধ্যানী যে। চীনা, জাপানী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সমাজেই এই মত দেখিতে পাওয়া যায়। সংযমের শক্তি সম্বন্ধে দুনিয়ার মানুষ মাত্রেই মত এক প্রকার। তবে দুনিয়ার লোক কোথাও সকলেই দরজাবন্ধ করিয়া নীরব সাধনায় মত্ত থাকে না। জগতের কোন সাহিত্যেই কেবল চুট্‌কী বা সূত্রেরই পশার অতিমাত্রায় দেখা দেয় নাই। বাচালতা, প্রগল্‌ভতা ও লম্বচৌড়া রচনা সকল সাহিত্যেই আছে।

লীপোর একটা চুট্‌কীর নমুনা দিতেছি। এইটা দশ বৎসর বয়সের লেখা। জোনাকি পোকা দেখিয়া বালক লী নিম্নের চতুষ্পদীটি লিখিয়া ছিলেন।

"বৃষ্টিতে নিবাইতে নারে আলোক তোমার বাতির,
বাতাসে তোমারে করে আরও বেশী উজ্জ্বল,
উড়িয়া উঠনা কেন? ঐ সুদূর আকাশ-কোল!
ভাতিবে চাঁদের পাশে;—যেন তারা যামিনীর।"

লীপোর আর একটা চতুষ্পদী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—

"পাখীরা লুকা'ল এখন গাছের নীড়ে,
আকাশের শেষ মেঘ এই ধীরে ভেসে যায়;

ক্লান্তি স্পর্শে না কভু মোদের দুজনায়,
যতই একত্র থাকি আমি ও পাহাড়।"

এই খানে কবিবরের পর্ব্বতপ্রীতি দেখিলাম। আর একটা চুটকিতে দেশের স্মৃতি জাগিতেছে।

"সহসা ভাঙ্গিল ঘুম ; দেখিলাম চাঁদের কিরণ বিছানার উপর ;
চমকিল চোখ যেন হেরিয়া তুষার জ্যোতি।
ক্রমশঃ সুন্দরবরণ দীপ্ত শশধর পানে উঠাইয়া শির
আবার করিনু শয়ন ;—জাগিল দেশের স্মৃতি।"

একটা চতুষ্পদীতে লীপো হেঁয়ালির সংবাদ হেঁয়ালির ভাষায় দিয়াছেন। মিষ্টিসিজ্‌ম্, অতীন্দ্রিয়তা, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সূক্ষ্মদর্শন, ইত্যাদি বস্তু সকল লোকের পক্ষে সুবোধ্য নয়। কাজেই তাহার ব্যাখ্যা করা ও সহজ নয়। এইজন্য তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা খোলা খুলি বলিয়াছেন "ওহে বাপু, আমি ত ঠিকই বুঝিয়াছি—চরম সত্যলাভও করিয়াছি—পরমানন্দে বিভোরও হইয়া আছি। কিন্তু তুমি কি তাহা বুঝিবে? ভাষায় তাহা বুঝাইতে পারি না।" "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" যখন প্রচারিত হইয়াছিল তখনও শ্রোতারা কিছু বুঝিয়াছিলেন কি? বোধ হয় না। চরম ভাবুকতার বাণী জনসাধারণ বুঝিতে অসমর্থ। চরমপন্থী লীপো ঠিক এই কথাটাই বলিতেছেন—

"আকাশে আমার চিত্ত এত কেন ধায়? জিজ্ঞাসিছ তুমি ;
শুনিয়া হৃদয় হাসে, না পারি জবাব দিতে!
পীচফুল নদী স্রোতে কোথায় বা যায় ভাসি? জানিনাক আমি।
সখা, মোর নূতন জগৎ না পারিবে বুঝিতে।"

জীবনের অভিজ্ঞতায় এক একটা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। সে অভিজ্ঞতা যাহার নাই সে কখনও কোন তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। চীনা ভাবুক

প্রবর দুনিয়ার সকল ভাবুকের পক্ষ হইতে এই চতুষ্পদীর দ্বারা কথাটা খুলিয়া বলিয়াছেন।

দেশ বিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে লী কয়েকজন এক গেলাসের ইয়ার পাইলেন। সংখ্যায় হইলেন তাঁহারা ছয় জন। নির্জ্জন পাহাড়ের এক বাঁশের ঝোঁপে এই ছয় নিকর্ম্মা আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। "বংশকুঞ্জের ছয় ইয়ার" নামে লীর দল চীনা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইঁহাদের কাজ ছিল দুই—পেট ভরিয়া মদ খাওয়া এবং গাল ভরিয়া গান করা। গানের বুলি এই—"সংসার অসার—খাও দাও, মজা কর।"

"জীবনের মূল্য কি? সে ত স্বপন সমান!
হৈ চৈ গণ্ডগোলে কিবা কাজ ভাই?
সার মাত্র এজগতে মদিরা সেবন,
নেশা ঝোঁকে সারা দিন থাকি এক ঠাঁই।
জাগিলে উঠিয়া তাকাই মাঠের দিকে,
শুনা যায় ফুল মাঝে পাখীর এক গান;
"সকাল কি সন্ধ্যা এখন?" জিজ্ঞাসি পাখীকে;
হাসিয়া পাখী বলে "বসন্ত এখন"।
দেখিয়া সুন্দর দৃশ্য চোখের হয় খুস্‌,
কাজেই পেয়ালা পূরি আবার চুম্বন;
মনে ভাবি গীতে ডাকি চন্দ্রকিরণ,
(কিন্তু) শীঘ্রই লুটাইয়া পড়ি হইয়া বেহুঁস্।

লীর মদিরা "অধ্যাত্মিক" মদ নয়—খাঁটি ভাটিতে চোঁয়ানো মাতালকরা রস। সমালোচকগণের একটা বাতিক আছে। তাঁহারা বিখ্যাত কবিগণের রচনায় প্রেমের কথা দেখিলেই আধ্যাত্মিক প্রেম

বুঝিতে চেষ্টিত হন। মদের কথা শুনিলেই ভগবৎ প্রীতি বুঝিতে লাগিয়া যান। পারস্যের ওমার খায়্যাম, জামি, রুমি এবং অন্যান্য সুফী ভাবুকগণের রচনায় মদ কোন কোন স্থলে আধ্যাত্মিক নেশার জনক। ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু যেখানে সেখানে আত্মা, জীব, মানুষে ভগবানের সম্বন্ধে "সামীপ্য" "সাযুজ্য" আধ্যাত্মিক মিলন ইত্যাদি বুঝিতে যাওয়া অনাবশ্যক। ভারতীয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমেও অনেক স্থলে চামড়ার চোখ কাণ দিয়া যাহা বুঝা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

লীর এই কবিতাগুলি জাইলসের ইংরেজি অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ক্র্যান্মার-বিঙের ইংরেজি অনুবাদ হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। ছয় নিষ্কর্ম্মার পরিষৎ হইতে যে সুর বাহির হইতে পারে সেই সুরই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সবুজ হাতে বসন্ত ডাকিছে আমারে,
প্রকৃতির গানও পশে হৃদয় মাঝারে।
পীচ্-গন্ধে আমোদিত কুঞ্জগৃহে আসি
মিলিলাম বন্ধুসনে সদা মুখে হাসি।
ইয়ার দলের আমোদ প্রমোদ কেবা না জানে?
রসের কথায় আলাপ সেথায় সরস ভোজনে।
ফুলের বিছানার পাশে মদিরার লাল পেয়ালা,
আমাদের সভাপতি চাঁদ রাণী অমলা।
কবিতা স্বরগের ধন; ইহার পরশ বিনা
রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার কখনো খুলিবে না;—
"কল্পনার মদিরা যেবা না করিয়াছে পান
তিন পেয়ালা মদ সে টানুক"—বাগানের বিধান।

বাগানের এই নিয়মটা কেন হইয়াছিল? নৈসর্গিক কবিত্বশক্তি না থাকিলে নেশার জোরে তাহা গজাইয়া তুলিবার জন্য? না, কবিতা না লিখিবার শাস্তি স্বরূপ ইয়ার মহাশয়কে বেশী মাত্রায় মদ দেওয়া হইত?

একটা নৈরাশ্যের গান শুনা যাউক। "হাল ছেড়ে বসে আছি মশায়! যা থাকে কপালে তাই হবে।" এই ধুয়ার কয়েক পংক্তি ক্রান্মার বিঙ দিয়াছেন।

> "কালিকার সোণা কেবা জমাইয়া রাখিতে পারে?
> আজিকার কালো মেঘ গুটাইয়া রাখিবে কে?
> দরিয়া-স্রোতের সূতা কাটে কি লোহার আঁচড়ে?
> মদিরার নেশাতে হায় দুঃখ নাশ হয় কবে?
> মানুষের আকাঙ্ক্ষা সনে
> বিধাতার বাধিলে রণ,
> একমাত্র পথ এই,—
> পাল তুলিয়া দাও তরণীর
> সজোরে বহুক পবন,
> জলস্রোতে যাও ভাসি।"

নান্‌কিঙ্ নগরের মাহাত্ম্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে। এটা বিষাদের ছবি।

> নান্‌কিঙ্! তুমি দেখিয়াছ ছয় রাজ্যের অবসান;
> তোমারি তরে এই গৌরব গীত ও তিন পেয়ালা পান।
> মাঠের শোভা সোণার বাগান আছে কত স্থানে;
> তাদের চেয়ে সুন্দর তুমি;—নীল পাহাড় এখানে।
> নান্‌কিঙেতেই "উ" রাজাদের উত্থান ও পতন,

ধ্বংস মাঝে বিরাজে যেথা বন জঙ্গল এখন।
নান্‌কিঙেতেই—এই না সে দিন ?—"চীন" বংশের রাজা
সূর্য্যাস্তের স্বপ্ন দিয়ে গড়েছে পাথর ধ্বজা।
মৃত্যু জগতের নিয়ম, সবারি এক পরিণাম,
বিজয়ী ও বিজিত লভিবে একই বিরাম।
ইয়াংসি-কিয়াঙের বারি তরঙ্গে তরঙ্গে
নাচিয়া মিশিবে শেষে সাগরেরি সঙ্গে !

চীনা সমজদারেরা লীপোর একটা কবিতাকে নিখুঁত কবিতার আদর্শরূপে প্রচার করিয়াছেন। কাজেই এইটা দেখিলে চীনাদের কষ্টিপাথর বুঝিতে পারি। চুট্‌কী কবিতার মাহাত্ম্য দেখিয়াছি তাহার ইঙ্গিত করিবার শক্তি। এই ইঙ্গিত মাত্র যেখানে চীনারা সেইখানেই উৎকর্ষ দেখিয়া থাকেন। লীপোর নিম্নলিখিত কবিতায় চীনা পাঠকগণ নানা ভাবে বিভোর হয়।

কচ্ছপ একটা ব'সে আছে পদ্ম ফুলের উপর ;
নলের ঝোঁপের মাঝে বাসা এক পাখীর ;
মাঝি-কন্যা বাহে দাঁড় হাল্কা তরণীর ;
গানের ধ্বনিতে তাহার মিশিছে জলের মর্ম্মর।"

কবির ইচ্ছা পাঠকগণ নিজ নিজ বিদ্যার দৌড় অনুসারে এই কয় লাইনের সূক্ষ্ম অর্থ বাহির করুক। কল্পনার পার্থক্য অনুসারে এখানে ব্যাখ্যার কম বেশী পার্থক্য হইবে। কেহ বলিবেন,—"নির্জ্জন আবেষ্টনের মধ্যে এক একটা জীবকে দেখান হইয়াছে। এই যা"। কেহ বলিবেন—"ইহার মধ্যে হাতী ঘোড়া কিছুই নাই। বেশী মাতামাতি করা অনাবশ্যক।" কেহ বলিবেন—"মোটের উপর একটা নিবিড় শান্তির চিত্র পাইতেছি।" কেহ বলিবেন—"অনন্ত শক্তিপুঞ্জের মাব-

খানে একটা ক্ষুদ্র শক্তির অবস্থান দেখাইতেই কবি তিনটা ছবি দিয়াছেন।” ইত্যাদি।

এক বিরহিণীর দুঃখ নিম্নে বিবৃত হইতেছে ;—

গোধূলি সময়ে বিহঙ্গম সব
কলরব করি আসিছে কুলায় ;
গাছের ডালে ডালে বসিয়া সরব
নিশার বিশ্রামে জোড়া-জোড়া যায়।
অদূরে যুবতী এক ভদ্র ঘরের
বসিয়া কাপড় বুনিছে তাঁতে ;
ভেদ করি জানালার পর্দ্দা রেশমের
পাখীদের গান তার কাণে আঘাতে।
কাজ থামিল রমণীর ; আকুল হইল প্রাণ
স্মরিয়া স্বামীরে যে না আর ফিরিবে ;
গভীর রজনী কালে হতাশ নির্জ্জন
দুঃখিনীর আঁখিতে বরষা দ্রবে।

লী-পো কিছু দিনের জন্য রাজ দরবারে চাকরি পাইয়াছিলেন। চীনেশ্বরের তিনি বড় প্রিয়পাত্র হন। সম্রাট্ নিজেও কবিতা লিখিতে এবং গাহিতে পারিতেন। কাজেই লীর “সঙ্গতের” অভাব হইত না। এক দিন সম্রাট্ তাঁহার প্রাসাদের আমোদ-গৃহে সকালে বসে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। হঠাৎ খেয়াল চাপিল যে তাঁহার এই সুখের দৃশ্য কবিতার বর্ণনায় স্থায়ী করিতে হইবে। লীপোর ডাক পড়িল। কবিবর তখন এক রাস্তায় মাতলামি করিতেছেন। কয়েকজনে মিলিয়া তাঁহাকে সম্রাটের নিকট লইয়া আসিল। লী বলিলেন—“হুজুর, আমি রাজকুমার বাহাদুরের পাল্লায় পড়িয়া বড় বেশী মদ ঢালিয়া

ফেলিয়াছি। এখন বেহুঁস ভাবে কিই বা লিখিব? যাহা হউক যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।" তার পর দুইজন রমণী লীর সম্মুখে এক খানা রেশমের পরদা ধরিল। কয়েক মিনিটের ভিতর লী দশ দশটা কবিতা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। প্রত্যেকটায় আটটা করিয়া লাইন। একটাতে কোন রাজ-প্রেয়সীর জীবন চিত্রিত হইয়াছে।

আহা কি আনন্দ যৌবনের ;
কাটে কাল সুখে এই হর্ম্ম্যতলে ?

* * * *

উজ্জ্বল ফুলের মালা খোঁপায় চুলের ;
ঘাঘ্‌রা জামাতে রং-বেরঙ্‌ খেলে।
কখনো বেড়াই শুভ্র হাওয়ায়'
কখনো বা বসি রাজার পাশে।

* * * *

নাচ গান বাজনা কিন্তু চির দিনের নয়,
সবাই ত নিশ্চয় এক দিন পাইবে লয়।

জাইল্‌স্‌ প্রণীত "চীনা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে লী সম্বন্ধে মাত্র সাড়ে চারি পৃষ্ঠা আছে। সুতরাং চীনের শেক্‌স্‌পীয়ারকে বুঝিব কি করিয়া? শেক্‌স্‌পীয়ারের রচনাবলী হইতে সুন্দর সুন্দর বচন বাছাই করিয়া ডড্‌ একখানা গ্রন্থ প্রচার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ম্মানেরা সেইটা পড়িয়াই শেক্‌স্‌পীয়ারের অনুরক্ত হয়। তাহার পর তাহারা অনুবাদ সুরু করে। অথচ বস্তুতঃ তাহাতে শেক্‌সপীয়ারের আসল ক্ষমতা সহস্রাংশ ও বুঝা যায় না। লী-পোর ক্ষমতা কথঞ্চিৎ বুঝিবার জন্যও অন্ততঃ একজন ডডের আবশ্যক। সেই ডড্‌ এখনও দেখা দেন নাই। কালিদাসের রচনা সবই ইংরেজিতে অনূদিত

হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চীনা কবিবরের পরিচয় পাইতেছি মাত্র এক শত লাইন হইতে। কাজেই লীর যথার্থ মূল্য শীঘ্র নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

মানুষ মাত্রেই চাঁদ-পাগ্‌লা—কবিদের ত কথাই নাই। বাঙ্গালী গাহিয়া থাকেন "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো।" কিন্তু চাঁদের সঙ্গে পিরীত করিয়া কোন বাঙ্গালী বোধ হয় এখনও মরেন নাই। সেই মরার দৃষ্টান্ত আমরা চীনে পাইতেছি। কবিবর লী-পো চাঁদের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে যাইয়াই জলে ডুবিয়া মরিয়াছিলেন। "প্রেমিক, পাগল ও কবি" একই জীব নহেন কি?

লী ভবঘুরের মতন নিরুদ্দেশ ভাবে আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একদিন রাত্রিকালে নদীবক্ষে নৌকায় সফর হইতেছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে কোন সঙ্গী নাই—লাল সরাবের ভরা পেয়ালাগুলিই এক মাত্র বন্ধু। জলে চাঁদের ও নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য কবি নৌকার কিনারায় বসিয়াছেন। নেশার ঝোঁকে নৌকা হইতে বড় বেশী ঝুঁকিয়াছেন—তাহার পরেই ঝপাত্‌ এই "অ্যাক্‌সিডেণ্টে"র কয়েক মিনিট পুর্ব্বে লী তাঁহার মনের আবেগ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। "জোনাকি"তে কবির দশ বৎসর বয়সের কল্পনা দেখিয়াছি এইটাতে ৬৩ বৎসর বয়সের শেষ খেয়াল দেখিব।

ফুলের ছড়াছড়ি তরীর ভিতর,
কেটলির গৌরব এই মদিরা অমর,
সুখের কুটিরে (কিন্তু) নাইক হায়রে
সখার ভালবাসা সদা সহচর।
এদিকে চাঁদরাণী কিরণ ঢলে
পেয়ালার উপর ও আমার ভালে।

আমার ছায়াতে মূর্ত্তি জলেতে ;
যেন বা চিনের দল নিশাকালে !
আকাশের চাঁদ কিম্বা চাঁদের ছায়া—
মদের হিস্তায় তার দেখিনা মায়া ;
আমার ছায়া, সে ত দাসীর মতন
আসিবে সেবিতে আমার কায়া।
তবুও তাদের বন্ধুত্ব আমার
একক পানোল্লাসের হইবে বাহার ;
হাসাহাসি করি দুঃখ পাসরি
পূর্ণ রাখিব বসন্ত বিহার।
ঐ দেখ চাঁদ বিরাজে আকাশে,
আমার গান শুনি কত না হাসে,
ছায়াটি আমার নাচে অনিবার,
তালে তালে এই তরণী ভাসে।
যখন মাথায় মোর নেশা না থাকে
চাঁদ ও ছায়া তখন আমায় ডাকে ;
নেশার ঘোরে যখন হই অচেতন
সঙ্গীরা ফেলিয়া যায় আমাকে।
তাতেও নাই দুঃখ, আবার মিলন
হ'বে শীঘ্র বিদায় বচন ;
সঙ্গতে বসি আনন্দে ভাসি
যাপিব সদাই স্বরগ জীবন।

চাঁদের কোলে যাইবার জন্য লীর এই সাধ। বস্তুতঃ "চাঁদ ধরিবার" প্রবৃত্তিকেই "আইডিয়লিজম্", "রোমান্টিসিজম্", "মিটিসিজম্" বা

ভাবুকতা বলে। যাহা পাওয়া যাইবে না অথবা যাহা ধরা কঠিন তাহার জন্য ব্যাকুলতাই ভাবুকতা। জার্ম্মাণ ভাবুকগণের ষ্টুর্ম্ম উণ্ড ড্রাঙ্, ইংরেজদিগের "ষ্টর্ম অ্যাণ্ড ষ্ট্রেস্" আর চীনা কবিবরের চাঁদ-ধরা একই শ্রেণীর পাগ্‌লামি বা উন্মাদনা। এই জন্যই লীকে সেদিনকার ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আন্দোলনের অবতার বলিয়াছি।

লীর উন্মাদনা বা চাঁদ-পাগলামি বাঙ্গালী সহজেই বুঝিতে পারিবেন। লী আসল চাঁদ ধরিতে চাহিয়াছিলেন—যুবক ভারত রূপক চাঁদ ধরিতে চাহেন। যুবক ভারতের সকলমহলে আজ কাল রোমান্টিসিজ্‌ম্ গুলজার হইয়া বসিয়াছে। একটা সামান্য দৃষ্টান্তে কথাটা স্পষ্ট হইবে। চিত্র সমালোচক সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমাদের পুরাণা ওস্তাদগণের আঁকা পশু পাখীর ছবি সম্বন্ধে বলিতেছেন—"এমনই সঙ্কোচ আমাদের হয়ে পড়েছে। কিন্তু পুরাকালে শিল্পীদের এমন কোন দ্বিধা ছিল না। তারা পশু পাখী আঁকতো তেমনি ভাবে যেমন প্রকৃতিতে তারা ঘুরে বেড়ায়। হাতী আঁকবে যদি তাহলে মত্ত হাতী কমল বনে কেমন করে মাতোয়ারা হয়ে ফুল ছোড়াছুড়ি করে তাই দেখাত; বাঘ এঁকেছে জঙ্গলে ছাড়া অবস্থায় বা মৃগের উপর লাফিয়ে পড়ার অবস্থায়; বলদ এঁকেছে বোঝা বইবার অবস্থায় নয়, অন্য একটা বলদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করার অবস্থায়; শূকর এঁকেছে পোষ মানা নিরীহ নয়, অশ্বারোহী শিকারীর প্রতিদ্বন্দ্বী বরাহ এঁকেছে; পাখী এঁকেছে মুক্ত প্রকৃতির শ্যামল পল্লবের ছায়ায় ফুলের কুঞ্জ বনের মাঝে; মরাল এঁকেছে শতদল শোভিত সরোবরের মাঝে বা নীল আকাশের গায়ে; ক্রৌঞ্চের সারি একেছে বিজুলীহানা কালো মেঘের গায়ে; কপোত কপোতী এঁকেছে পাশাপাশি লতা পাতার মাঝে; বাজপাখী এঁকেছে চোখে ঠুলি-দেওয়া বোবা নয়, এঁকেছে শিকার ধরা জঙ্গলী বাজ।"

এই বর্ণনার ঝোঁক দেখিয়াই ভারতীয় রোমাণ্টিক আন্দোলনের
জোয়ার বহিতেছে বুঝিতে পারি। এই চিত্র সমালোচনায় ভাবুকতায়
বড় বড় তিন লক্ষণ এক সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং বাধাহীন অকৃত্রিম স্বচ্ছন্দ জীবনে অনু-
রাগ। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি-নিষ্ঠা অর্থাৎ দেওয়াল-ঘেঁসা সভ্যতাকে
ঝকমারি বিবেচনা করা। তৃতীয়তঃ মধ্যযুগের সমাদর ও মোটের
উপর অতীত-প্রীতি। ক্লপ্‌ষ্টক, লেসিঙ্‌, হার্ডার, গ্যেটে ও শিলরের
যুগে যুবক জর্ম্মানি অবিকল এই নেশায় মাতাল হইতেছিল। ক্লিঙ্গার
(১৭৫২-১৮৩১) একখানা গ্রন্থই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার
নাম "ষ্টুর্ম উণ্ড্‌ ড্রাঙ্‌"। সেই গ্রন্থ হইতেই রোমাণ্টিক আন্দোলনের
নামকরণ হইয়াছে। ভারতীয় চিত্র-সমালোচকের মূলমন্ত্রে আর ক্লিঙ্গার
প্রচারিত মূলসূত্রে কোন প্রভেদ নাই। এই জন্যই বলিতেছি চীনের
চাঁদ-পাগলা কবিবরকে যুবক ভারত শীঘ্রই আপনার করিয়া লইতে
পারিবে।

ইংরেজিতে লী-পোর যতটুকু বাহির হইয়াছে সবটুকুই বাঙ্গালীকে
দেওয়া গেল। এখন একটা মজার গল্প বলিতেছি। লী সম্বন্ধে চীনে
একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। লী মফঃস্বলের লোক। ছিছোয়ন
প্রদেশে তাঁহার জন্ম। লীর চেহারা খুব সুন্দর ছিল ঠিক যেন কার্ত্তিক।
তাহার উপর দশ বৎসর বয়সেই প্রাচীন কন্‌ফিউশিয় সাহিত্য তাহার
কণ্ঠস্থ—আর লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অতি উঁচু দরের ক্ষমতা
প্রকাশ। কাজেই পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ভাবিত—"লী মানুষ নয়—
স্বর্গের জীব। অমর লোক হইতে বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ মর্ত্ত্যে
নির্ব্বাসিত হইয়াছে।" রূপগুণ সমন্বিত ছোক্‌রা মদের অনুরক্ত হইয়া
উঠেন। একদিন সে কোথায় শুনিল, যে চীনের সেরা মদ পাওয়া

যায় লিও চিঙ্ নগরে। নিজের বাড়ী হইতে তিন শত মাইলের পথ। কুছ্ পরোয়া নাই। স্বর্গের জীব মর্ত্ত্যের অমৃত পান করিতে দেশত্যাগী হইলেন। মাতালের আড্ডায় গান চলিতেছে। এমন সময়ে এক সেনাপতি ঐ পথে যাইতেছিলেন। চীনের রাজকর্ম্মচারীরা ও পণ্ডিতেরা সকলেই সঙ্গীতভক্ত। গান শুনিবামাত্র সেনাপতি মহাশয় লীকে সঙ্গে লইলেন। লী রাজধানীতে উপস্থিত। এইখানে এক মদের দোকানে সভাপণ্ডিত হো মহাশয়ের সঙ্গে লীর আমোদ প্রমোদ ও বন্ধুত্ব।

হোর পরামর্শে লী দরবারী উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরীক্ষক ছিলেন দুইজন। রাণীর ভাই ইয়াঙ্ আর রাজশরীর-রক্ষীদিগের কাপ্তেন (কাও)। ইঁহারা ঘুশ খোর। নজর না পাইলে ডিগ্রি দেওয়া ইঁহাদের দস্তুর নয়। হো লীর হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিলেন—"পরীক্ষকদিগকে এইটা দেখাইলেই তোমার নজর দিতে হইবে না।" পরীক্ষকেরা চিঠিটা পড়িল আর বলাবলি করিতে থাকিল—"দেখেছ—হোর কি বাটপারি? নজরটা একাকীই হজম করিলেন—আর আমাদের জন্য কেবল মোলায়েম চিঠি খানা পাঠাইয়াছেন!" পরীক্ষার দিন আসিল—পাশ হওয়া'ত লীর পক্ষে হাতের পাঁচ। অন্যান্য সকল পরীক্ষার্থীর আগেই তিনি তাঁহার প্রবন্ধ আফিসে পেশ করিলেন। কিন্তু পরীক্ষকেরা প্রবন্ধটা পাঠ করা পর্য্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। লীর নাম দেখিয়াই কাগজের উপর নম্বর বসাইয়া দিলেন ও ইয়াঙ্ বলিলেন—"এই পরীক্ষার্থী আমার কালী ঘসিবার উপযুক্ত—ইনি চান উপাধি।" কাও বলিলেন—"আরে বলো কি? আমি ত দেখিয়াছি যে, লী আমার মোজা ও বুটের ফিতা পরাইবার উপযুক্ত।"

লী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া হোর গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা "ইয়াঙের দ্বারা আমি কালী ঘসাইব তবে মরিব। আর কাওয়ের হাতে আমার মোজা ও বুটের ফিতা পরাইব তবে মরিব।" হো বলিলেন—"ওহে বেশী না চটাই ভাল। তিন বৎসরের ভিতরেই আবার পরীক্ষা আসিবে। তখন ইঁহারা পরীক্ষক থাকিবেন না। কাজেই তোমার ডিগ্রি লাভ হইবেই হইবে।"

কয়েক মাস মদ খাওয়া ও গান গাওয়া চলিতে থাকিল। এমন সময়ে একদিন রাজদরবারে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। নান্‌কিঙ তখন রাজধানী—পিকিঙের অস্তিত্ব ছিল না। তাঙ্‌ আমলের তিন শতাব্দী পরে মোগল আমলে পিকিঙ্‌ রাজধানী হয়। নান্‌-কিঙের দরবারে কোন্ এক বিদেশী মুল্লুক হইতে কয়েকজন দূত আসিয়াছেন। তাঁহাদের পত্র কোন রাজ কর্ম্মচারীই পাঠ করিতে অসমর্থ। সম্রাট্‌ মিঙ্‌ হুয়াঙ্‌ বা হুয়াঙ্‌ চুঙ্‌ চটিয়া মন্ত্রিবর্গকে জানাইলেন—"দুনিয়ার গৌরব চীন আর চীনের গৌরব নান্‌কিঙ্‌। সেই নান্‌কিঙের কোন পণ্ডিত এক খানা বিদেশী রাষ্ট্রের চিঠি পড়িতে অসমর্থ। তাহা হইলে অসভ্য বর্ব্বরেরা কি চীনের নিকট আর মাথা নোয়াইতে রাজি হইবে? অতএব তিন দিনের ভিতর তোমরা যদি চিঠি পড়িতে না পার তাহা হইলে সকলকেই 'সাস্‌পেণ্ড' করিব। যদি ছয় দিনের মধ্যে চিঠির অর্থ না বাহির করিতে পার তাহা হইলে সকলকে বরখাস্ত করিব। আর নয় দিনের পর সকলেরই গর্দ্দান নিব।"

হো আসিয়া লীকে সংবাদ দিলেন। মুচ্‌কি হাসিয়া লী বলিলেন—"কি বলিব মহাশয়, আজ যদি আমার ডিগ্রি থাকিত তাহা হইলে রাজ-দরবারের সেবায় আমি নিযুক্ত থাকিতে পারিতাম।" হো পরদিন দরবারে জানাইলেন—"নানা ভাষায় সুপণ্ডিত এক ব্যক্তি আমার গৃহে

অতিথি। হুকুম করিলে তিনি মহারাজের উদ্বেগ দূর করিতে পারেন। তাঁহার অজানা কোন বিদ্যাই নাই।" চীনেশ্বর তৎক্ষণাৎ লীর নিকট লোক পাঠাইলেন। লীর অভিমান সুরু হইল। তিনি এক ডাকে সভায় আসিলেন না। সম্রাট্ বাহাদুরকে জানানো হইল—"লীর প্রবন্ধ গত পরীক্ষায় অমঞ্জুর করা হইয়াছে। তাঁহার কোন উপাধি নাই। তিনি দরবারে উপস্থিত হইলে হয় ত ইয়াঙ্ এবং কাও রাগ করিতে পারেন।" সম্রাট্ বলিলেন—"সে কি কথা! এখনই লীকে ডিগ্রী দেওয়া হউক। আমার হুকুমে লী প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার হইলেন। এই উপাধির চিহ্ন-সূচক পোষাক, কোমরবন্ধ ও টুপি এখনই তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। হো আপনি যাইয়া লীকে আমার আদেশ জ্ঞাপন করুন।" উপাধি পাইয়া পোষাক পরিয়া ডাক্তার লী সগৌরবে রাজ সভায় দেখা দিলেন। লীর গোঁ এখনও থামে নাই। কাওতাঙ (কুর্ণিশ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) এর পর লী বলিলেন—"মহারাজ, আমি ত কালী ঘসিবার উপযুক্ত এবং রাজকর্ম্মচারীদের চরণ সেবা করিবার উপযুক্ত। পরীক্ষক মহাশয়গণ আমাকে পরীক্ষা গৃহ হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন কোথায়? বিদেশী বর্ব্বররাষ্ট্রের দূতেরা চীনা পণ্ডিতদিগের মূর্খতা দেখিয়া হাসিতেছে না কি?" সম্রাট্ বলিলেন—"আরে! ডাক্তার লী, সে কথা কি মনে রাখিতে আছে? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। ধরো—চিঠি খানা পড়ো।"

নিমেষের মধ্যেই গোটা চিঠি পড়া ও বুঝা হইয়া গেল। লী হাসিয়া বলিলেন—"ইহার জন্য এত কাণ্ড? এত ছেলে খেলা? চীনা ভাষাতে লী বর্ব্বর চিঠির অনুবাদ করিতে লাগিলেন—"তাঙ্ রাজের নিকট পোহাই দেশের প্রবল প্রতাপ কো-তো বাহাদুরের চিঠি। তাঙ্ রাজগণের কোড়ীয়া দখল করিবার পর কয়েক পল্টন

চীনা সৈন্য কোড়ীয়ায় রহিয়াছে। তাহারা আমাদের স্বাধীন রাজ্যের ভিতর আসিয়াও সময়ে সময়ে দাঙ্গা করে। এই জুলুম আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত নই। আপনারা কোড়ীয়ার ১৬২ টা সহরের শাসন ভার আমাদের হাতে প্রদান করুন। তাহা হইলে গণ্ডগোল থাকিবে না। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা চীনশ্বরকে অমুক পাহাড়ের ভেষজ অমুক সমুদ্রের ঝিনুক ও শঙ্খ, অমুক দেশের হরিণ, অমুক দেশের ঘোড়া অমুক দেশের রেশম, অমুক নদীর মাছ, অমুক জনপদের ফল, আর অমুক দেশের ইটপাথর দিতে রাজি আছি। এই উপহার শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব। যদি আপনাদের অমত থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে আমরা চীন মুল্লুক আক্রমণ করিব।"

চড়াসুরের পত্রখানা শুনিবামাত্র দরবারে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কাহারও মুখে কথা সরে না। শেষে হো বলিলেন—"মহারাজ, আপনার পিতামহ তাই-চুঙ্ বীর ছিলেন। তাঁহার আমলে চীনারা সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত। তিন তিন বার তাই-চুঙ্ কোড়ীয়া আক্রমণ করেন—কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি কোড়ীয়া বিজয় দেখিতে পান নাই। শেষ পর্য্যন্ত শতাধিক যুদ্ধের পর কোড়িয়া দখল হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল আমরা যুদ্ধবিদ্যা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি—আমাদের তলোয়ারে মরিচা পড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর কাল লড়াইয়ের কোন উদ্যোগ হয় নাই। শান্তির ফলে আমরা এক্ষণে নিতান্ত নির্জ্জীব। বিদেশী বর্ব্বরের সঙ্গে আজ যুদ্ধ করা এক প্রকার অসম্ভব। আমরা হারিয়া যাইতে বাধ্য।"

অতএব কি কর্ত্তব্য? সকলের চোখ লীর দিকে পড়িল। লী বলিলেন "ভাবনা কি? আমি বর্ব্বর দূতগণকে বেশ গরম জবাব দিয়া দিব। ঠিক তাঁহাদেরই জবাব এই সভাস্থলে চীনেশ্বরের হুকুম জানাইয়া

দিব।" সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাক্তার লী কো-তো কাহাকে বলে?" লী বলিলেন—"বর্ব্বর ভাষায় কোতো শব্দের অর্থ রাজা। যথা হুই হুই দের রাজা "কোকন" তিব্বতীদের রাজা "চাংপো" লোচাওদের রাজা "চাঙ" হোলিঙ্দের রাজা "সি-যো-য়ে"। লীর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সম্রাট্ মুগ্ধ। সেই দিন হইতেই লীর জন্য প্রাসাদের ভিতর ঘর ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। তার পর তিনি স্বয়ং সম্রাটের এক গ্লাসের ইয়ার হইলেন। রাজপ্রেয়সীরাই লীর প্রেয়সী হইলেন। নাচ গান বাজনা চীনেশ্বরের পদমর্য্যাদা অনুসারেই চলিতে থাকিল। চীনা সাহিত্যে এই সম্রাট্ অমর হইয়াছেন। মিঙ্ হুয়াঙের প্রেম কাহিনী লয়লামজনুনের গল্পের মতন, দান্তে বিয়েট্রিসের গল্পের মতন, এমন কি রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলার মতন চীনাদের আদরণীয় বস্তু। প্রেম-সাহিত্য বলিলে চীনারা এই রাজ-প্রেমের বিবরণই বুঝিয়া থাকে। তাঙ্ যুগের অন্যতম কবিবর পো-চুই (৭৭২-৮৪৬) এই বিবরণ অমর করিয়াছেন।

পরদিন সভায় দূতদিগকে ডাকা হইল। লী জানাইলেন—"দেখ, তোমাদের বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। তোমরা চীনেশ্বরের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া এই চিঠি আনিয়াছ। যাহা হউক চীনেশ্বর অতিশয় ক্ষমা-বান্ লোক—তোমাদের অনিষ্ট করিবেন না। তোমাদের চিঠির জবাব শুন।" তাহাদের স্বদেশী ভাষায় গম্ভীর ও স্পষ্ট স্বরের আওয়াজ গুলি শুনিবামাত্র দূতেরা ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল। দরবারের কর্ম্ম-চারীরা দেখিলেন উহারা সম্রাট্কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। তাঁহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই। এইবার লী সম্রাট্কে বলিলেন—"কাল রাত্রে মদের আড্ডায় আপনার প্রেয়সীরা আমার জুতা মোজা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এরূপ কদর্য্য বেশে কি দরবারে দাঁড়াইয়া মূল্য-

বান্ আদেশ দেওয়া চলে? আপনি কাওকে বলুন তিনি আমার পায়ে নূতন মোজা ও বুট পরাইয়া দিন। তাহাই হুকুম হইল। লী আবার বলিলেন—"আমি পরীক্ষা গৃহের অপমান আজও ভুলি নাই। আপনি আদেশ করুন ইয়াঙ্ আমারজন্য কালী ঘসিতে থাকুক।" তাহাই হইল। লী অল্পকালের ভিতর বর্ব্বর অক্ষরে এক লম্বা জবাব লিখিয়া ফেলিলেন। চীনা ভাষায় তাহার তর্জ্জমা ও সভায় পাঠ করা হইল।

জবাবটার মর্ম্ম এই:—"ওরে মুর্খ কোতো তুই চীনেশ্বরের সঙ্গে লড়িতে চাস্? পাহাড়ের উপর ডিমের আক্রমণ? ড্রেগনের সঙ্গে সাপের লড়াই? চীন-সাম্রাজ্য চারি সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমার লোকবল, ধনবল, সৈন্যবল, :অস্ত্রবল অসীম। এই সেদিন এক বর্ব্বর বেকুবি করিয়া লড়িতে আসিয়াছিল। পলকের মধ্যে সে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। চীনেশ্বরের হুকুম তামিল করে না দুনিয়ার কোন রাজা? কোড়ীয়া হইতে আমরা রেশম উপহার পাই। তাহাতে চীনেশ্বরের স্তুতি লেখা থাকে। পারস্য হইতে আমরা সাপ উপহার পাই। এই সাপ গুলি ইঁদুর ধরিতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে আমরা পাখী উপহার পাই। এই সকল পাখী কথা বলিতে পারে। রোম হইতে আমরা কুকুর উপহার পাই। এই কুকুর মুখে লণ্ঠন রাখিয়া ঘোড়ার পথ-প্রদর্শক হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব ভাল চাস্ ত শীঘ্র কর পাঠাইয়া দে। তাহা না হইলে কোড়ীয়ার ভাগ্য তোর মুল্লুকের দেখিতে পাইবি। সুতরাং আর আহাম্মুকি করিস্ না।"

জবাব পাইয়া দুতেরা প্রস্থান করিল। ফটক পর্য্যন্ত হো ... ছিলেন। দুতেরা জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, এক বিচিত্র কাণ্ড

আপনাদের রাজধানীতে! প্রধান মন্ত্রী কালী ঘসিতেছেন—আর প্রধান সেনাপতি জুতা মোজা পরাইতেছেন! আর যিনি আমাদের জবাব দিলেন তিনিই বা কে?" হো বলিলেন—ইঁহারা সকলেই মহা পণ্ডিত এবং চীনের শীর্ষস্থানীয় লোক। কিন্তু ডাক্তার লী একজন অসাধারণ লোক মাত্র নন। ইনি মানুষ নন—দেবতা! স্বর্গ হইতে নামিয়া ইনি চীনেশ্বরের দরবারে নকরি লইয়াছেন।" "বাপ্‌রে!" বলিয়া দূতেরা নিজের মুল্লুকে চলিয়া গেল। দূতমুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কোতো ভাবিলেন—"চীনেশ্বরের কাছারীতে স্বর্গের জীব বাহাল থাকেন। অতএব তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সফল হইতে পারিব না। গণ্ডগোল না করিয়া কর পাঠাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

লী আজও চীনা মহলে "স্বর্গের জীব" নামে পরিচিত। "সরস্বতীর বরপুত্র" অথবা স্বয়ং "বৃহস্পতি" বলিলে আমরা যাহা বুঝি ডাক্তার লী তাই। রাজদরবারে লী বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই। ইয়াঙ, কাও এবং অন্যান্য, কর্ম্মচারীর হিংসায় এবং বোধ হয় রাজপ্রেয়সীগণের ষড়যন্ত্রে লী-পো রাজভোগ ও রাজবন্ধুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে নাকি তিনি একবার রাজদ্রোহের মাম্‌লায়ও পড়িয়াছিলেন এবং বন্দীও হন। জেলে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই! তাঁহার অধিকাংশ জীবনই ভবঘুরের জীবন।

শিলারকে গ্যে'টে ছোট ভাইয়ের মতন ভালবাসিতেন। সাহিত্য-সংসারে এরূপ বন্ধুত্ব বড় একটা দেখা যায় না। শিলার কবিতা লিখিবেন—গ্যে'টে তাহার খসড়া প্রস্তত করিতেছেন। গ্যে'টে তাঁহার "ফাউষ্ট" কাব্য সম্পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না—শিলার তাঁহাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছেন। জার্ম্মাণ সাহিত্যে নব জীবন আনা আবশ্যক—দুই জনে মিলিয়া কাগজে বাহির করিলেন। গান, নাটক, সমালোচনা, আদর্শ প্রচার—সকল বিষয়েই দুই জনে এক সঙ্গে কর্ম্ম করিতেন। বহুকাল একস্থানে বসবাসও হইয়াছিল। দুইজনে দুই ধরণের কবি—দুইয়ের জগৎ বিভিন্ন কিন্তু জীবনে ইহাঁরা "হরিহর এক আত্মা"। তথাপি "কুচুটে" জার্ম্মাণেরা দুই জনের মধ্যে ঝগড়া বাধাইতে চেষ্টা করিত। তাহারা আজ শিলারের তারিফ করিবার জন্য সভা করিতেছে—কাল "শিলার-সমিতি" স্থাপন করিতেছে; পরশু শিলারের মূর্ত্তিতে মুকুট পরাইবার জন্য মজলিশ পাকাইতেছে। গ্যে'টেতে শিলারে আড়াআড়ি সৃষ্টি করিবার জন্য এই সমুদয় আন্দোলন। কিন্তু শিলারের মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্যে'টে তাঁহার বন্ধুই ছিলেন। মৃত্যু সংবাদ পাইয়া গ্যে'টে বলিয়াছিলেন—"আমার আধখানা জীবন চলিয়া গেল।" শিলার বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে গ্যে'টের "ফাউষ্ট" বাজারে প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু লেখা শেষ হইয়াছিল। ইহাতে শিলারের জীবনের এক বড় সাধ মিটিয়াছিল। "ফাউষ্ট" সম্পূর্ণ হওয়ায় শিলার ভাবিয়াছিলেন—"আমার কাজ শেষ হইয়াছে।" জার্ম্মাণ সাহিত্যের বাজারে কিন্তু আজও মামলা মিটে নাই। আজও সমালোচকগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"গ্যে'টে বড় কবি, না শিলার বড় কবি?"

ইংরেজি সাহিত্যেও এই ধরণের একটা প্রশ্ন অনেক দিন হইতেই

চলিতেছে। ইংরেজ সমালোচকেরা ভাবিয়া আকুল—"শেক্‌স্‌পীয়ার বড় না বেন্ জন্‌সন্ বড় ?" আর একটা প্রশ্নও ইংরেজমহলে পাকাইয়া উঠিতে পারে—"টেনিসন বড়, না ব্রাউনিঙ্ বড় ?" ভারতবর্ষেও প্রশ্ন উঠিয়া থাকে—"কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড় ?" আর আমাদের বাঙ্গালাদেশেও একটা প্রশ্ন আছে—"দ্বিজেন্দ্রলাল বড়, না রবীন্দ্রনাথ বড় ? চীনা তার্কিকেরাও এই ধরণে একটা বাতিক লইয়া মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রশ্ন—"লী-পো বড় কবি, না তু-ফু বড় কবি ?" এই হিসাবে তু-ফুকে চীনের "ভবভূতি" বলিয়া লইলাম। লী যেমন "স্বর্গের জীব" তু সেইরূপ "কাব্যদেব"। লী-পো এবং তু-ফু দুই জনেই এক সময়ে জীবিত ছিলেন। ইহাঁরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক। তু-ফু ৭১২ হইতে ৭৭০ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। লী-পো এবং তু-ফু আমাদের ভবভূতিরই সমসাময়িক। ইহাঁরা সকলেই কালিদাসের তিন শত বৎসর পরের লোক।

আমরা বিক্রমাদিত্য-গৌরব বলিলে অশেষ প্রকার উৎকর্ষ বুঝিয়া থাকি। চীনাদের তাঙ্-গৌরবও ঠিক তাই। রাষ্ট্রগৌরব, শিল্পগৌরব, ধর্ম্মগৌরব, সাহিত্যগৌরব সকলই তাঙ্ যুগের (৬১৮-৯৬০ খৃঃ অঃ) চীনে মজুত। এই যুগের অনেক কবি অমর। তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে চীনারা লী-পো এবং তু-ফুর সঙ্গে এক আসন প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহার নাম হ্যান্-য়ু। ইহাঁর জন্ম ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ লীর মৃত্যুর দু-এক বৎসর পরে এবং তুর মৃত্যুর দুএক বৎসর পূর্ব্বে হ্যান্ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। হ্যান্-য়ু আমাদের গোপাল ও ধর্ম্মপালের সমসাময়িক। হ্যান্-য়ুকে চীনারা "সাহিত্য-রাজ" উপাধি দিয়াছে। ভারতবর্ষে এই ধরণের অনেক উপাধি সুপরিচিত। দেশের লোকেরা এ সকল উপাধি

সম্মান করিয়াও থাকে। চীনা সমাজেও এই "সাহিত্যরাজ" উপাধি চরম প্রশংসার প্রমাণ। এই উপাধি বোধ হয় অন্য কোন চীনা কবি ভোগ করেন নাই।

হানের মৃত্যুর তিনশত বৎসর পর এক ব্যক্তি হান্—"প্রশস্তি" রচনা করেন। তাহা হইতে চীনা সাহিত্যে হানের স্থান বুঝা যায়। লেখকের নাম সু তুংপো বা সু শিহ্ (১০৩৬-১১০১)। প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন :—

গিয়াছিল সে চড়িয়া ড্রেগনে সাদা নীরদের রাজ্যে ;
কাড়িয়া আনে সে আকাশের জ্যোতি দিব্য বাহুর সাহায্যে ;
পরিয়াছিল সে দরবারি পোষাক তারার আলোকে ভরা ;
সিংহাসনে তারে পরমেশ্বরের পবন বাহিল ত্বরা।
বিচক্ষণ সে ঝাড়িয়া উড়াল স্বদেশ হ'তে ভুসি ও তুষ ;
ভ্রমিল সদা বিশ্বজগতের সীমাপ্রান্তে সে অমানুষ।
পরাইয়াছিল সে নিজের দীপ্তি প্রকৃতি সুন্দরীর অঙ্গে ;
কাব্য-রাজ্যের আসরে তৃতীয় বীর সে লীপোতুফুর সঙ্গে।
টক্কর দিতে তাহার সনে চেষ্টা করিল অগণিত লোক,
নয়ন তাদের ঝলসিয়া গেল পাইয়া তাহার উজ্জ্বল আলোক।
স্বরগে তখন ছিলনা সঙ্গীত, দেবগৃহ সব আনন্দ হীন ;
ভগবান্ তারে তলব করিলেন— "ত্রিদিবে আসি বাজাও বীণ"।

এই "হান-য়ু নঙ্গলে"র অবশিষ্ট অংশে কবির জীবনের কয়েকটা কথা আছে। তাহার অনুবাদ দিলাম না। কিন্তু হান্-য়ুর কবিত্বশক্তিকে চীনারা তিন শত বৎসর পরেও কোন্ চোখে দেখিত তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এই সঙ্গে চীনা সমালোচকগণের দৌড়ও বুঝিয়া লইলাম। কবিপ্রশস্তি হিসাবে এই কয় লাইন দুনিয়ার সর্ব্বোচ্চ সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে কি? চীনারা ভাবুক জাতি। ইহারা কল্পনার পাখায় উধাও হইতে জানে।

তুফুর জীবন আর লীপোর জীবন অবিকল একপ্রকার। চাঁদ পাগ্‌লা লীর মতন তুও 'মাতাল', প্রকৃতিভক্ত এবং ভবঘুরে। তু ও রাজদরবারে বড় চাকুরি পাইয়াছিলেন—কিন্তু কাছারীতে তিনি তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পরে মফঃস্বলে একটা বড় পদ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু তাহার দ্বারা আফিসী কাজ চালান অসম্ভব! আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানই তুর জীবনের প্রধান ঘটনা। অনাহার, অনিদ্রা, চিরপ্রবাস এবং কষ্ট-ভোগ সকল বিষয়েই লীর জুড়িদার তু। রাজধানীতে থাকিবার সময়ে দুই জনের বন্ধুত্বও হয়। বন্ধু দ্বয়ের মৃত্যুও একপ্রকার। লী নৌকা হইতে জলে পড়িয়া মারা যান। তুর কপালেও নৌকা ডুবিছিল। ঘটনাচক্রে আধ-মরা অবস্থায় তাঁহাকে তুলিয়া লোকালয়ে আনা হয়। উদ্ধারকর্ত্তা মহাশয় তুকে সম্মান দেখাইবার জন্য এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিলেন। তাহাতে নানা প্রকার চর্ব্বাচোষ্যের ব্যবস্থা ছিল। কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তু বেচারা অনেক দিনের অনাহারের পর পেট ভরিয়া মদ টানিতে লাগিলেন। মদের সঙ্গে গোমাংসও প্রচুর উদরস্থ হইল। তৎক্ষণাৎ ব্যাধি ও মৃত্যু।

বাঙ্গালা দেশে আমরা কাল বৈশাখীর উপদ্রব প্রত্যেক বৎসরই দেখিয়া থাকি। অসংখ্য মাঝি, মজুর, কৃষকেরা এই সময়ে গৃহহীন হইয়া পড়ে। ধরা যাউক যেন বিক্রমপুরের গোবিন্দ দাস এইরূপ এক দরিদ্র গৃহহীনের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তুফুর "শরতের ঝড়" কবিতায় বাঙ্গালী আপন কথাই পাইবেন। বাড়ের ইংরাজি অনুবাদ হইতে চীনা দরিদ্রের আক্ষেপ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

আমার ঘরের চালা গিয়াছে উড়ি
আজ এই শরতের প্রচণ্ড ঝড়ে!
চালাটা তৈরি মাত্র কঞ্চী খড়ে,—
একমাত্র আচ্ছাদন, হায়! ছাড়া লেপমুড়ি।

ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর ওপারে,
উড়ে গেল চালা এলো মেলো ;
দম্‌কা হাওয়ায় খড় গাছে ঠেকালো,
চষা মাঠেতে আর কিছু পুকুরে।
পাড়ার ছোঁড়ারা বলাবলি করে
মহা আনন্দে—"দ্যাখ্‌ মজা ঐ বুড়োর",
আর চোখের সাম্‌নে যত জুয়াচোর
গরিবের জিনিষ হেসে খেলে হরে।
বহুকষ্টে তাড়ালাম দুষ্ট জনে ;
ফিরে দেখি, হায় ! চালা নাই ঘরের ;
ঠোঁট শুক্‌না মোর, যেন জিহ্বা কাঠের ;
শরীর দুর্ব্বল ; শোওয়া যাক্‌ হতাশ মনে।
বাতাস নরম হ'ল ; ঘোর মেঘ আকাশে ;
রাত্রিতে কন্‌কনে শীত বেড়ে যায় ;
গায়ে কাপড় নাই জীর্ণ বিছানায়
ব্যথা ও চিন্তার ভারে ঘুম না আসে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এখনও পড়ে ;
শুইয়া দেখিতে পাই মেঘ্‌লা আকাশ ;
সবই স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে ; মন উদাস ;
এ দুঃখ নাশের উপায় কে বা গড়ে ?
হায় ! যদি থাকিত আনন্দ-ভবন,
এক কোটি কুঠুরি তার সুন্দর উজ্জ্বল,
দুনিয়ার দরিদ্রের সে আশ্রয়-স্থল,
চির-শান্তি-সুখের মহা নিকেতন ?

দেখিতাম যদি সেই গরীয়ান্ আশ্রম
আজ বা কোনো দিন উঠিছে গড়ি,
প্রাণ ও কুটির তবে সুখেই ছাড়ি।
সুরু হ'ত জগতে মঙ্গলের ক্রম!

বুড়োর আপ্‌শোষের প্রথম অংশটা পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল যেন পশ্চিমা দরিদ্রবন্ধু কৃষক-কবি বার্ণসের (১৭৫৯-৯৬) রচনা পড়িতেছি। তুফু শেষ অংশে দরিদ্রের জন্য একটা সরকারী ঘর চাহিয়াছেন। প্রস্তাবটা যেন নিতান্ত আধুনিক সোশ্যালিষ্টদিগের আড্ডা হইতে বাহির হইয়াছে। লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) নেতৃত্বে ফরাসী শ্রমজীবীরা ১৮৪৮খৃষ্টাব্দে প্রায় এই ধরণের এক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতেছিল। লুইব্লাঁর মতে কুলীমজুর দিগের জন্য রাষ্ট্রের কর্ত্তারা কাজ খুজিয়া দিতে বাধ্য। এইজন্য প্রয়োজন হইলে সরকারী ফ্যাক্টরী, সরকারী শিল্পকারখানা এবং সরকারী শ্রমজীবি-ভবন খোলা আবশ্যক। জার্ম্মানিতেও কার্লমার্কস্ এবং ফার্ডিনাণ্ড লাঙ্গেলের নেতৃত্বে গরিবের জন্য এইরূপ আন্দোলন প্রথম দেখা দেয়। ইতালীর স্বদেশ সেবক ম্যাট্‌সিনিও লুইব্লাঁর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীনা কবিবর এতদূর অগ্রসর হন নাই। তিনি গরিবের জন্য ঘর মাত্র দাবি করিয়াছেন। তাহা হইলেও দাবিটা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রচারিত হওয়া বিশেষ বিস্ময়ের কথা। দুনিয়ার সোশ্যালিষ্ট শ্রমজীবি-নেতারা এই চীনা কবিতাটা তাঁহাদের গীতায় স্থান দিতে পারেন।

দুইবৎসর ধরিয়া ইয়োরোপে মহাসমর চলিতেছে। ইতিমধ্যে সকল পক্ষেই লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়িয়াছে। প্রত্যেক যুদ্ধেরই একদিক জয় বা পরাজয়, লাভ বা ক্ষতি, অপর দিক লোকক্ষয়। যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিবার সময় এই লোকক্ষয়ের দিকটা মনে থাকেনা। "যায় প্রাণ থাকে মান" বিবেচনা করিয়া রক্তমাংসের মানুষ বেহুঁস ভাবে লড়িতে অগ্রসর হয়।

এই উন্মাদনায় বাধা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। জগতের ইতিহাসে কোন দিন বুদ্ধ থামে নাই—থামিবেও না। কিন্তু চিরকালই যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছে। আজ কালকার তথাকথিত পীস্ (বা শান্তির) পাণ্ডাদিগের প্রতিবাদের কথা বলিতেছি না। এই প্রতিবাদ উঠিয়াছে অনাথ বালক বালিকাদিগের নীরব দুঃখ হইতে—আর উঠিয়াছে নারীজাতির সাশ্রু দীর্ঘশ্বাস হইতে। ইংরেজ পুরুষ লড়িতেছেন প্রাণ দিতেছেন, জার্ম্মান পুরুষ লড়িতেছেন, প্রাণ দিতেছেন। "সম্মুখ সমরে যার, মাথা কাটা যায়। কবিগণ মুক্তকণ্ঠে তার যশ গায়।" ঠিক কথা, অপর দিকে ইংরেজ সমাজে ক্রন্দনের রোলও কম কি? আজ জার্ম্মাণির পরিবারে পরিবারে হাহাকার শুনিতেছি না কি? বস্তুতঃ ফরাশী, ইংরেজ, রুশ, জার্ম্মাণ, তুর্কী, ইতালীয়, সার্ভ—ইহাদের প্রত্যেক পরিবার হইতেই অন্ততঃ একজন করিয়া পুরুষ ইতিমধ্যে প্রাণ দিয়াছে। অগণিত শিশু পিতৃহীন হইল—অগণিত রমণী বিধবা হইল। ইংরেজেরা যুদ্ধে জিতিলেও ইংরেজ রমণীর দুঃখ ঘুচিবেনা—জার্ম্মানেরা যুদ্ধে জিতিলেও জার্ম্মান-রমণীর দুঃখ ঘুচিবেনা। যুদ্ধে যে মরিয়া গেল সেত স্বর্গে গেল; আর যাহারা তাহার স্মৃতি লইয়া জগতে রহিল তাহাদের দুঃখ জীবনব্যাপী হইল, তাহারা চিরজীবন কাঁদিয়া কাটাইবে। পুত্রকন্যার হৃদয় মাতৃপত্নীর হৃদয় কোন দিনই শান্তিলাভ করিবেনা। এই অশান্তি, ক্রন্দন, দুঃখ ও বিষাদ প্রত্যেক যুদ্ধেরই তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু এই সকল বিপদকে মানব জাতি চিরদিনই সহিয়া আসিতেছে। ইহা অগ্নিপরীক্ষা—এই অগ্নি পরীক্ষায়ই চরিত্র গঠিত হয়—মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে উঠে।

যুদ্ধ-সাহিত্যে যুদ্ধের দুই তরফই দেখিতে পাই। প্রথমতঃ জয় পরাজয়, লাভ ক্ষতি, গৌরব অগৌরব ইত্যাদির কথা। দ্বিতীয়তঃ ক্রন্দনের রোল, বিষাদের কথা, হৃদয়ের প্রতিবাদ। আজকালকার ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও এক সঙ্গে দুই ধরণেরই যুদ্ধ-কাব্য রচিত হইতেছে। চীনা সাহিত্যেও

এই দুই ধরণেরই চিন্তা দেখিতে পাই। লীপোর রচনায় সগৌরবে যুদ্ধ যাত্রার বিবরণ দেখিয়াছি। তুফুর কাব্যে ক্রন্দনের রোল শুনিতেছি।

চীনা কবিবরের যুদ্ধ-প্রতিবাদ শুনা যাউক। তুফু পুরাণা ইতিহাসের কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে কবিতাটা রচনা করিয়াছেন। হান্ সম্রাট্ হুয়েন্ চুঙ অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কাজেই সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্যতামূলক আইন জারি করিতে হয়। জার্ম্মাণিতে এই আইন আছে। ইংরাজেরাও বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য এই আইন জারি করিতে বাধ্য হইলেন। এই আইনের জোরে যখন তখন যে কোন পুরুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান যাইতে পারে। চীনা কবিতায় পড়িতেছি :—

রথের ঘর্ঘর ; ঘোড়ার ডাক ;
পল্টনের হল্লা ; যুদ্ধের হাঁক ;
ঢাকের বাজ্না ; ভেরীর আওয়াজ ;
সুরু খাড়া বল্লমের কাজ।
ফৌজের পীঠে লম্বমান ধনুক ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণবাণ ;
বাঁশীর পোঁপোঁ, ঘণ্টার গুম্ গুম্, দলে চলে পল্টন ডুম্ ডুম্
বুড়া মা বাপ্, বেটা বেটী, সবাই দৌড়ে এসেছে ছুটি,
আছাড় হোঁচট্ খাচ্ছে তারা বালুর মেঘে দিশেহারা।
মাতা বা পত্নীরা হেথা বুকে ধরে প্রিয়ের মাথা ;
কোথাও তনু আছাড়ি ধূলাতে যায় গড়াগড়ি।
মাতার পত্নীর শিশুর ক্রন্দন উঠে ভেদি হল্লার স্পন্দন,—
মেঘলোক ভেদি স্বর্গে যায়, দেবতার কাছে বিচার চায়।

এই গেল যুদ্ধযাত্রার হুটা পুটি ও বিষাদের তরফ। দুনিয়ার যে কোন যুদ্ধযাত্রার বিবরণই এইরূপ। বিলাতেও সেদিন এই দৃশ্য দেখা গিয়াছে জার্ম্মাণি ফ্রান্সেও এই দৃশ্য দেখা গিয়াছে। এইবার তুফু যুদ্ধ-পিপাসু সম্রা-

টের কার্য্যপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিতেছেন। জার্ম্মাণেরা তাহাদের কাইসারের "কন্‌স্ক্রিপ্‌শন"-নীতি ঠিক এই ভাবেই আলোচনা করিয়া থাকে। ইংরেজেরাও পার্ল্যামেণ্ট-প্রবর্ত্তিত নূতন "কম্পাল্‌সরি মিলিটারি সার্ভিসে"র আইন ঠিক এই ভাষায়ই সমালোচনা করিতেছে। যুদ্ধের তারিফও যেমন সকল দেশে এবং সকল যুগেই এক প্রকার,—যুদ্ধের নিন্দাও সেই রূপ দুনিয়ায় একরূপ। চীনা হৃদয় হইতে সর্ব্বজনপরিচিত মানবহৃদয়ের কথাই বাহির হইয়াছে। চীনারা সৃষ্টিছাড়া লোক নয়।

তুফু লিখিয়াছেন ঃ—

"কোন্ দেশে চলিতেছে এই সব পল্টন ?"
রাস্তার পথিক এক জিজ্ঞাসে বুড়ারে ;
"সোআংহো নদীর ধারে এদের গমন—
যেথানে শুক্‌না মরু বালুর ভারে !
নিত্য নূতন এই ফৌজ-বাছাইয়ের ফলে
আমাদের প্রিয়তম ঘর ছাড়ি যায় ;
পল্টন সংগ্রহ হয় জুলুমের বলে,
হান্-মুল্লুক কমিতেছে পুরুষ সংখ্যায়।"
আবার হানের বুড়া বলে আবেগে
মমতা হেরিয়া বিদেশী পান্থের,—
"বাদশার খেয়ালে লড়াই বাতিক চাগে,
অতএব জীবন যায় নিরীহ জনের !
রক্ষার জন্য নদীপথ ফৌজ সমাবেশ ;
সীমান্তের পাহাড়ে পাহারা বসে ;
পলকে হাজার হাজার শত্রুপ্রাণ শেষ—
তাণ্ডবের আস্ফালন নিষ্ঠুর সাহসে।

রাশি রাশি পল্টন-বাছাইয়ের হুকুম
রোজ রোজ আসিতেছে রাজধানী হ'তে,
সহর পল্লী গাঁ ঝাড়ি বাদশার জুলুম
একে একে লোক সব নেয় কেড়ে লড়্‌তে।
উজাড় দেশ হায়! বহে রক্ত-দরিয়া,
কাঁপিছে সে নব নব শোণিতে;
ঠাণ্ডা উতুরে হাওয়া যায় বহিয়া
বীভৎস জমাট-বাঁধা লাল সরিতে।
গিরিপথ রক্ষণে যারা মোতায়েন,
খোলা মাঠের নদনদী যাদের জিম্মায়,—
সকলের ঘুম-স্বপ্নে জাগিয়া থাকেন
গৃহদেবতা দিতে পুলক নিশায়।
নিশার স্বপন—হরিষ বিষাদে ভরা,—
আগামী দুঃখের ভার স্বপনে থাকে!
দু চার জন ফিরিবে ঘরে অধমরা
কয়েক দিনের তরে মৃত্যুরে ডাকে।
বাদশার এক গুঁয়েমি তবু না থামে,—
স্ত্রী পুত্র পায় না খেতে, জমি চাষ-হীন;
তবু ঢিল দেয় সে বেকুবির লাগামে;
"লড়িয়া জীবন দাও" বলে নিশিদিন।
হরদম্ তলব আসে নয়া সিফাইয়ের;
লড়াইয়ের ধুম সে ত বাড়িয়া চলে;
শত্রুর অস্ত্রে গোঁ মিশিছে বাদশাহের
ধ্বংস করিতে হান্-দেশের লোকবলে।"

বুড়া দেদার বকিয়া যাইতেছে—বিদেশী পান্থ এতটা শুনুক না শুনুক। ভারতবাসী বোধ হয় এই বিষাদ বুঝিতে পারিবেন না। ইংরেজেরা এবং জার্ম্মাণেরা আজ কাল এই বিষাদ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। লড়াইয়ের ঢাক এত জোরে বাজিতেছে যে অন্য কোন আওয়াজ দুনিয়াবাসীর কানে আসিয়া ঠেকিতেছে না। কিন্তু লড়াই থামিলেই দেখিব অসংখ্য ইংরেজ ও জার্ম্মাণ এই চীনা বুড়ার মতনই আর্ত্তনাদ করিতেছে। বুড়া আরও লম্বা গলায় বলিতে থাকিল :—

"মরদহীন হ'ল দেশ ; প্রৌঢ় জুয়ান মরিয়াছে সবে ;
রহিল রমণীকুল আশাহীন নিরানন্দ ভবে।
এদিকে উৎপাৎ ত'শিলদারের খাজ্‌না আদায়ের তরে ;
ঘোড়ায় তারা দর্পে চলে ; টাকা কি জন্মে পাথরে ?
পল্টন চলিছে পল্টনের পরে যেন কুকুরের পাল ;
কত গিরি হয়ে পার, কত ঝড় কত মরু বিশাল !
হুণ তাতারের সঙ্গে যুঝা যুঝি সেথা রাত্রি দিন ;
পড়িছে মরিছে তারা সেখানে বন্ধুবান্ধব হীণ।
সংসারে আসুক কন্যা কেবল, পুরুষ জীবন দুঃখময়,
নির্জন বনে ঠাণ্ডা বাতাসে হত্যা তাহার জন্য রয়।
বিনা কবরে মরা সৈন্যের শরীর গড়াগড়ি যায়,
দল বাঁধি শকুনি উর্দ্ধে ঘুরে বিরাট ভোজের আশায়।
সৈনিকের হাড় সুদূরে পচে, ভালবাসা সেথা নাই,
প্রেতলোকে আত্মা তাদের বিচার মাগে ভগবানের ঠাঁই।"

লড়াইয়ের বিরুদ্ধে তুফু চরম কথা বলিয়া দিয়াছেন। শান্তিনিষ্ঠ স্ত্রীজাতীয় পুরুষেরা তুফুকে ওকালত নামা দিয়া রাখিতে রাজি হইবেন। বস্তুতঃ দুঃখে পড়িয়া তুর বুড়া জগৎটাকে নারীজাতির মুল্লুকে পরিণত করিতেই চাহিয়াছে।

"সংসারে আসুক কন্যা কেবল।" অবিকল এই কথা একদিন বষ্টনের এক উচ্চশিক্ষিতা নারী আমাকে বলিতেছেন। তাঁহার মতে —"পৃথিবীতে রাষ্ট্র-শাসনের ভার নারীজাতির হাতে আসিলেই দুনিয়া হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে।" তুফুর কবিতাটা নারী স্বাধীনতার পাণ্ডারা বেশ আদর করিবেন। ইংরেজ এবং জার্ম্মাণ সমাজেও এই ধরণের স্ত্রী পুরুষ অনেক আছেন।

তুফু চিত্রশিল্পে ওস্তাদ ছিলেন। চীনাদের অনেক প্রসিদ্ধ কবি চিত্র-শিল্পী। কেহ কেহ কাব্য রচনায় হাত মক্স করিবার পর চিত্ররচনায় হাত দিতেন। একাধারে কবি ও চিত্রকর ভারতে কোন প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন কি না জানি না। বিলাতে মাত্র এক জনের নাম জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি সে দিনকার লোক। গেব্রিয়েল রসেটির (১৮২৮-৮২) কথা বলিতেছি। ইনি ইতালীয় সন্তান—ইতালীয় রাষ্ট্রবিপ্লবে রসেটির পিতা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিলাত রসেটি পরিবারের "স্বদেশে" পরিণত হয়। ইতালীয় ভাবুক ম্যাট্‌সিনিও রসেটির সমসাময়িক। ইনিও বিলাতেই আড্ডা গড়িয়াছিলেন—কিন্তু বিলাতকে স্বদেশ বিবেচনা করেন নাই। রসেটি ছাড়া একাধারে কবি ও চিত্রকর ইংরেজ সমাজে আর কেহ নাই। রসেটির উভয়বিধ শিল্পের সাহায্যে মধ্যযুগের ইতালীয় কাব্য ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ইংরেজ সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ইতালীয় প্রভাবের অন্দোলন "প্রিরেফেলাইট্" আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। এই সূত্রে ইতালীয় কবিবর দান্তে (১২৬৫-১৩২১) বিলাতে সুপ্রচারিত হন। মোটের উপর এই আন্দোলনটাকে পূর্ব্ববর্ত্তী রোমান্টিক আন্দোলনের জের বলা চলে। প্রকৃতি-নিষ্ঠা দুইয়েরই ভিতরকার কথা।

আমাদের তুফুও এই হিসাবে চীনের রসেটি। অর্থাৎ রসেটিকে তুফুর গোত্রের লোক বিবচনা করিতে পারি। তুফুর সময়ে চীনের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী জীবিত ছিলেন। তাঁহার নাম উ-তাও-ট্‌জু (৭১৩-৫৫)। উ

সম্রাট্-মিঙ্হুয়াঙ্ কর্ত্তৃক লীপো এবং তুফুর মতন রাজদরবারে নিযুক্ত হন। উর সমান চিত্রকর চীনে আর কেহ জন্মেন নাই। এই কথাটা মনে রাখিলেই তাঙ্গৌরব সহজে বুঝিতে পারি। বাস্তবিকই তাঙ্যুগ "নবরত্নের" যুগ।

লীপোর "জোনাকি"তে সরল কল্পনার পরিচয় পাইয়াছি। তুফুর একটা সরল সহজ চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। কবি বৃষ্টির গান গাহিতেছেন :—

বৃষ্টি সে যে গো কল্যাণময়ী,
আমাদের অভাব বুঝে :
আসে সে বসন্তের যথা সময়ে
ফুটাতে শস্য বীজে।
রঙ্গে বিচরে পবনের সাথী,
নীরব নিশিথে সে ;
চষা মাঠে পড়ে আঁখিনীর তার,
ভূঁই হাসে সবুজ বেশে।
বিগত নিশায় মেঘে ঢাকা পথ ;
ঘরে ফিরিতে কষ্ট ;
তরীতে তরীতে মশাল জ্বালা
যেন উল্কা সুস্পষ্ট।
আজ মাটি ভেদি তাজা রঙ্ খেলে,
প্রজাপতি যায় উড়ি,
যেথা ঘাসে ভরা মাঠ,—মুক্তার হাট
যেন রাজ-বাগান জুড়ি।

বাঙ্গালীদের "বরমুখো" বলিয়া নিন্দা বা প্রশংসা শুনা যায়। চীনারাও তাই। তুফুর একটা চতুষ্পদীতে এই সোজা কথাটার সোজা বর্ণনা দেখিতেছি।

"গাল" পাখীদের শুভ্র শোভা কালো দরিয়ার অপর পারে ;
জ্বলছে যেন সুরক্তিম ফুল সবুজ পাহাড়ের গায়ে গায়ে ;
এবারও বসন্ত ঋতু কাট্‌ল হায় প্রবাস মাঝারে !
আমার সেদিন আস্‌বে কবে—যে দিন নিবে ঘরে ফিরায়ে ?

তুফু একবার নৌকা বিহারে গিয়াছিলেন। এ বিহার নিতান্ত হেসে খেলে বেড়ানো নয়। এটা বিপদের সঙ্গে লড়াই। চীনের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন স্থানে একটা পার্ব্বত্য জলাশয় আছে। ইহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। "প্রাণ" হাতে করিয়া এই "জল খেলায়" তরী ভাসাইতে হয়। এই অভিযান বিষয়ে কবিতাটার নাম "মে-পের জলরাশি" জলাশয়ের নাম "মে-পে"।

দুই বন্ধু ভ্রমে সদা নব নব বিস্ময়ের খোজে ;
সকলের জানা-পথ মামুলি দৃশ্য ছেড়ে দেয় তারা ;
একদিন তাহারা বলিল আমারে—"চল যাই বেড়াতে ;
পাড়ি দিয়ে আসি সুখে ভীমা "মে-পের বারিধারা।"
সেখানে প্রকৃতিরাণী অসংখ্য রূপে বিরাজে—
কোথা চিত্ত স্ফীত গৌরবে কোথা সঙ্কুচিত ভয়ে ;
সেখানে বিরাট শক্তি গড়ে আকাশ ধরণীর মূর্ত্তি
ক্ষুদ্র মানুষের তুচ্ছ শক্তি ডুবে যায় পঙ্গু হয়ে।
আনন্দের অভিযানে বাহিরিলাম সাহস ভরে ;
তথাপি আশঙ্কা বুকের ভিতর ঘর করিয়া বসে,—
হয়ত বা প্রকাণ্ড ঘড়িয়াল আসে শিকার ধরিতে,
তরণী বা মোদের রাক্ষস-তিমির ঝাপটায় জলে পশে ;
হয়ত বা ভীষণ পবনের বেগে তরঙ্গ উত্তাল হয় !
কিন্তু হুঁসিয়ার বন্ধুগণ দিল যোরে পাল তুলিয়া ;

হেথা হোথা হাঁস ও "গালের" সারি রাখিয়া পশ্চাতে
নৌকা চলিল ছুটি,—সাদা ফেনের দাগ জলে দিয়া।

বলা বাহুল্য এই আবেষ্টনে প্রকৃতির লাবণ্য বা সুষমা নাই—এখানে আছে গরিমা ও বিভীষিকা। চীনারা কেবল চাঁদিনী গলাইয়া পান করে না অথবা আকাশের নীলিমা ছাঁকিয়া গায়ে মাখেনা। পাহাড় গুঁড়াইয়া অঙ্গের বিভূতি তৈয়ারি করাও ইহাদের অভ্যাস, আর হাড়ভাঙ্গা তরঙ্গের সঙ্গে পাছড়া-পাছড়ি করিতেও ইহারা মজবুদ। চীনাদের শিল্পসম্পদে প্রকৃতির সকল রূপই দেখিতে পাই। বস্তুতঃ চীনা চিত্রকরের সকল প্রকার প্রকৃতি-শিল্পেই বোধ হয় জগতে অদ্বিতীয়।

কবিবর এই বার "রঙ্গে বেয়ে" যাওয়ার বিবরণ দিতেছেন :—

"বাতাস এখানে নির্ম্মল অতি শক্তি-স্বাস্থ্যকর,
সতেজে ফুস্‌ফুস্‌ উঠিছে ফুলি ;
সুদূরে ফেলে আসিয়াছি দূষিত সহর,—
যেথায় বিরাজ করে ময়লা ধূলি।
সরল পরাণ নৌকার মাঝি আনন্দে বাহে দাঁড়,
কণ্ঠে তাদের গাণ তৃপ্ত হৃদয়ের ;
তরী হতে উঠিতেছে বীণাতে তারের চাঁড়,
পাইতেছে লয় কোলে নীল আকাশের।
শোভা পায় তাজা শিশির যেমন প্রভাতী ফুলে,
নীর কমলের পাতা ভাসে চার ধার,—
যে দিকে ফিরাই আঁখি এই স্বচ্ছ জলে ;
আর বারির না পাই শেষ গভীরতার।"

রসেটির প্রি-রেফেলাইট্‌ দল এই তাজা প্রকৃতির স্বাস্থ্য সুখ খুজিতে ছিলেন। শিলার এবং বার্ণসের রোমান্টিক দলও রুষের আকাঙ্ক্ষিত

সরল জীবনের তাল্লাসে ছিলেন। আমাদের তুকুকে ইহাঁদের সকলেরই অগ্রগামী বিবেচনা করিতে পারি। ইনি তাহাদের হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোক। ভরা পালে নৌকা চলিতে লাগিল। পরের বর্ণনা এই ঃ—

প্রবল স্রোতের মুখে নৌকা ভাসে,
শীঘ্র পৌছিল কেন্দ্র সকাশে।
"পুহ্" "সাই"য়ের নীর সম জল পরিষ্কার"
"চোং-নান" গহ্বর প্রায় গভীরতা তার।
সরোবর চুমিছে পাহাড়-চরণ,
দখিন সীমায় পড়ে শিখর কিরণ।
"শান্তি মন্দির" দেখি মেঘ মণ্ডলে,
বিম্বটি তার পূর্ব্ব বাঁকের জলে।

এইবার রাত্রি কালের শোভা বিবৃত হইতেছে। গ্রহমণ্ডলের বর্ণনায় কবি চীনা পৌরাণিক গল্প পাড়িয়াছিল।

আকাশে চন্দ্রমার চমক রূপার
'লান-তিয়েন গিরিপথের ছটায় বাহার।
আমরা বসিয়া তরীর কিনারায়
পাহাড় চূড়ায় নাচ দেখি লহর দোলায়।
"লি-লঙ্" ড্রেগন দ্রুত গতি আসি
বর্ষিল জলে যেন মুক্তার রাশি।
"পিঙি" ১ দেবের ঢাক বাজিল এখন,
তা শুনি ছুটে যায় যতেক ড্রেগণ। ২

১। পিঙি চীনাদের বরুণ বা জলদেবতা।

২। ড্রেগন পাখাওয়ালা সাপ। চীনের নাগদেবতা। আকাশে থাকে। বোধ হয় মেঘের জিম্মা ইহাদের হাতে। বৈদিক ইন্দ্রদেবের বৃত্রাসুর আর চীনাদের ড্রেগন সম্ভবতঃ এক

পত্নীরা পুণ্যশ্লোক রাজা "শুনএর" ৩
অনুচর কুমারীর ৪ ছায়া পথের।
বাজনার যন্ত্রতৈরি নিরেট সোনায়,
লাল সবুজ নীল রত্নের অলঙ্কার তায়;
বাজনার তালে নেচে তারকা গায়
এই আলো এই ঘোর আকাশে ছড়ায়।

তূফু জ্যোৎস্না-ধবলিত নৈশ আকাশে নাচ গাণের আসর বসাইয়াছেন। নানা বর্ণের গ্রহ তারকায় চীনা কবিবর রূপের হাট দেখিতেছেন। কল্পনা অতি স্বাভাবিক। ভারতের পুরাণ এবং নয়া কবিরাও সকল বিশ্বেই নটরাজের খেলা দেখিয়া থাকেন—গ্রহমণ্ডলেও সঙ্গতেরই বৈঠক দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ওস্তাদেরাও আকাশের তাল মান লয় শুনিতে পান। ভারতবাসীরা তাঁহাদের পূজার "আরতির" সময়েও আকাশের আরতির তালই মনে আনেন। যথা:—

"গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডলে চমকে জ্যোতিরে।" ইত্যাদি

কবিবরের জল খেলায় ক্রমশঃ বিষাদ আসিয়া জুটিল। "হেন কালে কালো মেঘ উড়িল আকাশে!"

আকাশের শোভা অতি মনোলোভা
দেখিতেছিলাম হর্ষে;

৩। শুন্ (খৃঃ পূঃ ২২৫৮—২২০৬) চীনা "পুরাণে"র এক আদর্শ নরপতি-রামচন্দ্র-বিশেষ। ইঁহার দুই পত্নী বোধ হয় দুই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন।

৪। ছায়াপথ ("তারা-নদী") সম্বন্ধে চীনাদের এক কাহিনী আছে। ইহার দুই ধারের দুই তারাকে চীনারা প্রেমিক যুগল বলিয়া জানে। একজন গোয়ালা অপর জন তাঁতী কন্যা। দেবতার শাপে ইহারা চিরবিরহ ভোগ করিতে বাধ্য। পরস্পর পরস্পরকে সর্ব্বদা দেখিতেছে—কিন্তু ছায়াপথটা পার হইয়া একজন অপরের নিকট যাইতে অসমর্থ। কারণ এই "তারা-নদী"র উপর কোন সেতু নাই।

হায়রে অকস্মাৎ জুটিল উৎপাত
ভরিল মন বিমর্ষে!
কড়্ কড়াক্ বজ্রের ডাক
শুনা যায় অদূরে;
ভীষণ মেঘের ঘটা, বিকট বিদ্যুচ্ছটা,
ভীতি হৃদয় পূরে।
উথলি উঠিল জল ছলাক্ ছলাক্,
বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে ভূত প্রেত ঘুরে!
বিশ্বের দেবদেবী বুঝি অদূরে!
হঠাৎ একাণ্ড যে? হলাম অবাক্।
এই না জীবন মানুষের!
—ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদল দৃশ্যের!
ক্ষণিক হরিষ পরে আসিবে বিষাদ!
জোয়ার উন্মত্ত যৌবনের, সে নয় কভু চির তরের;
পূরে কি জনম দিয়ে বার্দ্ধক্যেরে বাদ?

তুফুর কাব্যে একটা পারিবারিক চিত্র পাইয়াছি :—

স্বচ্ছ নদীর ধারে আমার কুটিরখানি;
নিদাঘে প্রাণীর সেথা সাড়া শব্দ নাই,
গতিবিধি সারসের এক মাত্র পাই,
কিম্বা সমুদ্র-"গালে"র আগমন জানি।
গিন্নী করেন তৈরি "দাবা"-"কোট" কাগজে,
ছিপের বঁড়শি লৌহ তারে ছেলেরা বানায়,
অসুখ মোর সারেনা হায় বিনা ভেষজে,
তানাহলে কাঠামো রক্ষা করা দায়!

লীর মতন তুও মদিরার তারিফ করিয়া থাকেন।

বিকালের সূর্য্য আমার দুয়ারে রাজে,
ঢাকে নাই এখনো নদী সন্ধ্যা সাজে।
কিনারার বাগান হতে উঠে সুগন্ধ,
ধোঁয়া উড়ে যেখানে নাও নঙ্গর বন্ধ।
গেয়ে গেয়ে পাখিরা নীড়ে লুকালো,
লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা বায়ু মাতালো।
মদিরা, তোমায় কেবা দিল সূক্ষ্ম শক্তি?
ছোট এক গ্ল্যাসে ডুবাও হাজার বিরক্তি!

এই ধরণের আরও আছে—

মাছরাঙার বাসা সেথায় মানুষ যেথায় কর্‌ত মজা,
ক্যাওরাতলার ফটক' পরে (আজ) পাথরের ড্রেগণ ধ্বজা!
হেসে খেলে বেড়ায় যেবা সেই ত জ্ঞানী সংসারে,
বড় কাজের ঝুঁকি নিতে বেকুব ছাড়া কেবা পারে?

এই সুরের আর একটা—

ফুলে ফুলে প্রজাপতি বেড়ায় ঘুরে,
রস চোষা শেষ হলে ফড়িঙ পলায় দূরে।
সকল জীবই মেতে থাকে মজার সময়,
য'দিন পার মজা কর আর কিছু নয়।

কাব্যের দশবিশ পঞ্চাশ লাইন দেখিলেই লেখকের কল্পনার দৌড় বুঝা যায়, কবিত্ব শক্তি বুঝা যায়। ভাব গুছাইবার কায়দাও খানিকটা বুঝা যায়—কিন্তু কবির বক্তব্য বা উপদেশ বা আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা চলে না। আবার কোন কবিবিশেষের রচনাবলী দেখিয়াই একটা জাতির গোটা সাহিত্য অথবা চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করাও যুক্তি সঙ্গত নয়।

ইংরেজি "গীতাঞ্জলী" অনুসারে গোটা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবেনা। আবার রবীন্দ্রসাহিত্যই যদি গোটা বর্ত্তমান ভারতের একমাত্র সাক্ষী হয় তাহা হইলেও আমাদের সুবিচার করা হইবেনা। এসব কথা সহজেই বুঝিতে পারি। সেইরূপ চীনা মানবাত্মার বাণী বুঝিতে অগ্রসর হইয়াও সুবিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু চীনা সাহিত্যের সুবিচার এখনও সম্ভবপর নয়।

বিদেশী ভাষায় চীনা সাহিত্য অনূদিত হয় নাই বলিলেই চলে। সাহিত্য হিসাবে চীনা-সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। চীনা-সাহিত্য সম্বন্ধে বই ও আছে মাত্র দুই এক খানা। লেখকেরা মুরুব্বিয়ানা চালে কেতাব লিখিয়াছেন। তাঁহাদের ধুয়া এই-"চীনারা কবিতাও লিখিয়াছেন দেখিতেছি! তাই ত! চীনা সমাজেও কবি আছে!" ইত্যদি। চীনা সাহিত্য ইহাঁদের নিকট প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী মাত্র। এই সাহিত্যে যে শেলী শিলার হিউগো হুইটিয়ারের সমান ক্ষমতাবান্ লেখক আছেন তাহা বুঝিলেও বোধ হয় ইহাঁরা বুঝিবেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নকড়াছকড়া কবিকে লইয়া ইহাঁরা কতই না মাতা মাতি করেন। কিন্তু লীপো-তুফুকে চীনাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি জানিয়াও তাঁহাদের সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ইহাঁরা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। কেননা চীনারা প্রাচ্যজাতি—প্রাচ্যজাতির হৃদয় হইতে কত বড় কথাই বা বাহির হইতে পারে? কিন্তু প্রাচ্যেরই জাপানীর আজ ফাষ্ট ক্লাশ পাওয়ায়—এই জন্য জাপানী সাহিত্য বুঝিবার জন্য ইয়োরামিরিকায় বিশেষ আগ্রহ। অথচ সেই জাপানী সাহিত্য চীনা সাহিত্যের উচ্ছিষ্ট মাত্র।

এদিকে চীনারা নিজে এখনও "স্বদেশী আন্দোলনে" প্রবৃত্ত হয় নাই। ইহারা জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইতেছে না। সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক দুরাবস্থা অত্যধিক। এই কারণে নব্য জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য

ইহাদের তুমুল চেষ্টা। হুজুগে পড়িয়া ইহারা দেশের সনাতন সকল বস্তুরই অনাদর সুরু করিয়াছে। অথচ পাশ্চাত্য বিদ্যাও ভাল করিয়া হজম করা ইহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান পেটে পড়িবার পর ইহারা স্বদেশী চিন্তাধারার সমাদর সুরু করিবে-সে বিশয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন নব্যশিক্ষিত চীনা পণ্ডিত চীনা আদর্শের প্রচারে প্রবৃত্ত হন নাই।

ইচ্ছা করিলে জাপানীরা চীনা সাহিত্যকে বর্ত্তমান জগতের বাজারে দাড় করাইতে পারিত। জাপানী পণ্ডিত মাত্রেই চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতবাসীরা, অন্ততঃ বাঙ্গালীরা উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হইবা মাত্র কিছু কিছু সংস্কৃত আয়ত্ত করেন। জাপানী শিক্ষা পদ্ধতিতে চীনা ভাষার স্থান সেইরূপ। সুতরাং জাপানীরা চীণা আদর্শ প্রচার করিতে সমর্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এদিকে নজর দিতেছেন না। ওকাকুরার মৃত্যুর পর এশিয়ার বাণী সমগ্রতার সহিত বুঝিবার জন্য এবং প্রচার করিবার জন্য জাপানে একজনও নাই। "কোক্কা" নামক জাপানের চিত্র বিষয়ক পত্রিকায় চীনা চিত্র-শিল্পের পরিচয় পাই মাত্র।

রসের তরফ হইতে এশিয়ার সাহিত্যকে দুনিয়ার সাহিত্য সংসারে যাচাই করিবার সময় আসিতেছে। এশিয়ার সাহিত্য কেবল প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী নয়। একথা পশ্চিমারা বুঝেন না—বুঝিতে রাজিও নন। কিন্তু এসিয়াবাসীর একথা প্রচার করা আবশ্যক। মনে হইতেছে যে, এই প্রচারের ভার ভারতবাসীর ঘাড়ে পড়িবে। ভারতবাসী মুসলমানের আদর্শ হজম করিয়াছেন আর বৌদ্ধ আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই কিয়োতো-পিকিঙ্ হইতে বাগদাদ কায়রো পর্য্যন্ত সমগ্র এসিয়ার বাণী ভারতবর্ষে মজুত আছে। এদিকে চীনাদের অপেক্ষা, পারশীদের অপেক্ষা, মিশরীদের অপেক্ষা ভারতবাসীর পাশ্চাত্য দীক্ষা গভীরতর ও বিস্তৃততর। এই হিসাবে ভারতবাসী

অনেকটা জাপানীর সমান। সমগ্র দুনিয়া বুঝিবার যোগ্যতা ভারতবাসী অর্জ্জন করিয়াছেন। এই যোগ্যতা আছে বলিয়াই দুনিয়ায় এসিয়ার মূল্য স্থির করিবার ক্ষমতাও ভারতবাসীর আছে। পশ্চিমারা পাশ্চাত্য দীক্ষার চরম তত্ত্ব জানেন সন্দেহ নাই—কিন্তু গোটা প্রাচ্যকে তাঁহারা ভোগভূমি এবং কুকুর বিড়ালের দেশ বিবেচনা করেন। এইজন্য সমগ্র দুনিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। একমাত্র ভারতবাসীই বর্ত্তমান জগতে ভাব-সমগ্রতার অধিকারী—একমাত্র ভারতবাসীই সকল-মুখো দৃষ্টির সাহায্যে দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ। বিংশশতাব্দীর হতভাগ্য ভারতবাসীই জগতের একমাত্র নিরপেক্ষ বিচারক ও সমদর্শী সমালোচক। উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসিগণ চীনা ভাষা আয়ত্ত করিলে দশবৎসরের ভিতর চীণা সাহিত্যের দর কষা সুরু হইবে। তাহার পর চীনারাই স্বদেশী আন্দোলন সুরু করিবে। সেই চীনা জাগরণের প্রবর্ত্তক হইবেন ভারত সন্তান।

বহুদিন প্রবাসের পর একব্যক্তি গৃহে ফিরিয়াছেন। তুফু তাহার এক চিত্র প্রদান করিয়াছেন।

"পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে মেঘের রাশি ;
মেঘের লাল রেখা তলে সূর্য্য অস্ত যায় ;
মাঠ ঘাটে মাখা এবে গোলাপের হাসি,
খগকুল কলকলিয়ে আসিছে কুলায়।
ভ্রান্ত পথিক আসি দুয়ারে দাঁড়ালো,—
কতকাল পূর্ব্বে গেছিল ছাড়িয়া !
অজানা তখন যাহা দৈব ঘটালো—
সুদীর্ঘ বিরহ কষ্ট, আর ভাঙা হিয়া।
বাগানের বেড়া ঘেঁসে' পাড়া পড়শিরা

হাঁ করে' তাকায় স্থিরনেত্রে,কিম্বা শ্বাসে ;
আবেগে নীরব স্তব্ধ পত্নী সন্ততিরা,—
জলভরা চোখে শেষে কোলে ছুটে আসে।
"রাষ্ট্র বিপ্লবের ঢেউয়ে ভাসালো মোরে,
হা হুতাসে কাটিল দিন স্ত্রীসন্ততির,
রজনীতে যেন বা আজ স্বপ্নের ঘোরে
প্রিয়জনের সাথে রই সাম্‌নে বাতির !"

তুফুর সূক্ষ্মতম দৃষ্টিশক্তি নাই কি ? "আবেগে নীরব স্তব্ধ পত্নী সন্ততিরা।" এই কথাটা যেস্থানে যে ভাবে বসান হইয়াছে একমাত্র তাহারই জোরে বুঝা যায় যে, মানবচিত্তের নিভৃততম কন্দরেও চীনা কবির গতিবিধি ছিল। কবিতাটার কাঠামোতে উচ্চতম শিল্প-নৈপুণ্য আছে অনুবাদের অনুবাদে ভাষার গৌরব বুঝা গেলনা, কিন্তু বলিবার ভঙ্গী আন্দাজ করা গেল। আর ইহার ভাব! ঠিক যেন মানুষের হৃদয় নিজেই তাহার পরদার পর পরদা খুলিয়া দেখাইতেছে। কবিতাটা সকল দিক হইতে দুনিয়ার সেরা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

"সাহিত্য-রাজ" হান্‌-য়ের মাত্র তিনটা কবিতা ইংরেজিতে পাইতেছি। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি রাজার হুকুমে কোয়াংটুঙ্‌ প্রদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পথে নিম্নলিখিত কবিতাটা লেখা হয় ঃ—

হায়! ঋতুরাজ থাকে না আর,
বসন্তের শেষ এল এবে!
ডাঙ্গা-ঠেকা জলে মোর
তরী দাড়ায়ে ;
ভোর হয় বুনো পাখীর রবে।
মেঘ রয় ঢালু ভুঁয়ে লেগে,

তারি ভিতর উষা হাসে ;
সে হাসিতে জাগে আশা
যদিও ক্ষণেকের ;
মুক্তি চায় যে কয়েদ-পাশে।
নীরে না ভাসে আঁখি মোর,
(কিন্তু) ব্যথা বাড়ে হৃদি ভিতরে ;
(অথচ) দুঃখ বা কিসের তরে ?
চিন্তা যাবে ডুবে
ঢাক্‌নি পাবে যবে কবর।

জীবনের একটা খেয়াল নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

দাঁড়ায়ে নদীর ধারে মাছ ধরবে ইচ্ছা করে
জালটা ফেলে দিয়ে জলে।
অথবা সাধ হয় শিকার করি হংসী নিচয়
ডেকে ডেকে যারা চলে।
খাজনা আর ভূমির কর দেওয়া যাবে শিকারের পর
লাভ কিছু হ'লে।
ঘরে থাকতে চাই সুখে সদা হাসি মুখে
স্ত্রীপুত্রের দলে।
মোটা কাপড় মোটা ভাত তাতেও যায় না জাত
শরীরটা টিক্‌লেই হ'য়।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয় বলে
তাতে নিন্দা কিছু নয়।

এই ত গেল জীবনের সাধ। কিন্তু বেচারার জীবনে মহাকষ্ট শুনিতেছি :—

কি ঝক্‌মারি ; কেতাবের সারি

পড়ে' পড়ে' হদ্দ হলাম।
কিছুই বুঝি কি কেতাবে আছে কি ?
কেবল পাতা উল্টিয়ে ম'লাম।
চিত্তের উন্নতি তরে এত চেষ্টার পরে
লাভ হ'ল এই,
শরীর বেচারা যাবে শীঘ্র মারা
এ দুঃখ কারে কই ?
সাপ আঁকতে চাই ছবিতে পা কেন বসাই ?
কাজেই বরবাত শ্রমের খেলা,
এদিকে রোজ চুল আমার ধরছে সাদার বাহার
এগুই যতই পাহাড়-লীলা।[১]

এইবার তত্ত্বকথা আলোচিত হইতেছে :—

নিজের মাথায় নিজেই, ডেকে এনেছি দুঃখ
তারি মাঝে আছি রঙ্গে !
ছেড়ে পলায় সবাই, আমি আছি একাই
জীবন্ত মরাদের সঙ্গে।
মদের পেয়ালাতে চাই দুঃখ ডুবাতে
চেষ্টা সে বৃথা !
কষ্ট যাবেনা ডুবে, শীঘ্রই বেরুবে
উঠে' দুঃখের কথা।
বুড়িয়ে যাচ্ছি বেশ, (কিন্তু) দূরে এখনো জীবনের শেষ ;
অতএব এস পেয়ালা আরেক, মিটুক্ দুঃখের লেশ।

কবিতাটা ঠিক যেন আমাদের

১। সাধারণতঃ চীনারা পাহাড়ের গায়ে গোরস্থান তৈয়ারি করে।

"লিখিব পড়িব থাকিব দুঃখে,
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।"

অথবা কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহেরি কারণম্!"

অথবা "লেখা পড়া করে যে
গাড়ী চাপা পড়ে সে।"

যাহা হউক কবিতাটায় হাস্যরস কিছু আছে। বিশেষতঃ প্রথমাংশের খেয়ালটা ত একপ্রকার ভালই। অনেকেরই মনমাফিক্ কথাটা বলা হইয়াছে। অধিকন্তু স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবনের মর্ম্ম যাঁরা বুঝেন তাঁরা এইটার আদরই করিবেন। মোটের উপর, একটা হাল্কা সুরের চীনা কবিতা পাওয়া গেল। মন্দ কি?

সাহিত্যরাজ মহাশয়ে "জীবেদয়া" প্রচার করিতেছেন :—

আহা মেরো না মেরো না, বাছা, দিনের মাছিকে!
আর রেতের মশাকে ও ভাই কিবা লাভ মেরে?
নিতান্তই যদি যন্ত্রনা ভোগো তাদের গতিকে
উড়া তাদের থামাতে পার পড়দার আড়াল ক'রে।
জন্ম হতে মৃত্যু তাদের অল্পকালের লীলা,
তারি মধ্যে তোমারি মতন হৈ চৈ তাদের;
তারপর দেখ্‌তে না দেখতেই শরৎ ঋতুর বেলা
ফুরায় তাদের খেলা যেমন তোমারি জীবনের।

এই কয়লাইন পড়িতে পড়িতে মনে হইবে হান্-য়ু বোধ হয় জৈন অথবা বৌদ্ধ। চীনে এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা বহিতেছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হান্-য়ু ছিলেন যারপর নাই বৌদ্ধ বিরোধী। চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য সাহিত্যরাজ মহাশয় চূড়ান্ত চেষ্টা করেন। ৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনেশ্বরের দরবারে এক "খোলা চিঠি" ঝাড়িয়া

ছিলেন। চীনেশ্বর তখন বুদ্ধদেবের অস্থি "প্রতিষ্ঠা"র জন্য মহাসমারোহে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত। হান্-যূর চিঠি চীনা গদ্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। এইটা অত্যন্ত তীব্র ভাষায় জোরের সহিত লেখা। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"মহারাজ, নিবেদক আমি আপনার গোলাম। আমি নির্ব্বোধ কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি নিজের ইচ্ছায় হাড় প্রতিষ্ঠার ব্রতী হন নাই। এই হাড় প্রতিষ্ঠায় লাভ নাই। তাহা আপনি বেশ বুঝেন। কিন্তু দেশের লোক আগাগোড়া বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এই বুজরুক লইয়া মাতামাতি করিতেছে। আপনি প্রজাপুঞ্জের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক—এই জন্যই আপনি স্বয়ং স্থবিরেক হইয়াও এই বেকুবিতে সায় দিয়াছেন। আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রকৃতিরঞ্জন। কিন্তু জনসাধারণ এতটা তলাইয়া বুঝিবে না। তাহারা মনে করিবে যে স্বয়ং "বিশ্বপুত্র" চীনেশ্বরই তাহাদের মত খাঁটি বুদ্ধভক্ত। তখন তাহারা আহ্লাদে আটখানা হইয়া এই বুজরুকিতে আরও মাতিতে থাকিবে। তাহা হইলে চীনের পরিণাম কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? মহারাজ, দেশটা গোল্লায় যাইবে। আমি বেশ বুঝিতেছি—চীনারা সংসারের কাজকর্ম্মে ঢিল্ দিবে—কেবল বুদ্ধ, বুদ্ধের দাঁত, বুদ্ধের চুল, বুদ্ধের জুতা, বুদ্ধের মন্দির লইয়া দিন কাটাইবে। সংসারিক জীবনে তাহাদের কোন আস্থা থাকিবেনা। আজ তাহারা হাত কাটিয়া বৌদ্ধ মন্দিরে উপহার দিবে—কাল হয়ত শরীরের আর কোন অংশ দেবতার নৈবেদ্যে চড়াইতে প্রবৃত্ত হইবে। হায়, কন্‌ফিউশিয়াস-শাসিত সমাজের গৌরব আর কি কখনও দেখিতে পাইব? দুনিয়ার লোকেরা চীনাজাতিকে হাস্যাস্পদ বিবেচনা করিবে না কি? ইহা কি কম দুঃখের কথা?

"মহারাজ, বুদ্ধ আমাদের কে? সে ছিল এক বর্ব্বর (বিদেশী)। সে চীনা ভাষায় কথা কহিত না। সে ম্লেচ্ছ পোষাক পরিত। চীনের সনাতন

রীতি নীতি সে সম্মান করিত না—আমাদের পূর্ব্ব রাজর্ষিদিগের প্রচারিত সূত্রও সে কণ্ঠস্থ করে নাই। সে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ বুঝিত না—রাজা ও মন্ত্রীর সম্বন্ধও বুঝিত না। ধরা যাউক যেন এই ম্লেচ্ছ বর্ব্বর তাহার স্বদেশীয় রাজার হুকুমে চীনের রাজধানীতে সশরীরে উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হইলে আপনি তাহার স্বদেশের রাজার গৌরব অনুসারে বুদ্ধকে সম্মান দেখাইতেন। তাহার পর কাজ শেষ হইয়া গেলে তাহাকে চীনের বাহির করিয়া দিবারও ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু আজ কি দেখিতেছি? একটা হাড়কে অভিবাদন করিবার জন্য বিপুল সমারোহ! যে হাড়ওয়ালা লোক শত শত বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া পচিয়া গিয়াছে! আর সেই সমারোহ ও রাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তরে! মহারাজ, আপনার কর্ম্মচারীরা কেহই আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। আমি তাহাদের চরিত্রে লজ্জা বোধ করিতেছি। যাহা হউক, আমার প্রার্থনা আপনি হাড়গুলি এখনই জলে অথবা আগুনে নষ্ট করিয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করুন। চীন হইতে বালাই চিরকালের জন্য দূর হউক। আর যদি ভগবান্ বুদ্ধ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করেন অথবা ক্ষমতা রাখেন, আসুন তিনি আমার সর্ব্বনাশ করুন। আমি মাথা পাতিয়া দিতেছি বুদ্ধের একতিয়ার থাকে তিনি আমার যথোচিত শাস্তি দিন। আমি "বিশ্বদেবকে" সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি সেই শাস্তিতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইব না।"

হান্-য়ুর আস্পর্দ্ধা দেখিয়া সম্রাট্ শিয়েন্-চুঙ্ চটিয়া গেলেন। সাহিত্য-রাজকে বনবাসে পাঠান হইল। তখনকার দিনে চীনের দক্ষিণ অঞ্চল অনেকটা পাড়াগাঁ, মফঃস্বল বা বনজঙ্গলই ছিল। কোয়াং-টুঙ্ প্রদেশে হান্ নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঙ্ আমলে চীনে বৌদ্ধ আন্দোলনের ভরা জোয়ার চলিতেছে—হানের তীব্র প্রতিবাদ তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

হ্যানের সময়ে চীনা বৌদ্ধ ধর্ম্ম আটশত বৎসরের জিনিষ। অধিকন্তু যুয়ান্ চুয়াঙ্ দিগ্‌বিজয়ী তাঙ নেপোলিয়ান তাই-চুঙের আমলে (৬২৭-৬৫০) ভারত হইতে চীনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাজেই লীপো, তুফু ইত্যাদি কবিগণ, এবং উ-তাও-টজু প্রমুখ চিত্রকরগণ এবং মিঙ্-হুয়াঙের ন্যায় বিদ্যা "সংরক্ষক" বিক্রমাদিত্যগণ ভারতীয় প্লাবনে হাবুডুবু খাইতে ছিলেন। এই হিসাবে ভারতীয় বিক্রমাদিত্যের নবরত্নগণ চীনা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন দিগের পূর্ব্ব পুরুষ। চীনা কালিদাসের বৃত্তান্ত বুঝিবার জন্য ভারতীয় কালিদাসের বংশধর দিগের খোজ লইতে হইবে। চীনের তাঙ-গৌরবকে আমরা অনেকাংশে ভারতীয় গুপ্ত-গৌরবের পরিশিষ্ট বিবেচনা করিতে পারি। হোআংহো ইয়াংসি কিয়াংঙের বারিতে সিন্ধুগঙ্গার জল আসিয়া মিশিয়াছে। সিন্ধুগঙ্গার জলকে চীনারা "বৌদ্ধ" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই "বৌদ্ধ" শব্দ ভারতবর্ষের প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। চীনাদের হিসাবে ভারতের আয়ুর্ব্বেদও বৌদ্ধ, সুকুমার শিল্পও বৌদ্ধ, নাট্য কলাও বৌদ্ধ, কুস্তী কছরতও বৌদ্ধ, নাচগানও বৌদ্ধ, আর ধর্ম্ম কর্ম্মত বৌদ্ধ বটেই।

এই কথা গুলি মনে রাখিয়া লীপো তুফুর কাব্য ঘাঁটিলে ভারতবাসী নূতন আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এসব কথা মনে না রাখিলে ও ক্ষতি নাই। সাহিত্যরসিক মাত্রেই চীনা কাব্যে তাজা জীবনের সরস উচ্ছ্বাস পাইয়া পুলকিত হইবেন। শিলার, হিউগো, রসেটি ও হুইট্‌ম্যান যদি ভারতবাসির শ্রদ্ধাযোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন, তাহা হইলে লীপোর জুড়িদারেরাও হইবেন না কেন?

পো-চূইয়ের "বীণাওয়ালী"।

কোন চীনা সমালোচক একটা কবিতার নিম্নলিখিত তারিফ করিয়াছেন:—"রচনার ভাষা দেখিয়া মনে হয় যেন ভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। এই কবিতায় পাঠকের হৃদয় এক বিচিত্র পুলকে ভরিয়া উঠে। সেই আবেগ স্বর্গীয়—তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। বৌদ্ধদের সুপরিচিত 'সমাধি'র সঙ্গে সেই মনোভাবের তুলনা করা চলে। এইরূপ কবিতা হাজার বৎসরে একটা লেখা হয়।"

এই "লাখে হাজারে একটা" কবিতার নাম "বীণাওয়ালী"। কবির নাম পো-চূই (৭৭২-৮৪৬)। ইনি হার্ন্-য়ূর সময়কার লোক। চীনে কবিরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত—এবং সকলেই প্রায় বড় চাকুরে। আর সময়ের ফেরাফারে অনেকের কপালেই দুই একবার করিয়া নির্ব্বাসন বা বনবাস ঘটে। পোও মফঃস্বলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সিয়াং-শান্ নামক স্থানে পো অড্ডা গাড়েন। এইখানে আর আটজন কবির সঙ্গে তিনি বেনামী জীবনযাপন করিবার সুযোগ পান। লীর "ছয় ইয়ারের" মতন পোর "সিয়াং-শানের নয় বুড়ো" চীনা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বনবাসে যাইবার পথে পো এক গৃহে অতিথি হন। সেখান হইতে পুনরায় যাত্রা করিতেছেন এমন সময়ে নৌকায় বসিয়া বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন। এই ঘটনাটা চীনা কাব্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। জাইল্‌স্ এই কবিতার বিবরণ দিয়াছেন গদ্যে, ক্র্যান্মারবিঙ দিয়াছেন পদ্যে। কিন্তু এই বিবরণে খাঁটি চীনা কথা কতখানি আছে আর ইংরেজীর ফোঁড়ন কতখানি আছে তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন।

অনুবাদমাত্রেই মূলের ঝাড়াবাছা ও কাটাছাঁটা আবশ্যক হয়। কবি হয়ত এক প্রকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—অনুবাদক হয়ত আর এক

রূপক ব্যবহার করিলেন। অথবা কবি হয়ত কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করেনই নাই ; কিন্তু অনুবাদক তাঁহার ভাষাভাষিগণের পক্ষে বিদেশী কথা-গুলি সহজবোধ্য করিবার জন্য দুই চারিটা নূতন শব্দ বসাইয়া দিলেন। এই রূপে বিদেশী মাল স্বদেশী দ্রব্যে পরিণত হয়। সকল অনুবাদ সাহিত্যই এই ধরণের "শোধন করা" জিনিষ—স্বদেশী ছাঁচে ঢালাই করা বিদেশী মাল অর্থাৎ "অ্যাডাপ্টেশন"। আমি চীনা কবিতার ইংরেজি অ্যাডাপ্টেশন পড়িয়া তাহার আবার বাঙ্গালা অ্যাডাপ্টেশন করিতেছি। সুতরাং পো-চূইয়ের আত্মার পিণ্ড চট্‌কান হইতেছে বলিতে বাধ্য। তবে চীনা হৃদয়ের তারে তারে বীণার তারের মতনই সূক্ষ্ম গভীর সকল প্রকার ঝঙ্কার উঠে—অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিব। পো গাহিতেছেন :—

আসিলাম রজনীতে নদীর ধারে
মেপ্‌ল্ তরুর তলায় ;
ফুলের মতন তার পাতা লাল বরণ
শরতে একলা গজায়।
হল শেষ এবে বিদায় বচন,
বসিলাম নৌকাপরে ;
নেমে গেল বন্ধু, সব নীরব নিঝুম,
ঠাণ্ডা জোৎস্না নদী-বক্ষ ভরে।
বীণা সেতারের তারে নাইক ধ্বনি,
মদিরায় আনন্দ হিয়ার ;
বন্ধু ফিরে যায় ঘরে ; হঠাৎ কানে
ঝঙ্কার প্রবেশিল বীণার।
থমকিল বন্ধু, অতিথি অচল
কোথা হ'তে আসে তান ?

জনহীন দরিয়ায় কেবা বাজায় বীণ ?
বুঝি প্রকৃতির গান ?
কাছে আসিল ভাসি তরী এক খানা,
নীরব তাহার ভিতর,
সলজ্জ রমণী এক সওয়ারি তাহার,
মাত্র বীণা সহচর।
বলা হ'ল তারে অসিয়া এ দলে
বীণার শুনাতে গান ;
ভরা পেয়ালায় বাতির আলোয়
গুল্‌জার আবার উৎসবের স্থান।
বহু সাধা সাধির পর অপরিচিতা
ছাড়িল সে নিজ তরী ;
বীণায় ঢাকিয়া মুখ দাড়ায়ে আসরে
উপরোধ রক্ষা করি'।
এইবার তারে হাতের আঙ্গুল পড়িল—
একবার দুইবার তিনবার
তারেতে আঙ্গুল তার
চাঁড়া দিল কাঁপিয়া ;
বীণাতে আওয়াজ হায়
উঠিল না ধ্বনিয়া !
তারপর সুরু হল হৃদয়ের গান,
সে গানে শুনিলাম বিষাদের তান ;
দ্রুত অঙ্গুলিতে সে মাথা নোয়াইয়া
আশাহীন ভাঙ্গা পরাণের ব্যথা—গেল যেন গাহিয়া।

এই মৃদু এই ধীর
গতি অঙ্গুলির ;
বিচিত্র স্বরের খেলা
লঘু গম্ভীর।
উচ্চ ধ্বনিতে শুনি ঝম্ ঝম্ বরষার স্বর ;
কানে কানে কথা প্রায় কোমল খাদের ;
চড়া-নরম এক সঙ্গে যেন মুক্তার মর্ম্মর
পাথরের রেকাবিতে পতন-কালের।
কভু সে দেয় সুর তরল ঢালি
ঝোঁপে যেন পাখীর কাকলী ;
ধীরে তাহা যায় নামিয়া
নদী সম নীচু দিকে বহিয়া
তারপর থামিল বীণা একবার,
চরম আবেগভরে স্তব্ধ অন্তর ;
বরফের আলিঙ্গনে প্রিয় দরিয়ার
নিষ্পন্দ জমাট যেরূপ হৃৎকন্দর।
আবার পড়িল আঙ্গুল বীণার তারে ;—
ঘোড় সওয়ারের বর্ম্মের ধ্বনি
ঠেকিল শত্রুর অস্ত্রে ;
অথবা আওয়াজ ছিঁড়িবার যেমন
শুনায় রেশমী বস্ত্রে ;
কিম্বা কলসী ভাঙ্গিলে
জল গড়ায় যে শব্দে।
শুনিলাম সে সব তান শেষ ঝঙ্কারে।

এই গেল বীণাওয়ালীর গুণপনার বর্ণনা।
তারপর সে আত্মকাহিনী বলিতে লাগিল—

বিরাজিল নীরবতা ;
স্থির রহিল মুগ্ধ পবন ;
স্রোতস্বতীর বুকে ঢালে
শরতের চাঁদ রজত কিরণ।
দীর্ঘ শ্বাসিল রমণী, কহিল বিদায়ের পূর্ব্বে :—
"রাজধানীতে পাহাড়ের কোলে
শৈশব কাটে মোর গর্ব্বে।
তের বছর বয়স কালেই আমার
গানের বাজনার গৌরব
ছড়িয়ে দিল সহরের মাঝে
ওস্তাদ কীর্ত্তির সৌরভ।
রূপসীরা সবে হিংসায়
মরে দেখিয়া আমার মুখ,
যুবকের দলে আড়া আড়ি চলে
বাড়াতে আমার সুখ।
ছোট এক গানে লভিতাম
কত অমূল্য উপহার—
মদিরা-সিক্ত লাল রেশমী ঘাঘ্‌রা
আর সোনার অলঙ্কার,
কিম্বা রূপার "পিন্" ঘন ঘন
"বাহবা"র ধ্বনি সহ ;
বসন্তে শরতে ঐরূপ
হাসি খেলা অহরহ।

এই জীবনের তুলনা—

"আমার কুসুম কোমল হৃদয়
সহেনি কখনো রবির কর,
আমার মনের কামিনী
পাপ্‌ড়ি সহেনি ভ্রমর চরণভর,
চিরদিন সখী হাসিত খেলিত,
জ্যোছনা আলোকে নয়ন মেলিত।" ইত্যাদি।

তাহার পর কিরূপ হইবার কথা?—

"সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি!"

পো-চুইয়ের বীণাওয়ালীও "প্রভাত কিরণে"র খেলাধূলার পর সহসা চেতনা পাইতেছেন। এই চেতনা কিছু অন্য রকমের।

ভাই গেল কান্সু
প্রদেশের যুদ্ধে;
মৃত্যু হ'ল মাতার;
রাত যায় দিন আসে,
দিন যায় রাত;
লাবণ্য মোর টিকে না আর।
লোকের ভিড় নাই আমার দুয়ারে,
থাকিল দু এক জন;
পতিত্বে বরিলাম ব্যবসাদারে;
ধনাগমে তার মন।

হৃদয়ের পিপাসা নাই তাহার,
না বুঝে সে বিরহ ;
ফেলে' মোরে চা কিনিতে
স্বচ্ছন্দে ছাড়িল গৃহ।
একাকিনী দশমাস ক্ষুদ্র তরী
বাহি রাত্রিকালে ;
সুখের স্মৃতি আর আঁখি ভরা জল
বুঝি মোর কপালে !

এই বৃত্তান্তে বিষাদটা ঘনাইয়া উঠে নাই বলিতে হইবে। "ফেলে মোরে চা কিনিতে স্বচ্ছন্দে ছাড়িল গৃহ"—এই তথ্যের উপর হাহুতাস খানিকটা হাস্যাস্পদ হইবারই কথা। কাজেই ঘোরতর "ট্রাজেডির" "ভাঙ্গা হৃদয়" "বীণাওয়ালী"তে পাইলাম না। যাহা হউক নির্ব্বাসিত কবিবর বিরহিণীর দুঃখে নিজ দুঃখেরই চিত্র দেখিতে পাইতেছেন।

বীণার করুণ তানে
হৃদয় আমার
গিয়াছিল গলিয়া।
ব্যথিত পরাণের
এই মরম কথায়
ছিঁড়ে গেল যেন হিয়া।
বলিলাম তারে "বাছা,
কপাল দুজনারই এক ;
দুর্ভাগ্যেতে বন্ধু মোরা !
রাজধানী ছেড়ে গতবর্ষে
পৌঁছিলাম এ দেশে জর গায়ে আত্মহারা।

এ মুলুক শ্মশান প্রায়,
বীণা স্বেতারের ধ্বনি
হেথা কেহ না পায় শুনিতে।
জঙ্গলা নদী কিনারায়
বেঁড়ে বাঁশ ও লম্বানলের সারি ;
তারি মাঝে হইতেছে জীবন যাপিতে।
দিনে বা নিশায়
সাড়া শব্দ নাই হায় !
মাত্র এক বিকট ডাক
নৈশ চিঁড়িয়ার,
অথবা হাহাকার
অলক্ষী পেঁচার।
অথবা শুনিতে পাই
পাহাড়ী সঙ্গীত,
পাড়াগেঁয়ে বংশীধ্বনি
বেসুর বেতাল।
আজ কতদিন পরে
শুনি বীণার আলাপ
ভাবিতেছি স্বর্গে যেন
কেটে গেল কাল।
অতএব কৃপা করি
বস একবার,
আরেক খানা গেয়ে দাও,
লিখে যাই কাহিনী তোমার।

পো-চূই নিতান্ত বেরসিক দেখিতেছি! ঘোড়া বা ফড়িং সাম্‌নে রাখিয়া চিত্রকরেরা ছবি আঁকায় হাতে খড়ি দেয়। পো-চূই বীণাওয়ালীর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতেই তাঁহার কাহিনী লিখিয়া রাখিতে চাহিতেছেন! গল্প হিসাবে রচনাটা জমাট বাঁধিল না। বিরহিনীর দুঃখ আর নির্ব্বাসিতের দুঃখ হয়ত ওজনে সমান। কিন্তু পো এই সমতা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। গল্পের ভিতর বিরহের দুঃখও ভারী করিয়া তোলা হয় নাই—আর বনবাসের দুঃখও ভারী করিয়া তোলা হয় নাই। ঠিক যেন যশোহরের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালী হুঁকা হাতে দুঃখ করিতেছেন—"আরে! কি বলিব দুঃখের কথা। পনর মাস ধরে জ্বরিয়ে মরছি হাতে পয়সা নাই যে ওষুধের ব্যবস্থা করি। যাক্ দেখ্‌ছি তোমার কষ্টও আমারই মতন। তোমার গরুটা আজ খোয়াড়ে আটক্। বড়ই আপশোষের কথা। আমাদের ব্যথা আমরা ছাড়া আর কেহ বুঝবে না।" পোর গল্পে শিল্প নৈপুণ্য নাই—আট্‌পৌরে জীবনের কথা সাদাসিধা ভাবে বলা হইয়াছে। মামুলি কথা লইয়া অতি উচ্চ অঙ্গের কায়দা দেখান আছে গ্যে'টের "হার্ম্যান ও ডরোথিয়া"য়। তাহার তুলনায় "বীণাওয়ালী"তে পো ফেল মারিয়াছেন বলিতে হইবে। তবে বীণাধ্বনির বর্ণনাটা মূলে নিশ্চয়ই "লাখে হাজারে এক।" অনুবাদের অনুবাদে "সমাধি" উপভোগ করা অসম্ভব। গল্পাংশের কথা ছাড়িয়া দিলে কবিতাটা সত্য সত্যই উঁচু দরের। জীবনের একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা সরসভাবে ফলাইয়া লেখা হইয়াছে। বস্তুতঃ এটা গল্পের কবিতা নয়, নানা দৃশ্যের ভিতর দিয়া কবি তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি দেখাইয়াছেন। সেই প্রীতি স্পষ্টই ফুটিয়াছে।

এতক্ষণ রমণী
দাঁড়ায়ে ছিল।
অনুরোধে এইবার
বসে' গায়িল।

এ আওয়াজ ভরা
কেবল করুণ কোমলে,
তা শুনি সকলের
আঁখি গলিল
আমার বুকও ভিজিল জলে।

চীনা জাতি খুব সঙ্গীত প্রিয়। ইহাদের সাহিত্যে গান বাজনার তারিফ অনেক দেখা যায়। আর মাছ ধরা, শিকার করা, নদীর কিনারায় আড্ডা গাড়া ইত্যাদিও চীনাদের অতি প্রিয় কার্য্য। কিন্তু বোধ হয় নাচের আদর কিছু কম।

নির্ব্বাসন হইতে ফিরিবার পর পো রাজদরবারে বড় বড় চাকুরি পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমরবিভাগের সচিব হন। কাব্যে হানয়ূ অপেক্ষা পো বড়। সুতরাং লী ও তুর সঙ্গে পোকেই "ত্রিবীরে"র দলে ফেলা যুক্তি সঙ্গত। পো তাঙ্ আমলের এক শ্রেষ্ঠ কবি। "বীণাওয়ালী"র মতন তাঁহার আরও অনেক নাম জাদা কবিতা আছে। সর্ব্বপ্রসিদ্ধ রচনার বিষয় মিং হুয়াঙ ও তাইচেনের প্রেম। এই বিষাদাত্মকে প্রেমের কাহিনী চীনা সাহিত্যের "শকুন্তলা"।

৬১৮ হইতে ৯০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাঙ্ বংশের রাজত্ব কাল। এই তিনশত বৎসরের ভিতর যত কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৪৮৯০০টা সংগৃহীত আছে। এইগুলি ৯০০ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত।

চীনা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন্ চীনা সমজদারের মত নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

"শি-কিঙে (খৃঃ পূঃ ৫০০) সঙ্কলিত তিনশত গীত সাহিত্য-বৃক্ষের শিকড় স্বরূপ। এইগুলি কন্‌ফিউশিয়াসের সংগ্রহ। সু-উ এবং লী-লিঙের কবিতা "বৃক্ষকাণ্ডে"র প্রাথমিক অবস্থা। ইহাঁরা দুইজন এক সময়ের লোক

—হান্‌ আমলের প্রথম অর্দ্ধে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইহাঁদের কাল। হান্‌ আমলের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বিশেষতঃ কিয়েনএনের রাজত্ব কালে (১৯৬ খৃঃ অঃ) কাণ্ডটা বাড়িতে থাকে। এই সময়ে কয়েকজন নামজাদা লেখকের আবির্ভাব হয়। ২২০ হইতে ৫৮৭ পর্য্যন্ত ছয় রাজ-বংশের আমল। এই সময়ে চীনা কাব্যতরুর শাখা প্রশাখা জন্মে এবং পাতা গজাইয়া উঠে। অবশেষে তাঙ্‌ আমলে শাখা প্রশাখা এবং পত্রের সমধিক বিকাশ হয়। অধিকন্তু ফুল ও ফল এই যুগের উৎপত্তি। অর্থাৎ সাহিত্যতরু এই সময়ে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।" চীনাকাব্য আলোচনা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন "পুরাণা শি-কিঙ্‌ বাদ দিও না। তাহা হইলে চীনা সাহিত্যের গোড়ার কথা বুঝিতে পারিবে না। আর গোড়ার রস না পাইলে ডালপালা ফুল ফলের গৌরব উপভোগ করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ চীনের কালিদাস-ভবভূতির সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে চীনা বেদব্যাস ও মনুর বচনগুলিও কাছে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ "শি-কিঙে" অনেক সরস কবিতা পাওয়া যায়। সেগুলি তুচ্ছ করা চলে না।

কবিবর তু ছিলেন একাধারে চিত্রকর ও কবি—কিন্তু তাঁহার নাম
বেশী কাব্যে। তাঁহারই সময়ে ওয়াঙ্-ওয়ে (৬৯৯-৭৫৯) নামক আর
একজন একাধারে চিত্রকর ও কবি চীনে প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু ওয়াঙের
নাম বেশী চিত্রশিল্পে। এই ওয়াঙ্ সম্বন্ধে চীনা সমজদারেরা বলিয়াছেন—
"ইহাঁর চিত্রগুলি ঠিক যেন কবিতা, আর কবিতাগুলি ঠিক যেন চিত্র"।
কবিতাকে চিত্র বলা এবং চিত্রকে কবিতা বলা বর্ত্তমান যুগে বিশেষ
একটা বাহাদুরীর কথা নয়। পুরাণা আমলে ও দুনিয়ার নানা স্থানে এই
ধরণের মতই প্রকাশিত হইয়াছে। মতটা নিতান্তই সহজ ও স্বাভাবিক।
কাজেই চীনাদের সমালোচনা রীতিকে চীনাদের খাস আবিষ্কার বলা
চলে না—অথবা একটা সৃষ্টি ছাড়া চীনা মুল্লুকের বস্তুরূপে অবজ্ঞা করা
চলে না। চীনা সমালোচকদিগের মাথায় যে ধরণের কথা বাহির হইয়াছে,
জার্ম্মাণ সমালোচকদিগের মাথায়ও সেই ধরণের কথাই বাহির হইতে পারে,
বাঙ্গালী সমালোচকদিগের মাথায়ও সেই ধরণের কথাই বাহির হইতে পারে,
আর ইংরেজ সমালোচকদিগের মাথায়ও সেই ধরণের কথাই বাহির হইতে
পারে। প্রাচ্যদেশের লোকেরা এক নিয়মে সমালোচনা করে, আর পাশ্চাত্য
দেশের লোকেরা অন্য নিয়মে সমালোচনা করে—সমালোচনার আসরে
এরূপ "জাতি"ভেদ করা অসম্ভব।

কেবল সমালোচনা কেন? মৌলিক কাব্য রচনার কথাই ধরা যাউক।
কাব্যের আসরেও প্রাচ্য পাশ্চাত্য, হিন্দু খৃষ্টান, মুসলমান ইহুদি তফাৎ
করা অসম্ভব। হিন্দু সাহিত্যে খাঁটি স্বদেশী হিন্দুত্ব কিছুই নাই—আবার
জার্ম্মাণ সাহিত্যেও খাঁটি জার্ম্মাণ আদর্শ কিছুই নাই। মানবচিত্ত দুনিয়ার

সর্ব্বত্র একইরূপে দেখা দিয়াছে। বাহিরের উত্তেজনায় কিম্বা ভিতরকার উন্মাদনায় মানুষের প্রাণ জার্ম্মাণ ভাবে সাড়া দেয় না অথবা বাঙ্গালী ভাবে সাড়া দেয় না অথবা খৃষ্টান ভাবে সাড়া দেয় না অথবা জাপানী ভাবে সাড়া দেয় না—সাড়া দেয় রক্তমাংসের শরীরওয়ালা মানুষের প্রাণ ভাবে। এই পর্য্যন্ত চীনা কাব্যের প্রায় ছয় শত লাইন দেখা হইল। অতি সামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এইটুকুর ভিতরেই চীনের হৃদয় অনেক দিক হইতে দেখা দিয়াছে। সেই হৃদয়ে খাঁটি চীনা বস্তু কিছু পাইয়াছি কি? জার্ম্মাণ হৃদয় হইতে, বাঙ্গালী হৃদয় হইতে, ইংরেজ হৃদয় হইতে এই হৃদয় কোন বিষয়ে পৃথক? লী, তু, হান্, পো, ইঁহারা যে সকল ভাবে মাতিয়াছেন সে গুলি কি চীনের স্বদেশী? সেগুলি কি কন্‌ফিউশিয়ানদিগের স্বধর্ম্মের একচেটিয়া? বৌদ্ধধর্ম্মের একচেটিয়া? তাওধর্ম্মের একচেটিয়া? হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টান ঠিক এই সকল ভাবে মাতে নাই কি? তাহা হইলে হিন্দুত্বের বিশেষত্ব, জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরের" বিশেষত্ব, প্রাচ্য সভ্যতার বিশেষত্ব, ইয়োরোপীয় আদর্শের বিশেষত্ব—এই ধরণের বিশেষত্বগুলি মিথ্যা, মনগড়া ও অলীক। জগতের মানুষ এবং মানবের হৃদয় এক। হাসিকান্না, নাচাগাওয়া, হিংসাভালবাসা, গৌরব অগৌরব, ছুনিয়ার সর্ব্বত্র একরূপ। এই কারণে হোমারও হিন্দু—বাল্মীকিও গ্রীক। কালিদাসও জার্ম্মাণ, গ্যেটেও হিন্দু, রবীন্দ্রনাথও পশ্চিমা, হুইটম্যানও পূরবী।

চীনাদের প্রেম-সাহিত্যের দুই একটা নমুনা পাইয়াছি। দেখিলেই যে কোন লোক বুঝিবেন, চীনা প্রেমে আর জার্ম্মাণ প্রেমে কোন তফাৎ নাই। গ্যে'টের প্রেমে আর হিন্দুর প্রেমে কোন তফাৎ নাই। ইয়োরোপের সেরা প্রেম-কবিরা জন্মিয়াছেন মধ্যযুগের ইতালীতে। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবির নাম দান্তে। সেই দান্তের প্রেয়সী ছিলেন বিয়েট্রিস। ইয়োরোপের

বিয়েট্রিস আমাদের রাধা। আদি বা শৃঙ্গার রসের তরফ হইতেও এই কথা বলা চলে। আবার আধ্যাত্মিক ভক্তিরসের তরফ হইতেও এই কথা বলা চলে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রেম একই রূপে দেখা দিয়াছে। কাজেই চীনা প্রেমিকদিগের উচ্ছ্বাসে সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট কল্পনা পাইব না। পেট্রার্ক, বিদ্যাপতি, শেক্স্পীয়ার, গ্যে'টে, লামার্তিন, রসেটি ও হুইট্‌ম্যানের ভাবুকতাই চীনা প্রেম-সাহিত্যের উৎস।

জমিদারে জমিদারে বা "ব্যারণে" "ব্যারণে" লাঠালাঠি সকল দেশেরই পুরাণা ইতিহাসের প্রধান কথা। বংশ গৌরব, "ক্ল্যান"-গৌরব, পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব, কৌলীন্য ইত্যাদির বড়াই ঐ সকল লাঠালাঠির গোড়ায় থাকিত। আমাদের রাজস্থানের কাহিনী এই সকল কথায় ভরা। ইয়োরোপের মধ্যযুগটাও এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই ধরণের "রাজপুত কাহিনী"তে ভরা। এই ব্যারণ শাসিত ক্ল্যান সমাজের কবিদিগের নাম ভাট, চারণ, মিন্‌ষ্ট্রেল, মিনেসিঙ্গার, ক্রবেয়ার ইত্যাদি। ইহাঁদের সাহিত্যে পাওয়া যায় সেই লাঠালাঠি, দলাদলি এবং গোত্রমর্য্যাদার কথা। লাঠালাঠি কেবল রাজ্যের সীমানা বাড়াইবার জন্যই বাধিত না। আজ মন্দিরের কথা লইয়া, কাল হয়ত সভাকবির সম্মান লইয়া, পরশু হয়ত কন্যার বিবাহের কথা লইয়া ক্ল্যানে ক্ল্যানে তুমুল লঙ্কাকাণ্ড সুরু হইত। ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের কাহিনী ইংরেজ সাহিত্যবীর স্কটের গদ্যে ও পদ্যে চিরস্থায়ী হইয়াছে।

চীনেও এই ধরণের লাঠালাঠির যুগ ছিল। সে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কথা। তখন চীন কোন সময়ে শতাধিক, কোন সময়ে অর্দ্ধশত ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তখনকার চীনা সমাজ আমাদের চারণ বর্ণিত রাজপুত সমাজ অথবা স্কট্-বর্ণিত ফিউড্যাল সমাজেরই জুড়িদার ছিল। সেই চীনা সমাজেও বিবাহ লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত।

অর্থাৎ প্রেমের অবাধ গতি ছিল না। যে কোন বংশের পুরুষ যে কোন বংশের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত না। ক্ল্যানের গৌরব এবং ভূত-ভবিষ্যৎ বিবেচনা করার পর স্ত্রীপুরুষের প্রেম অথবা বিবাহ বন্ধন মঞ্জুর করা হইত। বলা বাহুল্য হয়ত দুই বংশে রাষ্ট্রীয় আড়া আড়ি তুমুল ভাবে চলিতেছে—কিন্তু ঘটনাচক্রে এই দুই বংশের মধ্যে কোন যুবক কোন যুবতীর প্রেমে পড়িয়া গেলেন। এরূপ ঘটনা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রেম মঞ্জুর করা কখনই হইত না। কাজেই বিষাদ, আত্মহত্যা, গুপ্তবিবাহ, পলায়ন, অথবা শুকাইয়া মরা অর্থাৎ ট্র্যাজেডির নানা অভিব্যক্তি। প্রেমের লড়াইয়েই "হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয় গর্ব্বে বাপ্পা বীর।" আমাদের রাজস্থানেও এইরূপ প্রেম বিভ্রাটের ট্র্যাজেডি অনেক ঘটিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ারের "রোমিও এবং জুলিয়েট"ও এই প্রেম বিভ্রাটেরই চিত্র আর স্কটের "টিল্ প্রাইড্ বি কোয়েল্‌ড্ অ্যাণ্ড লাভ বি ফ্রী" সূত্রও এই ট্র্যাজেডিরই পরিচয়।

"বংশ মর্য্যাদার বালাই যাক্ রসাতলে
ভালবাসা বাধা হীন থাকুক্ ভূতলে।"—

এই সূত্রটা স্কটও প্রচার করিয়াছেন, শেক্‌স্‌পীয়ারও প্রচার করিয়াছেন, মধ্যযুগের চারণ মিনেসিঙ্গারেরাও প্রচার করিয়াছেন—আর চীনারাও প্রচার করিয়াছেন।

উ দেশের রাজকুমারীর নাম ৎ-জে-য়ু। তাঁহার সঙ্গে হান্-চঙের প্রণয় জন্মে। বংশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রণয়ে বিরোধ ঘটিল—বিবাহ হইল না। হান্ প্রবাসী হইলেন—কুমারী তিনবৎসর বিরহের পর মারা গেলেন। কুমারীর কবরের নিকট হান্ একদিন উপস্থিত। সেই সময়ে কুমারী প্রেত মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। সেই প্রেতের কথা হান্ কবিতায় লিখিয়াছেন।

দখিনের পাখী দেয় না ধরা উতুরের জালে ;
চিরন্তন বিরোধ সেরূপ তোমার আমার কুলে।
তোমার আমার ভালবাসার সাহস প্রচুর ;
কর্ত্তারা কর্‌ত না কিন্তু বিয়ে মঞ্জুর !
তোমার সাথে ঘুরিতাম আমি অবাধে ;
কুচুটে লোকের নিন্দা বাধা দিল সাধে।
(কিন্তু) পরনিন্দা লোকের স্বভাব ; ভয় কিবা তায়
বস্তুতঃ দুর্ভাগ্যই মোদের অন্তরায়।
দীর্ঘ বছর তিনেক কাঁদিনু তোমার তরে
"ফীনিক্‌সিনী" কাঁদে যেমন হারায়ে দোসরে।
মরণ পাইয়া করিলাম শোকাশ্রুর শেষ ;
তোমা ছাড়া ভাবি নাই অন্যেরে প্রাণেশ।
কাঁদিছ দাঁড়ায়ে আমার কবর পাশে
আমার প্রেত তাই আসিল তব সকাশে।
মুহূর্ত্তের তরে তোমার মুখ দেখ্‌তে ধরায়
ভূতের রাজ্য ছেড়ে আস্‌বার হুকুম আমায়।
হায় ! শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে এখন ;
দেহে দেহে কখনো হবে না মিলন।
চির জীবন এক কিন্তু আত্মা দুজনার ;
প্রেমের মিলন হবে পরলোকে আবার।

এই কবিতাটা বাডের সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। আর একটা কবিতায় বিদায় গ্রহণের চিত্র পাই। সেনাপতি যুদ্ধে যাইতেছেন—যাইবার সময় পত্নীর নিকট শেষ কথা বলিতেছেন। কবিতা হিসাবে এইটা অতি সুন্দর। অধিকন্তু চীনা ইতিহাসের একটা বড় ঘটনার স্মৃতি এইটার সঙ্গে

জড়িত। ১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এইটা লেখা হয়। প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্থ-উ প্রসিদ্ধ হান্ সম্রাট উ-তির (খৃঃ পূঃ ১৪০-৮৭) প্রতিনিধি স্বরূপ হুণ-মুল্লুকে প্রেরিত হন। হুণেরা তখন মধ্য এশিয়া হইতে দক্ষিণে ভারত মণ্ডল এবং পূর্ব্বে চীন মণ্ডল উস্তম্ পুস্তম্ করিয়া রাখিতেছিল। এই উৎপাত নিবারণের জন্য উতি বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন,—অসংখ্যবার তাঁহাকে চীনের বাহিরে পশ্চিমদিকে যুদ্ধের অভিযান পাঠাইতে হয়। এই সম্রাটের পূর্ব্বে আর কেহ কখনও চীনের বাহিরে অভিযান পাঠান নাই। সেনাপতি স্থ-উ এই সকল বিদেশাভিযানের অন্যতম ধুরন্ধর নিযুক্ত হন।

স্থ-উ সম্বন্ধে আর একটা কথা জানিবার আছে। তিনি উনিশবৎসর হুণ-মুল্লুকে বন্দী ছিলেন। হুণেরা তাঁহাকে ছলে বলে কৌশলে চীনেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সচেষ্ট হয়। স্থ-উকে নানা প্রকার নির্য্যাতনে ফেলা হয়। তথাপি তিনি স্বদেশদ্রোহী হন নাই কিন্তু স্থর বন্ধু কবি লী-লিঙ্‌কে হুণেরা সহজেই চীনের মমতা ভুলাইতে পারিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৮৯ সালে অশেষ বাধা বিঘ্নের পর স্থ স্বদেশে ফিরিবার সুযোগ পান। উনিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশ ছাড়িবার সময়ে সেনাপতি মহাশয় পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন—"যদি বাঁচিয়া থাকি তবে ফিরিয়া আসিব; আর যদি মরি তাহা হইলে তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে মরিব।"
স্থ-উ বলিতেছেন :—

দু জনে ছিনু মোরা যেন একজন;
অবিশ্বাসে প্রেম কভু হয় নি মলিন;
উভয়ের ছিল মাত্র একটি সাধন
সুখ ও স্নেহের দেওয়া নেওয়া রাত্রি দিন।
বসন্তের আনন্দ ফুরাল এবে;
বিষাদের বাণ হৃদি পশিবে দোঁহার;

নিদ্রা নাই চোখে যাবার সময় ভেবে ;
কত দ্রুত দেখি হায় গতি ঘণ্টার !
জাগো প্রিয়তমে ! তারা অস্ত যায়,
সাহসেই সইতে হবে বিদায়ের শোক ;
উতলা মন কিন্তু অভিযানের চিন্তায় ;
পাহাড় মরুবনের পথে চলবে লোক ?
তার পর অবশেষে ভীষণ যুদ্ধের মাঠ,
মন্ত্রের সাধন তায়, কিম্বা শরীর পতন ;
কিন্তু হায় দুঃখভারে অবশ যেন কাঠ
না হ'তে পারে ভেবে আমার মিলন !
চাপা ছিল অশ্রু ; তা' এখন ঝরে
স্নেহে হাত বুলাইয়া দিলে যেই অভয় ;
নইলে রুদ্ধ শ্বাস পরাণ ভাঙ্গিবে অন্তরে
শুনে কথা তোমার ভালবাসাময়।
যৌবনের প্রেম-কথা স্মরিব এখন,
স্মৃতি উঠ্‌বে জাগি পুরাণা সুখের
এই মোর সহচর পথে থাকৃব যখন,
তোমার ও কর্‌বে লঘু ভার দুঃখের।
কত না সুখে পুনঃ রচিব সংসার
লড়াইয়ের মাঠ হ'তে ফিরিবার পর ;
কিন্তু হায় যদি ঘটে মরণ আমার
থাক্‌বে তোমার সাথে মোর আত্মা অমর।

বিদায়ের কোন কবিতা দেখিলেই আমাদের মনে পড়িবে—

"এ বার চলিনু তবে সময় হয়েছে নিকট
এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

কিন্তু সে বিদায়ের পর গৃহত্যাগী আর ঘরে ফিরিবেন না। উহা চির-বিদায় উৎকট বৈরাগ্যের তাড়না সেখানে দেখিতে পাই। "মহাকালে"র ডাক বৈরাগীর কানে পড়িয়াছে—কাজেই তখন "কে আত্ম পর ?" কাজেই সেখানে বক্তার চোখে জল নাই। "আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্ম্মম আমি আজি।" কিন্তু সু-উ সেনাপতি তাহার পক্ষে গৃহত্যাগ এবং প্রত্যাবর্ত্তন মামুলি কথা। ঘরবাড়ী ছাড়িয়া যুদ্ধে যাওয়া ক্ষত্রিয় মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। যুদ্ধের পর ফিরিয়া আসাও তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। পুনরায় সংসার রচনা করিবার আশা তাহার হৃদয়ে বলবতী। কাজেই বিদায়ের শোক এক্ষেত্রে সাময়িক। তবে এই শোক একতরফা নয়। "বিষাদের বাণ হৃদি পশিবে দোঁহার।"

যিনি দুনিয়াকে আপনার করিতে চাহিতেছেন তাঁহার পক্ষে "সুখময় নীড়" তুচ্ছ করাই স্বাভাবিক। তাঁহার চিন্তায়

"অরুণ তোমার তরুণ অধর
করুণ তোমার আঁখি
অমিয় রচন সোহাগ বচন
অনেক রয়েছে বাকি।"—

এই সব বাকি-রওয়া সুখ ভোগ দুর্ব্বলতা মাত্র। তিনি উচ্চতর ভূমি হইতে এ গুলি সদর্পে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু লড়াইয়ের জন্য যে বীর গৃহত্যাগ করিতেছেন তাঁহার বচন অন্যরূপ। "যৌবনের প্রেম কথা স্মরিব এখন * * এই মোর সহচর পথে থাকব যখন"।

যুদ্ধ যাত্রার সময়ে যে সেনাপতি স্ত্রীপুত্র পরিবারের দলে বসিয়া কান্নাকাটি করে না সে মানুষ নয়। আবার যে তাহাদের মায়া মমতা কাটাইয়া উঠিতে পারে না সে নরাধম। যদি কোন ক্ষত্রিয় তখন আত্মীয় স্বজনকে বলে—"স্ত্রী, তুমি কিছু নও; পুত্র কন্যাগণ, তোমরা আমার কেউ নও; গরু

বাছুর ঘরদুয়ার টাকা পয়সা বন্ধু বান্ধব, ইহারাও অলীক, তোমরা সকলেই আমাকে মায়ামুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে। তোমাদের বন্ধন এড়াইয়া আমি মুক্ত হইতে চলিলাম।” তাহা হইলে বুঝিব যে লোকটা গোঁয়াড় বেকুব, আহাম্মুক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন। প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের বচন এইরূপ “স্ত্রীপুত্র পরিবার তোমরাই আমার সব ; ধনদৌলত বাড়ীঘর, এই সমুদয়ই আমার স্বর্গ। আমি এখন যুদ্ধে না গেলে আমার সব ও আমার স্বর্গ রক্ষা পাইবে না। এই জন্য আমি ক্ষণেকের তরে তোমাদিগকে ছাড়িয়া লড়াইয়ের মাঠে যাইতেছি। শীঘ্রই হাসি মুখে ফিরিয়া আসিব। তোমাদের চোখ মুখ আমার চোখের সম্মুখে রাখিয়া এ কয়দিন কাটাইব—যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের শুভ আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা আমার সঙ্গী থাকিবে। হাঁসপাতালে ভুগিবার সময়ে তোমাদের শুশ্রূষাই স্মরণ করিব। আর যদি মরিয়া যাই তাহা হইল আমার আত্মা তোমাদের চারিদিকে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইবে।” কাজেই সেনাপতির গৃহত্যাগ চিরবিদায়ের ঘর ছাড়া নয়।

সু-উ যে ভাবে ঘর ছাড়িতেছেন আজ-কালকার জার্ম্মাণ সেনাপতিও ঠিক এই ভাবে ঘর ছাড়িয়া থাকেন, ইংরেজ সেনাপতি ও এই ভাবে ঘর ছাড়িয়া থাকেন ভারতীয় সেনাপতিরাও এই ভাবেই ঘর ছাড়িতেন। যুদ্ধে যাইবার সময় চরম বৈরাগ্যের কথা মনে আনা অস্বাভাবিক। যাহারা জীবনে কখন এ যুদ্ধ করে নাই এক মাত্র তাহারাই ঐ সকল কথা মুখে আওড়ায়। কিন্তু যুদ্ধ যাঁহাদের খেলার সাথী তাহারা সুখময় নীড়ের সাংসারিক সুখও ভোগ করে আবার যথা সময়ে দেশের জন্য জীবনের রক্ত ও ঢালিতে প্রস্তুত থাকে।

যুদ্ধ-যাত্রী ভাবিয়া থাকেন—“স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কাননতীর সেই স্বদেশ সুন্দরীর ইজ্জৎ রক্ষার জন্য বাহির হইতেছি। যুদ্ধে জিতিব নিশ্চয়ই। কিন্তু হারিব না তাহাই বা কে বলিতে পারে

লড়াইয়ের মাঠ হইতে ফিরিব নিশ্চয়ই। কিন্তু নির্জ্জন মরু প্রান্তরে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে ” এইরূপ দুনলা চিন্তাই সৈনিক পুরুষের স্বাভাবিক চিন্তা। সেই স্বাভাবিক চিন্তাই স্থ-উর কবিতায় পাইতেছি। স্থ-উ দুনিয়ার যে কোন ক্ষত্রিয়ের প্রাণের কথা বলিয়া দিয়াছেন। এই কবিতায় সাহস এবং ভয়, ভাবুকতা এবং উদ্বেগ, ত্যাগ এবং ভোগ, অশ্রু এবং হাসি, স্মৃতি এবং দুঃখ, আশা এবং শঙ্কা এক সঙ্গে আছে। এইগুলি এক সঙ্গে না থাকিলে কবিতাটার মূল্য কিছুই থাকিত না। রক্ত মাংসের মানুষের তাজা হৃৎপিণ্ডে এইরূপ স্পন্দন দেখা যায়।

যুদ্ধ যাত্রার কালে—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ?"

এইরূপ গাহিতে হয় না। গাহিতে হয়—

"কত না সুখে পুনঃ রচিব সংসার
লড়াইয়ের মাঠ হ'তে ফিরিবার পর ;
কিন্তু হায় যদি ঘটে মরণ আমার
থাকবে তোমার সাথে মোর আত্মা অমর।"

চীনা ভালবাসায় চীনের একচেটিয়া স্বদেশী মাল কিছু পাইলাম কি ? এইবার এক বিরহিনীর অন্তরে প্রবেশ করা যাউক। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক।

যে দিন তুমি আমায় ছাড়িয়া গেলে
সে দিনের ক্ষণগুলি কত না ভারী !

যে গাছ তলায় মোদের শেষ দেখা হল
সে গাছে ছিল কিন্তু ফুলফলের সারি।
সুরভি শাখা ভাঙ্গি সে তরুবরের
যতনে লয়ে ছিলাম কিসলয়ে ;
এত দিন তারে স্থান দিয়াছি বুকে
রাখ্‌তে সতত মনে সে বিদায়ে।
সুদূর বিদেশে আছ তুমি এবে,
তোমার জীবন আমার চোখের বাহিরে ;
গন্ধ কোমল কিন্তু ক্ষুদ্র স্মারকের
হৃদয়ের কাছে মোর আনে তোমারে।
তুচ্ছ এই পাতা ফুল সকলেই জানে,—
রাস্তার লোকের কাছে মূল্য কিছু নয় ;
বেদনা বিদায়ের আর ভালবাসা
কতবার দেয় মোরে ক্ষুদ্র কিসলয়।

বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এ চীনারা আজকালকার ইংরেজ, ইয়াঙ্কির ও জার্ম্মান যুবক যুবতীর মতন স্মারক বা "লাভ-চার্মের" মূল্য বুঝিত। আর তাহার পরিচয় সাহিত্যেও পাইতেছি। মানব হৃদয় যুগে যুগে এবং দেশে দেশে বিভিন্ন বোধ হয় কি? শেষের লাইন দুইটা লিখিতে পারা সহজ কথা নয়। ছাড়া ছাড়ির বেদনা ও ভালবাসা বারে বারে আসুক— এই ইচ্ছাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু কবিতার এই কথা বেশী পাওয়া যায় কি? যে কবিতায় পাওয়া যায় সেটা অতি সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির সাক্ষী—অতি আন্তরিক মাল। চীনা প্রেম-সাহিত্যে সেই সূক্ষ্ম শক্তি ও আন্তরিকতা দেখিতেছি। দুনিয়ার যে কোন আন্তরিকতার প্রকাশেই এইরূপ সাহিত্য পাইব। ভারতবর্ষেও আছে—পাশ্চাত্য মুল্লুকেও আছে।

এক্ষণে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর এক চীনা যুবতীর হৃদয় খুলিয়া দিতেছি। তাহাতে ও সকলেরই সুপরিচিত রক্তমাংসের গন্ধ ভরা রহিয়াছে দেখিতে পাইব। প্রেম পাগলের উচ্ছ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ায় এক প্রকার।

আপেল গাছের ফুল ফুটেছে,
জাগ্‌লো স্মৃতি আমার প্রিয়ের ;
ইচ্ছা করে "সি-চাও" দূরে,
পাঠাই কিছু গোছা ফুলের।
হায় সে আছে কত দূরে
ফুল কি কভু পৌঁছিবে সেথা ?
যদি নিজে যেতে পারতাম
দূর হ'ত দুয়ের হৃদের ব্যথা।
লব' বেঁধে চুলের খোপা
কাকের পাখার চেয়ে কালো ;
প'রব হর্ষে রেশ্‌মী ঘাঘ্‌রা
শোভা পাবে সুখের আলো।
সি-চাও কোথায় কেবা জানে ?
শুনেছি সুদূর উত্তরে,
নদীটা পার হ'লে পরেই
পুছব পায়ে পথের তরে !
হায় কষ্ট ! রবি যায় অস্তে
বহু দূরে রহে সি-চাও
নীড় মুখো ফিরে পাখী সব,
আজ না হ'তে পারি উধাও।

প্রেম পাগ্‌লা হৃদয়ের এই গেল এক খেয়াল। আর এক খেয়াল নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

সন্ধ্যাকালে রোজ দাঁড়াব
ঠাণ্ডা তলায় সীদার গাছের ;
ফটক পারে রইব একা,—
আস্‌তে পারে প্রিয় প্রাণের !
খোপার শোভা মুক্তামণি
জ্বল্ জ্বল্ করে শিশির পেয়ে ;
এখনো না সখা এল
বাড়ে শোক পথ চেয়ে চেয়ে।

হিন্দু রাধা ছাড়াও দুনিয়ার অন্যান্য রাধারা বিরহের দুঃখ বুঝেন এবং সেই দুঃখ নিবারণের চেষ্টাও করেন। ব্যাধি এবং দাওয়াই সর্ব্বত্রই এক প্রকার। চীনা বিরহিণীর কথায় রাধার প্রলাপই শুনিতে পাইতেছি। আর এক খেয়াল :—

ধীরে বহিছে সমীরণ,
দিনের মতন হাসে নিশা ;
যাই তুলিগে' কুমুদ রাশি,
দেখব তাহার পথে আসা।
শরৎ ঋতুর সোনার কালে
পদ্ম কুমুদ লাল বিরাজে ;
দখিন দীঘির জলের ভিতর
ঊর্দ্ধে তাদের বৃন্ত সাজে।
হৃদে জাগে সুখের স্মৃতি
পদ্মবীজ সব তুলি যখন ;

বরন তাদের সবুজ গায়
নলের মাঝে জলের মতন।
বুকের ভিতর রাখি কিছু,
রক্ত প্রায় লাল ভিতর তাদের ;
প্রেমের যখন জোয়ার ডাকে
হৃদয় সেরূপ সু প্রেমিকের।
বুকে সে সব কতই চাপি,
সবার চেয়ে বুকই সেরা
রাখবার তরে প্রেমের স্মারক ;
প্রাণেশ তবু দেয় না ধরা!

চীনা বিরহিণীকে হিন্দুরাধার সখী বিবেচনা করা যায় কি না? উস্মা বলিতেছে—পরের খেয়াল :—

মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে
উত্তরে চলে হংসী দল ;
সি-চাও ছেড়ে যাবে তারা,
(হায়) থাক্‌ত যদি মোর পাখার বল !
উঠিগে যাই দুর্গ চূড়ায় ;
উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে পর
শীঘ্র দেখ্‌ব প্রিয়ের আগা,—
হৃদয়ে আমার রবির কর।
দুর্গটা ত খুবই উঁচু ;
হায় বেশী দূর পাই না দেখ্‌তে—
প্রিয়ের আমার বাসা যেথায়
উত্তর তারকার রোশনাইতে !

সকাল হ'তে সন্ধ্যাবধি—
হায় সুদীর্ঘ দিন না ফুরায় !—
দুর্গ চূড়ায় ঘুরে মরি
স্বপ্নের ঘোরে যেন নিশায়।

বিরহিনীর শেষ খেয়াল—

পর্দা সরিয়ে আর একবার
বাতির আলো দেখাই পথে ;
রাস্তা ভুলে' প্রিয় আমার
নইলে ঘুরতে পারে রেতে।

কৃষ্ণ যখন মথুরায় তখন রাধার চিত্ত ঠিক এই প্রকার। বিরহিনী বাঁচিয়া থাকে কিসের জোরে? আশার। চীনা বিরহিণীর শেষ কথাঃ—

উচ্চ যত আকাশের ছাদ,
বিপুল যত স্ফীত সাগর ;
হিয়ার রাজা রইলে দূরে
দুঃখে ভরা আমার অন্তর।
হৃদয়ে মোর ব্যথা সদাই,
কিন্তু প্রিয়ের পাণে মন ভরা ;
সে চাওয়ে মোর প্রাণের আশা
দখনে বায়ু নিয়ে যায় ত্বরা।
সাগরে কায় কর্‌ছে পৃথক ;
সর্ব্বদা গিঁট বাঁধা হিয়ায় ;
স্বপ্ন দুয়ের মিশবে সুখে
পুনর্ম্মিলনের প্রতীক্ষায়।

এই চীনা বিরহিণীর বুকে সাহিত্যের ষ্টেথস্কোপ লাগাইবার প্রয়োজন

আছে কি? খালি কানেই স্পন্দনটা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই স্পন্দন কি প্রাচ্যার হৃৎপিণ্ড ধড়ফড়? না পাশ্চাত্যার হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়? বস্তুতঃ এই কবিতাটার ভিতর চীনের স্বদেশী দ্রব্য মাত্র সিচাও সহর, আর প্রাচ্যের আশ কেবল পদ্ম ও কুমুদ। ভারতীয় রাধা-সাহিত্যেও হিন্দুর খাঁটি-স্বদেশী মাল কেবল যমুনা, তমাল, সহকার, কোকিল এবং চকোর ইত্যাদি। গ্যেটের "হ্যার্ম্মান ও ডরোথিয়া"রও খাঁটি জার্ম্মান মাল কেবল বোধ হয় 'বিয়ার' সরাব!

এই বার চীনাদের সেরা প্রেম-কাহিনীটা খুলিয়া বলিতেছি। উহা রাজার প্রেম। বাদশাহী প্রেমের গল্পে আমরা শাহজাহান ও নুরজাহানের কথাই সহজে মনে করিব। আমাদের বিক্রমাদিত্যের কাহিনীসমূহের মধ্যেও স্বয়ং রাজার প্রেম দু-চারিটা আছে। কিন্তু এই গুলির ভিতর কামকান্দলা বাইয়ের সঙ্গে কালোয়াত মধোর প্রণয়ই চরম প্রেমের দৃষ্টান্ত। বিক্রমাদিত্য বাহাদুর এই প্রেমিক যুগলের মিলন ঘটাইবার জন্য রাজ্য পণ করিয়া বসিয়াছিলেন। "বত্রিশ সিংহাসনের" রূপকথায় তাহা জানা যায়। এই প্রেমিক যুগলের বিরহ লয়লা-মজনুনের, অথবা রাধা-কৃষ্ণের অথবা রোমিও-জুলিয়েটের নিবিড় শোক মনে জাগাইয়া দেয়। সুতরাং এই কাহিনীটা প্রেম-সাহিত্যে নং১ শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু উহা রাজ-প্রেম নয়। চীনা রাজ-প্রেমের গল্প এই সকল চরম প্রেমোন্মাদেরই রসে ভরপূর। ইহা বিষম ট্র্যাজেডি-বিষাদের মহাসাগর। গল্পটার ইংরাজি নাম জাইল্‌সের ভাষায় "এভারলাষ্টীং রঙ"। আর ক্র্যান্মার-বিঙের ভাষায় "নেভার-এণ্ডিং-রঙ"। বাঙ্গালায় বলা যাউক "কল্পান্তস্থায়ী অত্যাচার" বা "অন্তহীন জুলুম" বা "অশেষ অন্যায়"। প্রেমিক যুগল সংসারের নিকট হইতে অত্যাচার, জুলুম এবং অন্যায়ই পাইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের চিন্তায় উহা কল্পান্তস্থায়ী, অন্তহীন এবং অশেষ। প্রলয়ের পরেও এই অত্যাচারের

কথা বিশ্ব হইতে মুছিয়া যাইবেনা। নির্য্যাতিত প্রেমিকেরা এইরূপই ভাবিয়া থাকেন। যে কোন কর্ম্মক্ষেত্রেই নির্য্যাতিত লোকেরা এইরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত—কেবল মাত্র প্রেমের রাজ্যে নয়। যে কোন নির্য্যাতনের কাহিনীই এই কারণে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সনাতন বিষাদ জাগাইতে পারে। যে কোন নির্য্যাতন কাহিনীই এই কারণে দুনিয়ার ট্র্যাজেডি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য—এবং উহা পাঠ করিয়া জগতের যে কোন নরনারী জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্বকীয় চিত্তের শোধন করিয়া লইতে পারে। ট্র্যাজেডি সাহিত্যে "স্বদেশিকতা" বা "জাতীয়তা" নাই। উহা সনাতন,—বিশ্বমানবের হৃদয়ের ছবি।

বিরোধ, অত্যাচার, দলন, নির্যাতন ইত্যাদি মানুষের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রেমের মুল্লুকেই বিরোধ বা অত্যাচারের এক চেটিয়া পশার নয়। আবার প্রেমে বিরোধ দুনিয়ার সকল দেশেই ঘটে—উহা একমাত্র নব্য পাশ্চাত্য মুল্লুকেরই সামাজিক "ব্যাধি" নয়। সকল সমাজেই এবং সকল যুগেই প্রেমে বিরোধ ঘটিয়াছে। সুতরাং সকল দেশের সাহিত্যেই প্রেম-ট্র্যাজেডির পরিচয় পাই। চীনা সাহিত্যেও পাইতেছি। এই বিষাদের কাহিনী লিখিয়াছেন পো-চুই। তাঁহার "বীণাওয়ালী" পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কে (খৃঃ অঃ ৩৭৫-৪১৫) আমরা "নবরত্নে"র সংরক্ষক বিক্রমাদিত্য বলিয়া জানি। আমাদের বিক্রমাদিত্য সকল বিষয়েই "বাপ্‌কা বেটা" ছিলেন। তাঁহার বাহুতে ভারতীয় নেপোলিয়ান, দিগ্‌বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের (১১০-৭৫) পরাক্রম ছিল। তাঁহার মুদ্রায় দেখা যায় যে তিনি পশুরাজ সিংহের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে ব্যাপৃত। সিংহবিজয়ী বিক্রমাদিত্যের কালিদাসই লিখিয়াছিলেন—"ন খলু নির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্।" কিন্তু চীনা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী কিছু বিপরীত। তাও

সম্রাট্ মিঙহুয়াঙ (৬৮৫-৭৬২ খৃঃ অঃ) তাঁহার পিতামহের বাহুবল লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঙ নেপোলিয়ান তাই চুঙের (৬২৭-৬৫০ খৃঃ অঃ) অল্প পরেই চীনা সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন লাগে। মিঙহুয়াঙ সেই ভাঙ্গনের সময়ে চীনেশ্বর। একদিকে অন্তর্ব্বিদ্রোহ—অপর দিকে হূণতাতরের উৎপাত। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালেই চীনের নবরত্ন বিরাজ করিতেছিল। এই হিসাবে তিনি বাগ্‌দাদের হারুণ আল রশিদের জুড়িদার। হারুণের আমলে মুসলমান সাম্রাজ্যের পরাক্রম অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু মুসলমান সভ্যতার গৌরবযুগ তখন চলিতেছে। এই কারণে মিঙহুয়াঙকে ইয়োরোপের শার্লম্যানের সঙ্গেও তুলনা করিতে পারি না। কেননা শার্লম্যন হিন্দু বিক্রমাদিত্যের মতনই একাধারে পরাক্রমশালী এবং নবরত্নের সংরক্ষক ছিলেন। যাক্ এসব সূক্ষ্ম বিচার—সাধারণতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মিঙহুয়াঙ, শার্লম্যান এবং হারুণ আলরশিদকে দুনিয়ার বিক্রমাদিত্য বিবেচনা করা হইবে।

মিঙহুয়াঙ ৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। প্রথম কয়েক বৎসর ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিলাস বর্জ্জনের নানা আয়োজন করা হয়—বেগম মহলে রেশমী বস্ত্র এবং হীরা জহরতের রেওয়াজ তুলিয়া দেওয়া হয়। এদিকে শিল্প, সঙ্গীত সাহিত্য ইত্যাদির পরিপুষ্টির জন্য মনের মত টাকা খরচ করা হইতে থাকে। অ্যাকাডেমি স্থাপিত হইল, সঙ্গীত ভবন স্থাপিত হইল, কলাভবন স্থাপিত হইল, গ্রন্থাদি প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। অভাব রহিল কেবল বাহুবলের। সাম্রাজ্যের শান্তি রক্ষা করা তাঁহার ক্ষমতার অতীত। এদিকে বাদশাহী মেজাজের খেয়ালও আসিয়া জুটিল। ইয়াঙ বংশের এক রূপসীর প্রেমে পড়িয়া চীনেশ্বর হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন। এই রমণীর নাম তাইচেন। তাই-চেনেরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে চীনের শাসন চলিতে থাকিল। তাঁহার আত্মীয়

স্বজনেরা রাজদরবারে বড় বড় চাকুরিতে বাহাল হইলেন। "রঘুরাজ" অগ্নিবর্ণ রাজার যে বিবরণ মিঙহুয়াঙের সম্বন্ধে সেই বিবরণই প্রযোজ্য একটা বিদ্রোহের সময়ে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া চীনেশ্বর রাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ছিছোয়ান প্রদেশে পলায়ন করিবার পথে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ক্ষেপিয়া উঠিল। প্রথমেই তাহারা প্রধান মন্ত্রীর গর্দান চাহিল। প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তাই-চেনের ভাই। তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যেরা অভিযোগ তুলিল—"ইনি চীনেশ্বরের বিরুদ্ধে তিব্বতী সেনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকাইতেছেন।" মিঙহুয়াং মন্ত্রীর প্রাণ দণ্ড দিতে বাধ্য হইলেন। সৈন্যেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নয়। তাহারা রাজ-প্রেয়সীর রক্ত চাহে। তাইচেনই তাঙ বংশের শনি! চীনেশ্বর কোন মতেই বেচারার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। সৈন্যেরা জোর করিয়া তাঁহার হাতে তাইচেনের মৃত্যুদণ্ড লিখাইয়া লইল। তাইচেনের রক্তে মরুপথের ধূলি সিক্ত হইল। ইহাই "কল্পান্তস্থায়ী অত্যাচারে"র কথা। পো-চূই এই ঘটনার শতাধিক বৎসর পরে কাব্য রচনা করিয়াছেন। খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রেমের ট্র্যাজেডি খাড়া করা হইয়াছে।

"কল্পান্ত-স্থায়ী অত্যাচার"

শুনা যায় হান্ আমলে (খৃঃ পুঃ ২০২—খৃঃ অঃ ২২০) চীনে একজন নং১ রূপসী ছিলেন। তাঁহার এক চাহনিতে নাকি একটা নগর ধ্বংস হইতে পারিত—আর দুই চাহনিতে একটা গোটা সাম্রাজ্যই লোপাট হইত! সৌন্দর্য্যের প্রভাব সম্বন্ধে বোধ হয় ভারতবর্ষেও এই ধরণের সংস্কার আছে। সুন্দরী বলিলে চীনারা সেই হান্ আমলের চীন-সুন্দরীকেই মনে আনে। আমাদের তাইচেনও সেই হান্-সুন্দরীর সমানই রূপসী।

পো-চুই বলিতেছেন :—

মজিলেন বাদশাহ রূপের পিপাসায়,
রূপসীর সন্ধানে সময় তার যায়।
নিশ্চিত মুল্লুক নাশ চাহনিতে যার
লভিবেন রাজা সেই নূর্ দুনিয়ার।

চীনের "নূর জাহান"কে খুঁজিয়া বাহির করা হইল। তাঁহার রূপে এইবার বেগম মহল আলোকিত হইবে।

ইয়াঙেদের ঘরে ছিল এক মেয়ে,
তনু ভরা যৌবনে ;
জেনানায় জীবন কাটে অনুক্ষণ
লোক চোখের অদর্শনে।
দেওয়া বিধাতার লাবণ্য তাহার
লুকিয়ে রাখা না যায় ;
তলবে বাদশার সুন্দরী ধরার
হাজির বেগম মহাল্লায়।

চাহনি চোখের হাসি অধরের
হরে দরবারীর চিত্ত ;
বেগম মহলে রূপ দেখে ঢলে
রাণী প্রেয়সী ভৃত্য।
বসন্তাগমে রাজার হুকুমে
"হুয়াচিঙ"—সরে সে নায় ;
উষ্ণ লহরদল সে দীঘির টলটল
সুন্দরীর অঙ্গ দোলায় ॥
নাওয়া ধোয়ার পর দাসী সহচর
হেলিয়া সুশ্রী চলে ;
কাবু বাদশার দিল, রাজের লাগাম ঢিল,
যুবতীর চাহনি বলে।

শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা হিসাবে এই কয় লাইন হিন্দুদের রাধা-সাহিত্যের নিকট দাঁড়াইতে পারিবেনা। কেননা সে সাহিত্য অতি বিপুল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের শৃঙ্গার রসই এখানে পাইতেছি। "বয়ঃসন্ধি" অধ্যায়গুলি সকলেরই মনে পড়িবে। মধ্য যুগের ইতালীয় এবং ফরাসী (ত্রুবেদোর) সাহিত্যে এই ধরণের "যুবতীর চাহনি" বর্ণনা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের এলিজাবেথান সাহিত্যেও শারীরিক সুষমার দিকে নজর এইরূপই।

এইবার পো-চুই বিহার-বিলাসের রঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। এইটা ঠিক যেন "পদাবলী" সাহিত্যের "বসন্ত-লীলা"র এক কণা। হিন্দু সাহিত্যে ইন্দ্রিয়ারামের চর্চ্চা অত্যধিক। কামশাস্ত্র গুলিয়া আমাদের কবিরা পদাবলীর মহাসাগর তৈয়ারি করিয়াছিলেন। তাহার তুলনায় অন্যান্য সাহিত্যের দৈহিক সুখ চর্চ্চা নিষ্প্রভ হইবার কথা। তবে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই কামশাস্ত্র

একরূপ। কেহ এই বিষয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি বেশী করিয়াছেন, কেহ বা কম এই যা।

ফুলের মতন মুখের উপর
মেঘের মতন চুল পড়ে তার ;
রাজ বাগিচায় বিহার কালে
কি চমৎকার খোপার বাহার।
আনন্দময় বসন্তের রাত,—
হায় নিশাকাল কেন না রয় ?
খেলায় তাদের আশ মেটেনা,
চোপোররাতই রঙ্গরস হয় !
আর সকালে না হয় বৈঠক,
দপ্তরের কাজ রয় বকেয়া ;
খানা পীনা ভোজ হয় হরদম্,
কাজের ফুরসুত যায়না পাওয়া !
বসন্তের উৎসবে তাই-চেন্,
তাইচেন্ রাণী রেতের লীলায় ;
তিন হাজার সুন্দরীর মাঝে
তাইচেনের বাস বাদশার হিয়ায়।
জীবন কাটে "সোণার ঘরে",
সেবা করে তারে দাসী,
"পান-মহলের" লাল সরাবে
মাথায় আসে খেয়াল রাশি।
তাইচেনের ভাইবন্ধু যারা
তারাই এখন দেশের রাজা,

হায় সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল এতে,—
চীন মুল্লুকের মস্ত সাজা !
গোটা দেশের মেয়ে পুরুষ
চায় না জন্ম বেটা ছেলের
ভাবছে সুখে থাকৃতে পারবে
জন্ম দিলে কেবল মেয়ের !
প্রাসাদের গানবাজনার আওয়াজ
ধূসর মেঘের রাজ্যে পৌঁছে ;
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়
এটার ওটার সবার কাছে।
সেতার বাঁশীর ধ্বনির সাথে
ধুম সর্ব্বদা নারির গানের ;
সারা দিনই সঙ্গত চলে
বাদশার নাইক লেশ হায়রানের।
হায় অকস্মাৎ বাজল কাঁড়া
লড়াই বুঝি শীঘ্র বাধে ;
"রামধনু-ঘাঘরার" তাল ছেড়ে
তান্ডবের সুর সবাই সাধে।

সোণার রাজবংশ ছারখার হইতেছে। পো-চুই তাহার এই চিত্র দিয়াছেন। কালিদাস ও রঘুবংশের অধঃপতন দেখাইতে যাইয়া অবিকল এই দৃশ্য দেখাইয়াছেন। কামের প্রভাবে রাজ্যনাশ দুই সাহিত্যেই প্রায় এক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। শৃঙ্গার রসে কলম ডুবাইয়া কালিদাস তাহার কুফল দেখাইয়াছেন। পোচুইয়ের তুলিও সেই রসেই ডুবানো— কালিদাসের কথাগুলিই যেন চীনা সাহিত্যে সংক্ষিপ্ত আকারে রহিয়া

গিয়াছে। যে দিন হইতে "অযোধ্যা কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা" সেই দিন হইতে "রঘুবংশের" প্রধান কথা চীনা কবিবরের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

"কাবু বাদশার দিল, রাজের লাগাম ঢিল,
যুবতীর চাহনি বলে।"

তাহার চরম দৃষ্টান্ত উনবিংশ সর্গে। কালিদাসের অগ্নিবর্ণ আর পোচুইয়ের মিঙলুয়াঙ ঠিক যেন একব্যক্তি।

"আর সকালে না হয় বৈঠক,
দপ্তরের কাজ রয় বকেয়া ;
খানাপীনা ভোজ হয় হরদম্
কাজের ফুরসুত যায় না পাওয়া।"

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই শৃঙ্গার রস বা কাম প্রভৃতি এক প্রকার। অতএব জগতের সকল শৃঙ্গারসাহিত্যই এক। ইন্দ্রিয়লালসা হিসাবে মানুষের জাতিভেদ করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়-ভোগে প্রাচ্য পাশ্চাত্য নাই। কাজেই কামসাহিত্যে হিন্দু, চীনা, জার্ম্মান ইতালীয়, আধুনিক বা প্রাচীন বিভাগ করা অসাধ্য। শৃঙ্গার রসে কলম ডুবাইলে লেখা আজকালও যেরূপ হইবে—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত, এশিয়ায়ও যেরূপ হইবে ইয়োরামেরিকায়ও সেইরূপ হইবে।

মিঙলুয়াঙ রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন। বিদ্রোহীরা রাজধানী আক্রমণ করিয়াছে। এই হাম্‌লায় বাধা দেওয়া তাঁহার ক্ষমতায় কুলাইল না।

ছাইল ধূলার মেঘে ফটক রাজধানীর
বাদশাহ থামাতে নারে হাম্‌লা বিদ্রোহীর।
হাজার হাজার ঘোড়া রথ পলায় ডরে
দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে বাদশার তরে।

পলাতক পল্টনের টুপি পোষাকে
ভাতিল সরানের ধুলা আলোকে।
পশ্চিম ফটক রইল ক্রোশ ত্রিশেক দূরে,
সদরের দেওয়াল দেখায় ঘেরা আঁধারে।
তক্‌রার সুরু করে ফৌজেরা এবে,
বাদশার হুকুম তারা না মানিবে।
তারা চায় ক্রুদ্ধ তাইচেন বেগমের
তৎক্ষণাৎ হত্যা সম্মুখে সকলের।
ধুলায় লুটায় যেন সোণার অলঙ্কার,
পাখা মাছরাঙার আর পাখী খেলানার,
পোষাকি চুলের কাঠি জেড পাথরের,
তাইচেন সুন্দরীর সব কত না সখের।
প্রেয়সীর কোরবাণি ফৌজের দাবিতে
কমজোর বাদশার হ'ল মঞ্জুর করিতে
আঁখি কহে তাইচেনের নীরব কথা,
মুখ ঢেকে বাদশাহ সহে নিবিড় ব্যথা।
তারপর চোখ পড়ে ধরাশায়ীর অঙ্গে,
মিশিল আঁখি জল রুধিরের সঙ্গে!

কমজোর মিঙহুয়াঙ প্রথমে বিদ্রোহীদিগের সহরলুঠ-বন্ধ করিতে পারেন নাই—এক্ষণে প্রিয়তমার জান বাঁচাইতেও পারিলেন না। বিষাদের উপর বিষাদ। পরে ছিছোয়ান প্রদেশে বনবাসের পর্ব্ব।

পলাতক পল্টন সুখে বলিল এবে;
পথে কত মরুমাঠ হলদে বালুকার
যেথায় বিরাজে কেবল বালুর হাহাকার,

আর দাঁড়ায়ে মেঘ-ছাওয়া পর্ব্বত নীরবে।
সুদূর নিরজন অ'তি "অমি" গিরিবর,
মোসাফিরের যাওয়া আসা নাই সেখানে ;
দিন দিন বাদশাহী ফৌজের ঝাণ্ডা নিশানে
জাকজমক মুছিয়া যায় চোখের প্রীতিকর।
ছিছোয়ানের জলরাশি আঁধারে ভরা,
গিরিকুল ছিছোয়ানে ঢাকা আঁধারে !
প্রিয়াশূন্য বাদশার হিয়া দুঃখভারে
জ্বলে' নিশিদিন দেখে আলোহীন ধরা।
সাঁঝের সফরে সে বাহিরিয়া দেখে চাঁদ,
সে চাঁদে ব্যথা পায় হুতাশ ভরা হৃদি ;
আর সন্ধ্যায় বৃষ্টি কালে ঘণ্টা বাজে যদি
সে আওয়াজ ছিঁড়িয়া ফেলে বুকের বাঁধ ছাঁদ !

বিদ্রোহ আসিয়াছে। চীনেশ্বর মফঃস্বল হইতে সদরে ফিরিতেছেন। পথে পড়িল সেই শ্মশান যেখানে তাইচেনকে মারিয়া ফেলিবারহুকুম নিজ হাতে সহি করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে আবার সেখানে
বাদশা দাঁড়ায় দাগ দেওয়া স্থানে।
সেথায় কত সে কটালো সময়,
ছাড়িতে সে স্থান না পারে হৃদয়।
"মা-ওয়ে" পাহাড়ের চরণতলে
মাটীর ঢিপি শুধু দেখে সকলে।
প্রিয়তমার জীবনের চিহ্নোত নাই
আছে পড়ে' কেবল কোরবাণির ঠাঁই।

উজিরের চোখ পড়ে চোখে বাদশার,
ভিজায় দুয়ের বেশ অমনি অশ্রুধার।
তারপর পূবদিকে ঘোড়া ছুটে যায়,
সদরের লাল দেওয়াল পৌঁছে ত্বরায়।

সদরেও সেই ছিছোয়ানেরই ঘোর অন্ধকার। এ আঁধার কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনের আঁধার। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যেই এইরূপ আঁধারের বর্ণনা আছে।

পুরাণা সেই সরোবর সেই ফুল রাশি,
প্রাসাদের চারিধারে সেই "উইলো-বন"
বাদশা দেখে ফুলে তাইচেনের হাসি,
উইলোর ভ্রূ তার, আর "প্যান্‌সি" যে নয়ন।
বাদশার আঁখিধারা বহে অবিরাম,
বাগিচাতে এই সব দেখে সে যখন;
বসন্তের সপুষ্প "পীচের" যখন প্যাকাম,
আর শরতের বর্ষায় "উতুঙ" পাতার পতন।
তরুরাজি প্রাসাদের দখিন কোলে;
যথা সময়ে পাতা তাদের ঝরে,
সিঁড়ি সব ঢাকা পড়ে শুক্‌না লালে,
ঝাড়ুদার নাই বাহাল—কে পরিষ্কার করে?
"পেয়ার বাগানের" গানবাজনার ওস্তাদ সকল,
চুল তোমাদের পেকে গেছে গভীর শোকে।
অন্দর মহলেতে যত রূপসীর দল,
আর ত তোমরা নও যুবতী বাদশার চোখে।
জোনাকির দল যায় উড়ে ঘরের ভিতর;

বাদশা একলা থাকে বসে' বিষাদে ;
বাতি হয় আলোহীন পল্‌তে পোড়ার পর,
ঘুমের সাথে চোখ তবু মগ্ন বিবাদে।
পাহারা বদল হয় কতই দেরিতে !
কি ভীষণ না বড় রাতগুলি আজকাল ?
তারার দলও আসে না আলো দিতে !
আর যেন কথনো না হবে সকাল !
ছাদের টালিতে মূর্ত্তি হংস-হংসীর
চাপা পড়েছে যেন ঠাণ্ডা তুষারে ;
"মাছরাঙা" লেপেও না গরম শরীর,
লেপ মুড়ির কি ফল বিনা বথরাদ্দারে ?
জ্যান্ত ও মরার মাঝে সময় চলে যায়,
দিন রাত্রি আসে যায় সাবেকের মত,
স্বপনে বাদশা সেই মুখ খানি চায়,
তাইচেন নিরাশ করে তারে সতত।

এই কয় লাইনের ভিতর মিঙহুয়াঙের খাশ বাড়ীঘর বাগবাগিচার উল্লেখ আছে। এইজন্য বিদেশী লোকের পক্ষে আসল কথাগুলি কথঞ্চিৎ চাপা পড়িয়া যাইবার কথা। আমাদের রাধা সাহিত্যের রসও এই কারণে বিদেশীয়ের পক্ষে উপভোগ-করা কিছু কঠিন। অশোক, তমাল, তাম্বুল, চম্পক, মালতী, কদম্ব, কিংশুক, লবঙ্গ, চুত, চন্দন, মাধবী, অরবিন্দ, কুমুদিনী, কমল, শিরীষ, নকংশুক, ইত্যাদি ফুলফলের ছড়াছড়ি দেখিয়া হিন্দু তাঁহার পদাবলী সাহিত্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আদর করিতে প্রলুব্ধ হন। কিন্তু বিদেশীয়ের পক্ষে এইগুলির জন্যই মহা রসভঙ্গ হয়। সেইরূপ চাতক, চক্রবাক, কোকিল, চকোর, ময়ূর, খঞ্জন, হরিণ, হংস,

ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের নিকট রাধা-সাহিত্যের মূল্য বাড়িয়া যায়—কিন্তু বিদেশীয়ের কাছে এই সমুদয়ের ফল ঠিক উল্টা। কথাটা সহজেই বুঝা যায়। চীনা প্রেম-সাহিত্যের এই "স্বদেশী" কাঠামোটুকু রপ্ত করিয়া লইলে দেখি যে চীনা হৃদয়ে চীনা বস্তু কিছুই নাই। দুনিয়ার ব্যথিত পরাণ বিরহী মাত্রেই রাত্রিকাল সম্বন্ধে পো-চূয়ের ভাষায় ভাবিবে :—

"পাহারা বদল হয় কতই দেরিতে
কি ভীষণ না বড় রাতগুলি আজকাল ?
তারার দলও আসে না আলো দিতে
আর যেন কখনো না হবে সকাল !"

এই রাত সম্বন্ধেই এক দিন চীনা প্রেমিক যুগল ভাবিয়াছিলেন :—

"হায় নিশাকাল কেন না রয় ?"

ভারতীয় প্রেম-সাহিত্যে এই সকল কথার দৃষ্টান্ত অসংখ্যই আছে।

বেচারা বাদশা স্বপ্নে তাইচেনের সাক্ষাৎ পাইলেন না। শেষে প্রেত-লোকে তাইচেনের তল্লাসে আড়কাঠি পাঠান হইল। ভূতের মুল্লুকে যাইবেন কে ? একজন তাও-ধর্ম্মের পুরোহিত। তিনি মিঙহুয়াঙের দূতভাবে প্রেতলোকে গমন করিলেন।

"তাও"-ধর্ম্মী পুরোহিতের লিন্‌চুঙে বাস,
"হুং-তু" সম্প্রদায়ের মতে তাঁহার বিশ্বাস।
ওস্তাদ ছিল সে ভূত বশীকরণে,
তাঁরে রাখিত সে প্রেতলোকের ভূতগণে।
বাদশা দুঃখের ভার লঘু করিবারে,
তাইচেনের খবর আন্‌তে ভার দেয় তারে।
রূপসীরে ঢুঁরিতে হয় সে বাহির,
নানা প্রকার বিদ্যা করিয়া জাহির।

মেঘেতে দৌড়ে সে, উড়ে আকাশে,
বিজলীর সমান জোরে চলে যায় সে।
এই গেল আকাশে এই রসাতলে,
এই বা ছুনিয়ার গলি ঘোঁচ সকলে।
উর্দ্ধে ঢুঁরা হ'ল আকাশের আকাশ,
নিয়ে যাওয়া হ'ল "পীতঝরণা"র সকাশ।
কোথাও না মিলে পাত্তা তাইচেনের,
শেষে শুনে গল্প এক নূতন জগতের।
সমুদ্রের মাঝা-মাঝি আছে এক দ্বীপ,
চারিদিক অস্পষ্ট তার, না হয় জরীপ।
ঘরবাড়ী গুল্‌জার সেথা রামধনু প্রায়,
অমরেরা শান্তি সুখে কাল কাটায়।
"অনন্ত" নাম ছিল তাদের একজনের,
শুভ্রকান্তি আর ফুল-মুখ ঠিক তাইচেনের।

তাইচেন-খোঁজ কালে, আমরা সীতা ঢুঁরার কথা মনে করিতে পারি। বাল্মীকির হনুমান্ পো-চুইয়ের তাও-পন্থী ওস্তাদ। ছুই কাহিনীতেই ছুনিয়া উস্তম্ পুস্তম্ করা হইয়াছে। অবশেষে বিরহী প্রেমিকের নিকট "শোকা-কুলা"র সংবাদও আনা হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব বেগম সাহেবার নিকট দূত মহাশয় যথারীতি হাজিরা দাখিল করিলেন। দাসী দূতের আগমন বার্ত্তা তাইচেনের নিকট লইয়া গেল। "অথ সীতা হনুমৎ সংবাদ"।

সোনার মহালের
পশ্চিম দরওয়াজা
জেড্ পাথরের কবাট তার,

ওস্তাদ দূত বাদশার
আঘাতি দুয়ারে
এক সুন্দরীরে জানায়।
"চীনেশ্বরের লোক
আমি মাগি ভেট
দুনিয়া-নুরের সাথে।
"বিশ্বপুত্র" বাদশার
দূতের সেলাম
সুন্দরী ধরিল মাথে"।
মশারির মাঝে
তাইচেন শুনি এই
ভাঙ্গিল স্বপনের ঘোর।
কাপড় সামলাইয়া
উঠায় সে ত্বরা
বালিশের কোল হ'তে শিশুর।
পরে সে অঙ্গে
মণি-মুক্তার সাজ,
যেন দরবারের রাণী।
ঘুম ঘোর যায় বুঝা
দেখে মেঘ বরণের
তার আলু থালু বেণী।
মাথা ঢাকিয়া
ফুলদার পোষাকে
মজলিস্ মহলে সে যায়,

অমর পুরীর তার
জামার হাত দুটি
ফুলে উঠলো পেয়ে বায়।
আবার যেন সে
নাচ্‌তে এসেছে
"রামধনু ঘাঘরা"র তালে!
স্থির প্রসন্ন মুখ
আঁখি ভরা জল,—
হৃদয়ের কথা ঢালে।
অশ্রু ভিজানো
"পেয়ারে"র শাখা,—
বসন্তের বৃষ্টি জলে।
বুক ফাটানো শোক,
হৃদয়ের আবেগ
থামিল ধৈর্য্য বলে।

এইবার "ব্যবস্থাপিত বাক্ কথঞ্চিৎ" এবং "অন্তর্গত বাষ্পকণ্ঠ" হইয়া তাইচেন অন্তরের ব্যথা জানাইতে লাগিলেন। আমাদের অশোক কাননের সীতা জীবন্ত অবস্থায় জানাইয়াছিলেন। চীনা বিরহিণীর কথা তাঁহার ভূতের মুখ হইতে শুনিতেছি। তবে ভূতের বাড়ী ঘর বেশভূষার যেরূপ পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে জ্যান্ত মানুষের আব্‌হাওয়াই দেখিতেছি। ভুতুড়ে কাণ্ড এখানে কিছু নাই। "তাও" পন্থীদিগের স্বর্গ আমাদের মর্ত্ত্যের স্ত্রীপুরুষেই ভরা। দান্তে ও মিল্টনের স্বর্গ নরক পো-চূইয়ের কল্পনায় নাই।

প্রিয়তম মরিয়া গেলে পর তাঁহার আধমরা সখা বা সখী শোকোচ্ছ্বাস

লিখিয়া থাকেন। আমরা "অজ-বিলাপে" এই শোক পাই। "এলিজি"
"ইন্ মেমরিয়াম্" "এষা" ইত্যাদি এই শোকের সাহিত্য। কিন্তু যিনি
মরিয়া গেলেন তাঁহার শোক কি প্রকার? তিনি ত নিশ্চয়ই স্বর্গে বাস
করিতেছেন। তাঁহার মর্ত্ত্যের বিরহী বা বিরহিণী এইরূপ ভাবিতে বাধ্য।
কিন্তু স্বর্গেও কোন প্রকার বিরহ দুঃখ নাই কি? সেই মরা বিরহী বা
বিরহিণীর হৃদয় কিরূপ? সাধারণতঃ সাহিত্যে বা শিল্পে সেই হৃদয় আমরা
দেখিতে পাই না। এই হৃদয় একজন পুরাণা চীনা কবি খুলিয়া দিয়াছেন
দেখিয়াছি। উ-কুমারী ৎজেয়ূর ভুত তাঁহার মর্ত্ত্যবাসী প্রাণেশকে স্বর্গ-
বাসিনীর বিরহ ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইবার পো-চু-ই আর একজন
স্বর্গবাসিনীর চেরা বুক খুলিয়া ধরিতেছেন। সেই বুকে জ্যান্ত মানুষেরই
শিরা কৈশিরা দেখিতে পাই। স্বর্গের লোকেরাও মানুষের ভালবাসাই
চায়—এবং মানুষের মতনই ভালবাসিতে চায়। "স্বর্গীয়" প্রেম মর্ত্ত্যের
গন্ধরসেই ভরা। বিরহের অবস্থায় জীবন্ত রাধার আত্মা যে কথা বলে
সেই কথাই তাইচেনের ভুত বাদশার দূতকে বলিতেছেন। তাহার সার
মর্ম্ম :—

"এই পরাণের আশা নয়নের তৃষা
চরণের তলে রেখে আয়।
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখি জল।"

দুনিয়ার নূর প্রিয়তমের দূতের মারফত খবর পাঠাইতেছেন। নিজের
অবস্থাও বিবৃত হইল—আর কিছু বরাত ও দেওয়া হইল।

কাতর কণ্ঠে কহে :—"আমি
কৃতার্থ বাদশার স্মরণে;
কাল মোর কাটিতেছে শোকে

কল্পান্ত-স্থায়ী অত্যাচার।
তার মূর্ত্তি বাণী বিহনে।
মর্ত্ত্যে মোদের প্রেমের আয়ু
ফুরায়েছে অতি সত্বর ;
স্বর্গে কিন্তু সুখ সোহাগ কাল
চলিবে যুগ যুগান্তর।”
এই কথা বলি সুন্দরী
ঝুঁকে তাকায় ধরার দিকে ;
দেখা গেল না রাজধানী
ধুলা কুয়াসার গতিকে।
তার পর সে করিল বাহির
স্মারক অমর ভালবাসার,—
আল্‌পিন এনামেলের সুশ্রী
আর চুলের কাঠি এক সোনার।
“হৃদয়-নাথের তরে এই মোর
অন্তরের দান লহ” সে কয় ;
চুলের কাঠি সে আধখানা,
আর আলপিনের আধখানা লয়।
নিজ হাতে ভাঙ্গি সোনার শিক্
দুই টুকরা করি এনামেল,—
সগৌরবে কহে দূতে
উপাড়ি জোরে হৃদের শেল।
“বাদশারে বোলো রাখিতে
চিত্ত শক্ত সাহস ভরা,
এই সোনার শলাকা যেমন

আর দৃঢ় এনামেল টুকরা।
তাহলে কখনো একদিন
হবেই হবে মোদের মিলন,
হয়ত বা স্বরগ লোকে
কিম্বা যেথা নশ্বর জীবন।"

তাইচেনের বাণী ক্রমশঃ গুরু গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। বুকের আগুন শেষ পর্য্যন্ত চাপা থাকিল না। প্রেমের শত্রুদিগের অত্যাচার কাহিনী ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। তাইচেন সে কথা মুখে আনিতেছেন না। কেবল আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তাঁহার হৃদয় হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। পো চুই এই বিষাদের কাহিনীটা অগ্নি স্ফুলিঙ্গে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাই-চেনের অভিশাপে গোটা দুনিয়া যেন যুগ যুগান্তর ধরিয়া জ্বলিতে থাকিবে।

বিদায় কালে ওস্তাদেরে
কয় সে কত হৃদয় কথা
বাদশার কওয়া প্রেমের বাণী
প্রিয়ার কাণে অমৃত যথা।
অনেক কথার একটা কথা
বলা হ'ল সর্ব্বশেষে,
প্রেমিক দুয়ের হৃদয়ের ধন
রত্ন সমান অমূল্য সে।
সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে
নিশীথে "অমর মহালে"
বাদশা দিয়েছিল পণ
তাইচেনেরে অন্তরালে :—
চল্‌ব সদা গাঁথা দুয়ে

এক ডানা-ওয়ালা পাখীর প্রায়,
জোড়া রয় মরদ মাদীর ডানা
আকাশে যখন উড়ে যায়।
কিম্বা মোরা উঠ্‌ব বেড়ে
এক দেহে সেই গাছের মত
শাখায় জড়া জড়ি যাহার,
প্রাণে প্রাণে গিট্‌ সতত।'
কত কালের ধরিত্রী ঐ
এই স্বর্গ কত পুরাতন!
একদিন কিন্তু দুয়ের হবে
প্রলয় ভঙ্গ ধ্বংস পতন।
অন্যায়ের সেই অত্যাচার ঘোর
মুছবে না কিন্তু কোন দিন,
নিদারুণ জুলুমের কথা
জগতে থাক্‌বে অন্তহীন।

যে কোন অত্যাচার-পীড়িত রক্তাক্ত হৃদয় হইতেই শেষের কথাগুলি বাহির হইতে পারে :—

কত কালের ধরিত্রী ঐ
এই স্বর্গ কত পুরাতন!
এক দিন কিন্তু দুয়ের হবে
প্রলয় ভঙ্গ ধ্বংস পতন।
অন্যায়ের সেই অত্যাচার ঘোর
মুছবে না কিন্তু কোন দিন
নিদারুণ জুলুমের কথা
জগতে থাক্‌বে অন্তহীন।

এই কথাগুলি দুনিয়ার যে কোন ট্র্যাজেডি নাট্যের ভিতরকার কথা। জগতের প্রত্যেক বিষাদাত্মক বেদনামূলক রচনার ইহা চরম উপদেশ। এই উপদেশেই মানুষের চিত্ত আগুনে পোড়ান সোনার মতন পাকা হইয়া উঠে। হৃদয়ের ময়লা দূরীভূত হয় অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইতে থাকে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের এইরূপ ফলই প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের চীনা কবিবর একটা ছোট গল্পের উপসংহারে সেই কথাই জানাইয়াছেন। আর গল্পের ভিতরেও সেই কথাটা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাগাড়ম্বরহীন শিল্পনৈপুন্য পূর্ণ বিষাদ কাহিনীর একটা সেরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা পোচুইয়ের "কল্লান্ত স্থায়ী অত্যাচার"টুক সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারি।

মরা বিরহিনীর হৃদয় চীনা কবিতায় দেখিলাম—এইবার ইংরেজি কবিতায় দেখা যাউক। রসেটির সুপ্রসিদ্ধ "ব্লেসেড ড্যামোজেল্" বা "স্বর্গের বালিকা" এই বিরহ দুঃখের চিত্র। রসেটি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানের সুসংরচিত আবেষ্টনের ভিতর তাঁহার বিরহিণীকে রাখিয়াছেন। পোচুইয়ের রচনায় তাও ধর্ম্মীদিগের আবেষ্টন দেখিয়াছি। কিন্তু দেখিতে পাইব যে, দুই আবেষ্টনের ভিতর এক নারী-হৃদয়ই কথা কহিয়াছে। "ব্লেসেড ড্যামোজেলে"র কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

স্বরগের বালা দাঁড়ালো ঝুঁকে
ত্রিদিবের স্বর্ণ দণ্ডের উপর ;
আঁখিতে দৃষ্টি তার সূক্ষ্ম গভীর,
তুলনার হারে সাঁঝের শান্ত সরোবর।
করে তার শোভা পায় তিনটি কমল
চুলে ছিল সাতটি তারা মনোহর।

মেরীর দান সদা গোলাপ পোষাকে তার,
স্বরগের গায়িকা দলে তাহার স্থান।
পীঠে পড়েছে ঝুলি চুল রাশি তার
সোণালী বরণ তার পাকা শস্যের সমান।

* * * *

"মনে হয় সাধ সে আসুক মোর কাছে,
আসিবে সে নিশ্চয়" কহিল বালা।
"নিস্ফল কি প্রার্থনা মোর ত্রিদিবে?
সেও কি কাঁদে না, দেব ধরায় উতলা?
দুই প্রার্থনার শক্তি নয় কি অসীম?
তবে কেন মতি মোর রবে চঞ্চলা?
স্বর্গের জ্যোতি যবে তার শির ঘিরিবে,
আর সাদা পোষাক পরা রবে তার,
হাতে ধরে' তারে লয়ে যাব সাথে
দিব্য আলোকের গভীর ঝরণার ধার;
সেথায় নেমে যাব যেন দরিয়ায়
লইতে চোখের সামনে জগৎ পিতার।
সেথায় দেউল পাশে দাঁড়াব দোঁহে—
অজানা অবুঝা গূঢ় সে মন্দির,
বাতি তার অনিবার লভে আঘাত
যত বার প্রার্থনা ধরা বাসীর।
দেখ্‌ব পূর্ণ এবে সাবেক কামনা দুয়ের,
আর লয় তাদের, নাশ যেন ক্ষুদ্র মেঘ-রাশির।

"হয়ত তখন সে রবে আবেগে অবাক্!
কপোলে তার মোর কপোল রাখি
জানাব মা মেরীরে প্রেম আমাদের,
ভয়ে বা সরমে কথা না মাখি;
মঞ্জুর করবেন মা মোর হৃদয় গরব
আর খেয়াল আমার শুনবেন হয়ে সুখী।

"তাঁরি সাথে যাব ছুয়ে হাতে হাত
মিলায়ে ভগবৎ সকাশে যেথায়
অগণিত দিব্যদৃষ্টি নতজানু
ঋষিগণ রহে, প্রভামণ্ডল মাথায়;
বাজাবে সেতার বাঁশী বিদ্যাধরগণ
আর গায়িবে পেয়ে সাক্ষাৎ মোদের সেথায়;
সেথানে মাগিব বর দেব খৃষ্টের
আমাদের দুজনারই তরে,
থাকৃতে যেন পারি, ছিনু কিছু কাল
যেমন ধরায়, ভালবেসে হৃদয় ভরে'।
দুজনার সহবাস, (ক্ষণিক ধরায়),
থাকুক্ হেথায় এবে চিরকাল ধরে'।"

চীনা স্বর্গ-বাসিনীর হৃদয়ে যে কামনা খৃষ্টান স্বর্গ-সুন্দরীর প্রার্থনাও তাই। দুনিয়ার সকল মরা বিরহিনীর ইচ্ছাই এইরূপ:—

"থাকৃতে যেন পারি, ছিনু কিছু কাল
যেমন ধরায়, ভালবেসে হৃদয় ভরে'।
দুজনার সহবাস, (ক্ষণিক ধরায়),
থাকুক হেথায় এবে চিরকাল ধরে'।"

মর্ত্ত্যের ভালবাসাই লোকেরা স্বর্গেও লইয়া যাইতে চায়। মানুষের হৃৎ-পিণ্ডটা স্বর্গে ও মর্ত্ত্যের প্রণালীতেই ধড়ফড় করে। স্বর্গে গেলে পর হৃদয়ের স্পন্দন যদি অন্যরূপ না হয় তাহা হইলে ঢেঁকি বেচারা স্বর্গে যাইয়াও ধান ভানিবে তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? স্বর্গটা মর্ত্ত্যেরই ছায়া, মর্ত্ত্য স্বর্গের ছায়া নয়। ভগবান্ মানুষের সৃষ্টি, মানুষ ভগবানের সৃষ্টি নয়। দুনিয়ার এক মাত্র সত্য বস্তু মানুষ—জীবন্ত মানুষ—রক্ত মাংসের শরীরওয়ালী হিংসাভালবাসাওয়ালা, সু-কু-ভরা দোষে গুণে সম্পূর্ণ মানুষ।

চীনা প্রেমের চরম কথা,—

"তা হলে কখনো একদিন
হবেই হবে মোদের মিলন।"

খৃষ্টান প্রেমেরও চরম কথা;—

"দুজনার সহবাস * **
থাকুক হেথায় এবে চিরকাল ধরে"।

আর হিন্দু প্রেমেরও চরম কথা এই অনন্ত সাহচর্য্য, জন্মজন্মান্তরের বন্ধন যুগযুগান্তরব্যাপী হৃদয়-গ্রন্থি, আত্মায় আত্মায় চিরকালের অচ্ছেদ্য সংযোগ। "ভূয়ো যথা মে জননান্তরেহপি ভূমের ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।"

তাহা হইলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যে প্রভেদ থাকিল কোথায়? কুসংস্কারে। কুসংস্কারের উৎস কোথায়? মানুষের ভাষায়। আর কোথায়? দেশের জলবায়ুতে। আর কোথায়? রাষ্ট্রে অর্থাৎ "স্বদেশ"-নিষ্ঠায়। কুসংস্কার কোন দিন দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইবে কি? কখনই না। কুসংস্কারের জোরেই মানুষ বাঁচিয়া আছে। কুসংস্কার না থাকিলে জগৎ মানুষ হীন হইয়া পড়িবে—সে জগতে মানুষের বাঁচা না বাঁচা এক্ক কথা—সে জগৎ পড়িয়া যাইবে।

দুনিয়ার মানুষ এক। কিন্তু এই ঐক্য বুঝিয়াও মানুষেরা কোন দিন বুঝিবে না। এই না বুঝা একটা মস্ত "অবিদ্যা"। এই অবিদ্যার ক্রমবিকাশেই দুনিয়ার ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর গঠিত হইবে। প্রত্যেক স্তরেই নূতন নূতন মনগড়া অলীক অনৈক্যের আস্ফালন দেখিতে পাইব। "বিদ্যার" মাত্রা যে পরিমাণ বাড়িবে সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যার মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে অমৃতলাভ কোনদিনই হইবে না। না হউক। মানুষ অমৃতের তোয়াক্কা রাখে না। তিনি স্বর্গেই থাকুন।

চীনা কবিদের প্রকৃতি-নিষ্ঠা।

এই পর্য্যন্ত প্রায় হাজার লাইন চীনা কবিতা দেখা গেল। নানা রসেরই আস্বাদন করা গিয়াছে। সকল রসেই প্রকৃতি কিছু না কিছু ভিজান পাইলাম। চীনা কাব্য চাখা সুরু করিতে না করিতেই প্রকৃতির গন্ধ পাওয়া যায়। চীনারা প্রকৃতি-নিষ্ঠ জাতি।

ঝালে ঝোলে অম্বলেনুণ সর্ব্বত্রই বিরাজ করেন। চীনারা সেইরূপ শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে প্রকৃতির চর্চ্চা করিয়া থাকে। প্রকৃতির অংশ বাদ দিলে বোধ হয় চীনা কবিতার বার আনা বাদ পড়িবে। শোক সাহিত্যে প্রকৃতি পাইয়াছি—হর্ষ সাহিত্যেও প্রকৃতি পাইয়াছি। খেয়ালে খোসগল্পে প্রকৃতি পাইয়াছি—বনবাসে নির্ব্বাসনে প্রকৃতি পাইয়াছি—যুদ্ধ যাত্রায় প্রকৃতি পাইয়াছি—বিরহে প্রকৃতি পাইয়াছি—মিলনে প্রকৃতি

পাইয়াছি। চীনের সকাল দেখিয়াছি—মধ্যাহ্ন দেখিয়াছি, সন্ধ্যা দেখিয়াছি, নিশীথ দেখিয়াছি। চীনের শরৎ দেখিয়াছি, বসন্ত দেখিয়াছি, গ্রীষ্ম দেখিয়াছি, শীত দেখিয়াছি, আর বৃষ্টিপাতও দেখিয়াছি। চীনের নদীর ধার চোখে পড়িয়াছে, স্যাঁত স্যাঁতে জঙ্গলা বনভূমি চোখে পড়িয়াছে; বিকট মরু প্রান্তর চোখে পড়িয়াছে, বাগবাগিচা চোখে পড়িয়াছে। চীনা আকাশের গ্রহ নক্ষত্র রবি শশী চোখে পড়িয়াছে—চীনা ধরাতলের মাছি মশাও চোখে পড়িয়াছে।

চীনা কাব্যে ফাল্গুনের ঘ্রাণে পাগল-করা আমের বন পাই নাই। পাইয়াছি পীচ্ পেয়ারের ফুলের খোসবই। ক্রৌঞ্চ-মিথুন, অথবা চক্রবাক-যুগল অথবা চকোর চকোরী চোখে পড়ে নাই। পড়িয়াছে ম্যাণ্ডারিণ হংস ও ম্যাণ্ডারিণ হংসী। তমালপাশে কনকলতা চীনে দেখা গেল না। দেখা গেল শাখায় শাখায় জড়াজড়িওয়ালা এক বিচিত্র তরুবর। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে আর চীনের প্রকৃতিতে বোধ হয় এইটুকুই প্রভেদ। খুঁজিলে অবশ্য আরও অনেকই পাওয়া যাইবে। কেন না চীনের আয়তন সুবৃহৎ। কাজেই চীনা কাব্যে অনেক নূতন তরুলতা জী-জন্তুর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য যাহা কিছু সবই আমাদের যেন ঘরের কথা।

চীনা কবি জোনাকির মিটি মিটি আলো দেখাইয়াছেন—মাছরাঙার উড়া দেখাইয়াছেন—আকাশের গায়ে হাঁসের ঝাঁক দেখাইয়াছেন। চীনা গ্রীষ্মের সারস ও "গাল," চীনা শরতের পদ্ম ও কুমুদ, চীনা আকাশের ছায়াপথ, চীনা সূর্য্যাস্তের গোলাপী আভা, চীনা জলাশয়ে গিরিশৃঙ্গের প্রতিবিম্ব, চীনা চাঁদের রজতকিরণ, চীনা বর্ষার ঝম ঝম, চীনা নিশীথের পেঁচার ডাক, চীনা মরুর ভীষণ পবন, চীনা মেঘের কালো বরণ, চীনা জলাশয়ে নলের বন, চীনা সাঁঝের খগ কাকলী, চীনা দরিয়ায় নৌকার

সারি, চীনা শস্যের মধুর হাসি—সবই দু একবার পাইয়াছি। আর এই সবই বাঙ্গালীর সুপরিচিত। পাহাড়ের সবুজ রং, নীল রং, ভীষণ দৃশ্য, কমনীয় দৃশ্য, জলাশয়ের ভীমামূর্ত্তি, মধুর রূপ, আর চাঁদের বাহার—এ গুলিও আমাদের নূতন নয়।

চীনা হৃদয়ে প্রকৃতির কোন্ কোন্ বস্তু সব চেয়ে বেশী আদরের? প্রশ্নটার জবাব দেওয়া কঠিন। কিন্তু চিত্রশিল্পের বহু নমুনা দেখিয়া আর কাব্যের প্রমাণ লইয়া মনে হয় যে, বাঁশের সারি অথবা ঝোপ, চীনাদের অতি প্রিয়। পাহাড়ের শোভা নানা ভাবে ইহারা উপলব্ধি করিয়াছে। দরিয়ার দৃশ্য যেন চীনা পারিবারিক চিত্রের একটা আট-পৌরে জিনিস। হংস মিথুন চীনা দাম্পত্য জীবনের পরম পবিত্র বস্তু বলাই বাহুল্য। এমন কি বিবাহের সময়েও বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ এক জোড়া হংস হংসী অদল বদল করিয়া থাকে। মেপ্‌লতরুর লালপাতার কথা বোধ হয় ইহারা বেশী পাড়ে না—কিন্তু পীচের গন্ধ শুঁকিতে ইহারা যারপর নাই লালায়িত। আর মাছ ধরা এবং শিকার করার সখ চীনা জীবনের একটা মস্ত খেয়াল।

"আম জাম নারিকেল খেজুর কাঁঠাল, চাঁপা শেফালিকা বক তমালের ঝাড় সারি সারি আছে বন করিয়া আঁধার।"—ইত্যাদির তালিকা করিয়া গেলেই প্রকৃতিনিষ্ঠা প্রমাণিত হয় না। অবশ্য এই ক্যাটালগেরও মূল্য আছে। কাব্যের কোন কোন স্থানে এইরূপ এক তালিকার দাম লাখ টাকা। কিন্তু চীনা কবিরা জীবজন্তু ও তরুলতার নাম বা তালিকা করিয়াই সন্তুষ্ট নন। ইহাঁরা এই গুলির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ নানা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে "চাখিয়া" দেখিয়াছেন। ইহাঁদের দেখিবার ক্ষমতা আছে—এক একটা বস্তুকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতা আছে—নিজের জীবন মাখাইয়া প্রাকৃতিক পদার্থগুলিকে জীবন্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে।

চীনা কাব্যের ভিতর আসিয়া নদ নদী পর্ব্বত সাগর তরু লতা পশু পক্ষী আমাদের মানব সংসারেরই অধিবাসী হইয়া রহিয়াছে। এক একটা মানুষ জগতে তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব লইয়া দণ্ডায়মান। একবার যাহাকে দেখিব তাহাকে ভুলিতে পারিব না। প্রত্যেক নরনারীরই একটা বিশেষত্ব, নিজস্ব কিছু না কিছু আছে। আমরা চীনা কাব্যের প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকেও ঠিক সেইরূপ ব্যক্তিত্বময় স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নিজস্বভরা ভাবে পাইতেছি। এক জলাশয়ে আমার আত্মা যাহা পাইল, অন্য জলাশয়ে তাহা পাইল না। এক সন্ধ্যায় আমার হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল অন্য সন্ধ্যায় সে তরঙ্গ উঠিল না। চীনা কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মাথাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকটাকে স্বতন্ত্র দেখিতেছি। কোন সময়ে চাঁদ আমার এক গেলাসের ইয়ার—কোন সময়ে চাঁদ দেখিবা মাত্র দেশের কথা মনে পড়ে। নিশীথে কোথাও বা খানা পীনা ভোজ, কোথাও "দুখিনীর আঁখিতে বরষা দ্রবে।" ফড়িং দেখিয়া একবার মনে হইল "আহা কি মজার জীবন।" আর একবার মনে হইল "ক দিনের প্রাণ?" একটা ফুল রাখিয়া দিলাম অসংখ্যবার "ছাড়াছাড়ির বেদনা" মনে করিবার জন্য। ফুলটা অমর হইয়া রহিল। আর একটা ফুল ইয়াংসিকিয়াঙে ভাসিয়া কতদূর যাইতেছে কে জানে? অমনি ভাবিলাম "দুনিয়ার চরম সত্য কখনও বুঝা যাইবে কি?" কাকের পাখা চোখে পড়ে সুন্দরীর চুল তার চেয়েও কালো সপ্রমাণ করিবার জন্য। আর পাখীর সন্ধ্যাকালে বাসায় ফেরা দেখে মনে হয় "হায় আমি একাকিনী!" পদ্মবীজের লাল কেন্দ্র দেখিতেছি কেন? ওটা আমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়েরই জুড়িদার বলিয়া। বায়সকে দূত করিতেছি—মেঘকে দূত করিতেছি—হংসীকে দূত করিতেছি। ইহারা সকলেই বিরহের সহচর। গগনমণ্ডলে দেখিতেছি হয় গান বাজনার সঙ্গত, না হয় প্রেমিক-যুগলের আড্ডা। সহরের বাহিরে

আসিবামাত্র নিজ শরীরে মুক্ত বায়ুর প্রভাব বুঝিতেছি—মাঝিরা সারি গান ধরিতেছে। চীনা প্রকৃতি-সাহিত্যে কবিদের চামড়ার চোখ কানও দেখা গেল—আবার "মরম" হৃদয়, প্রাণ এবং ধরা ছোঁয়া যায় না যাহা সেই আত্মাও পাওয়া গেল। অতএব চীনা কবিরা দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবির সভায় বিনা বাক্যব্যয়ে কুলীনের প্রাপ্য পান সুপারি দাবি করিতে পারেন।

এতক্ষণ যে সকল কবিতা দেখিয়াছি সেগুলি পুরাতন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরের কোন নিদর্শন পাই নাই। এক্ষণে একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয় সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইটা লিখিত। চীনে সরকারী চাকরী পাইতে হইলে কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া পার হইতে হয়। ছাত্রেরা কবিতা রচনায়ও পাশ হইতে বাধ্য। এই কবিতাটী একজন কৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীর রচনা। কবিতার নাম "ছাত্রের পর্য্যটন।" ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের "নাটিং" কবিতার যে ভাব ইহারও তাই। বস্তুতঃ ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের প্রকৃতি-"পূজা" এই চীনা কবির প্রকৃতি-পূজা হইতে গভীরতর নয়। চীনা কবিতাকে প্রকৃতিপূজক মাত্রেই তাঁহাদের "ওঁ" স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। প্রকৃতিকে জীবন্ত সহচরী বিবেচনা করা, প্রকৃতির প্রভাবে জীবন গঠন করা, ইত্যাদি সকল তত্ত্বই এই রচনায় সংক্ষেপে পাইতেছি।

"বাঁধা থাক্‌তে পারল না আর নীল চাঁপ্‌কান্-আঁটা ছাত্রের দল,
দপ্তর খানায় কেতাব নিয়ে আর ছিপ্ হাতে নাড়্‌তে নদীর জল।
নীল আকাশের মরকত ছুঁয়ে সাদা মেঘের মেষ বিচরে,
চোখের চটক্ রঙ-বেরঙে বসন্তের হাত ধরনী পরে।
হৃদয় তাদের আকুল আজ চাখ্‌তে তাজা নূতন জীবন,
ভাণ্ডার হ'তে প্রকৃতি মায়ের আন্‌তে কার শক্তি রতন।

ছাড়ল তারা পুঁথি-পত্র, টোল মাদ্রাসার তকিয়া ফরাস্ ;
বেরুলো তারা ছুটা-পুটি কর্তে পায় যেথানে সবুজ ঘাস।
ক্রোশের পর ক্রোশ চলে তারা বসে' কোথাও গাছের তলায়,
কোথাও কুল্-কুলু নদীর ধারে কোথা বা গিরির ঝোরার গায়।
কানে তাদের দরিয়ার গান, নিঃশ্বাসেতে মধুর পবন—
পশলার পরে তাজা ঘাসে, ধরায়, ফুলে যাহার বহন।
জমিন্ পরে পাহাড় বিরাট্ ; উর্দ্ধে আশ্মানের অসীম ওসার ;
দুনিয়ার এই চিড়িয়া খানায় জ্যান্তে জীবের হরেক বাহার ;
চলার, বসার, মরার, বাঁচার— সবারই ভিতর শক্তি রাজে,
তারই ফলে সিজিল্ মিছিল্ যেথায় নইলে গোল-মাল বাজে
দেখে শুনে ভেবে বুঝে চমক্ তাদের লাগ্ল প্রাণে ;
মাতাল হ'য়ে ছুট্‌লো রক্ত শিরায় শিরায় বানের টানে।
স্বর্গের কথা, মর্ত্ত্যের জিনিষ,— আজকে এসব হ'ল নিজের,
এমনতর আপনার এ সব কথনো বুঝা হয় নি তাদের।
বিশ্বেশ্বরের পূজা কালেও পায়না মানুষ এমন জীবন,
হ'লই বা দেউল শ্বেতপাথরের কিম্বা পল্লীর দেবায়তন !"

প্রকৃতির সতেজ ফোয়ারায় স্নান করিয়া ছাত্রেরা ঘরে ফিরিতেছে। এই পর্যটনের প্রভাব জীবনে থাকিয়া গেল। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের অনেক কবিতাই এই প্রভাবেরচিত্র। "লুসী," "ড্যাফোডিল্স," "হাইল্যাণ্ড গার্ল," "সলিটারি রীপার," "এডুকেশন অব নেচার" ইত্যাদির নাম সুপরিচিত।

অবশেষে অনিচ্ছাতে ফির্ল তারা ঘরের দিকে ;
কিন্তু তারা ভুল্‌বে নাক পূজ্‌তে প্রকৃতি দেবীকে।
পথে পড়্ল অনেক অনেক লম্বা "সরল"-গাছের বন্

আর স্রোতস্বতীর কুলে কুলে "উইলো" কত কালো বরণ।
অনেক কালের চাপা হৃদয় এতক্ষণে খুল্‌ল দুয়ার;
গলাছেড়ে গায়িল তারা নামজাদা গান সব বার বার।
কথনো তারা গায় দল বেধে একা একা বা কথন গায়,
তালে তালে আওয়াজ তাদের সাঁঝের বাতাস বয়ে নে যায়।
শুনে তাদের গানের ধ্বনি গাঁ-পুকুরের দরিয়ার
চাঙ্গা হয় চিড়িয়া সকল ভেঙে গ্রীষ্মের তন্দ্রা ভার!
ছোঁড়ার দলের গানের তালে গাওয়া সুরু করে চাষীর দল,
গেয়ে গেয়ে দিনকে বিদায় দেয় এইরূপে ধরাতল।
কীট পতঙ্গ বিহগ সবে এরাও দেয় যোগ সন্ধ্যাগীতে,
সবার গীতই পূর্ণ এবে বিশ্বপতির জয় ধ্বনিতে।
পশ্চিমেতে আস্তে আস্তে রবি ডুবে যায় ধরায়,
অমরদিগের রাজ্য এবে উঠল জ্বলে আলোর মালায়।
বেদিস্থান হ'বে প্রকৃতির খস্‌ল পূত গোলক বহ্নির,
উচুঁ খেয়াল আর নয়া রোশ্‌নাই বাসিন্দা হইল ছাত্র হৃদির।

এই সুরের কবিতা ও গান চীনা সাহিত্যে প্রচুর। সুরটা নিতান্তই আধুনিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রোমাণ্টিক আন্দোলনের প্রভাবে এই সুর পাশ্চাত্য মহলে উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই সুর ছিল না। সাবেক কালের প্রকৃতিসাহিত্যে এই রস পাওয়া যায় না। প্রকৃতিকে খোলাখুলি শিক্ষয়িত্রী ও প্রিয় সখী বিবেচনা করা বর্ত্তমান ইয়োরোপের পক্ষে নূতন বস্তু।

"দেখে শুনে ভেবে বুঝে চমক তাদের লাগ্‌ল প্রাণে,
মাতাল হ'য়ে ছুট্‌ল রক্ত শিরায় শিরায় বানের টানে।"

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ গানে প্রচার করা প্রাচীন ও

মধ্যযুগের এশিয়ায় অসংখ্য হইয়াছে। ইহা এশিয়াবাসীর এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ও প্রথম স্বীকার্য্য তত্ত্ব।

রোমান্টিক সাহিত্যের প্রকৃতি জীবনময়ী। জীবনময়ী বলিয়া মানুষের মত প্রকৃতিরও সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ আছে। আর এই জন্যই সে মানুষের সুখ দুঃখের সমবেদনা প্রকাশ করিতে সমর্থ। এই জন্যই সে মানুষকে হাসাইতে নাচাইতে কাঁদাইতে পারে। এই জন্যই তাহার প্রভাবে মানুষ জীবন গঠন করিতে সমর্থ। এই সকল কথা আমাদের রামায়ণে গোটা কালীদাসী সাহিত্যে এবং মধ্যযুগের পদাবলীতে মুড়ী মুরকীর সমান মামুলি। বিলাতের ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ ইয়োরোপে এই তত্ত্ব নূতন প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতিকে মানুষের জন্য ইস্কুল মাষ্টারণী করিলে জীবনের বিকাশ কিরূপ হইবে তাহার নানা চিত্র ইনি দিয়াছেন। একটা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বালিকার খেলা হবে হরিণীর প্রায় ;
শ্যামল প্রান্তরে অথবা পাহাড়ে
মাতিয়া আনন্দে যে হরিণী লাফায়।
তুফান উঠিলেও কাঁপাতে ধরায়,
সুষমা দেখিবে বালা সে কাঁপায় ?
কুমারীর অঙ্গ উঠিবে গড়িয়া
তুফানের সাথে তার নীরব ভালবাসায়।
হর্ষ সুধু প্রাণ-বাড়ান বালার হিয়ায়
থাক্‌বে ; তাতেই পুষ্ট হবে বাড়্‌তি-গরিমা ;
কুমারীর বক্ষ ও স্ফীত হবে তায়।"

এই ধরণের কুমারী জীবন ভারতীয় সাহিত্যে অনেক। চীনা "ছাত্রের পর্য্যটনে" ও এই আকাঙ্ক্ষাই পাইলাম।

"হৃদয় তাদের আকুল আজি চাথ্‌তে তাজা নূতন জীবন,
ভাণ্ডার হ'তে প্রকৃতি মায়ের আন্‌তে নব শক্তি রতন।"

"তাও"-সাধক কবিবর ছু-কুঙ্‌।

সাধক কবি, ভক্ত কবি, ধ্যানী কবি, যোগী কবি, তত্ত্বদর্শী কবি, ঋষি কবি, ইত্যাদি শ্রেণীর কবি ভারতবর্ষে হাজার হাজার। ইংরাজিতে এই শ্রেণীর কবিকে "মিষ্টিক" কবি বলা হইয়া থাকে। ইহাঁরা দুনিয়ার চরম তত্ত্বের আলোচনা করেন—কেবল আলোচনামাত্র নয়, জীবনে উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধির প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এবং শেষ কথা এইরূপ :—"আমি ও ভগবান্ এক বস্তু। সেই ভগবানে আমি ডুবিয়াছি—অথবা ভগবান্ আমার মধ্যে দেখা দিয়াছেন। আমার আত্মা সেই বিরাট আত্মায় লয় প্রাপ্ত হইল। আমি অনন্ত সুখে ভাসিতেছি। আমি মুক্তি-লাভ করিয়াছি।" এই মুক্তির ব্যাখ্যা, এবং এই মুক্তিলাভের উপায় বর্ণনা করা, সাধক কবিদিগের রচনায় স্থান পায়। কখন বা দেখি যে, "মুক্ত" জীব নিজের অবস্থাটার বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। মুক্ত অবস্থার খেয়াল ধারণা এবং চিন্তাপ্রণালী সেই সকল বর্ণনায় আমাদের নিকট খানিকটা বোধগম্য হয়।

বাঙ্গালী অন্যান্য সকল সাধককে ভুলিলেও, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদকে কোন দিনই ভুলিতে পারিবেন না। সেইরূপ চীনারাও তাহাদের হাজার-

হাজর সাধক কবির নাম ভুলিলেও, ছু-কুঙ্-তুর নাম ভুলিবে না এই ছু-কুঙ্ নবম শতাব্দীর লোক (খৃঃ ৮৩৪-৯০৮)। ইহাঁকে চীনা সাহিত্যে "তাঙ্ আমলের শেষ কবি" বলা হইয়া থাকে।

সাধনার নানা সাম্প্রদায়িক নাম দুনিয়ার সকল দেশেই আছে। মোটের উপর, সকল সম্প্রদায়ই শেষ পর্য্যন্ত একই সাধনতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ছু-কুঙ্ "তাও"-ধর্ম্মের অনুমোদিত সাধন-প্রণালীর প্রচারক। "তাও" শব্দের অর্থ "পথ"। আমরা "পন্থাঃ" শব্দ আধ্যাত্মিক সাহিত্যে যে অর্থে ব্যবহার করি; "তাও" শব্দের অর্থও তাহাই। রামপ্রসাদকে "কালী" সাধক বলিয়া জানি। চীনের কবিবর সেইরূপ "তাও" সাধক। ইনি "তাও" বা পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

"আমার আমার করি'মত্ত হই অনিবার;
ইন্দ্রিয়াদি দারা-সুত কেহই নহে কার!
কিন্তু আমি কোন্‌খানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
কোন্ পথেতে গেলে, দে মা বলে, 'আমি' মেলে
দীন রামে আর ভ্রমে রেখো না নিস্তারিণী!
তনয়ে তার তারিণি!"

এইরূপ সকল সাধকই কাঁদিয়া থাকেন—"কোন্ পথেতে গেলে, দে মা বলে' 'আমি' মেলে"। কেহ 'মা' 'মা' করিয়া হা-হুতাশ করেন, কেহ বা আর কোন নামে সেই অজানা, অবুঝা বস্তুকে ডাকিয়া থাকেন। ছু-কুঙ্ সেই "আমি" খুঁজিতেই বাহির হইয়াছিলেন। চীনাদের অন্যান্য বড় কবিদের মত ইনিও মহাপণ্ডিত, এবং দরবারের বড় চাকুরে ছিলেন। কিন্তু সংসার ভাল লাগিল না—ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। এই ধরণের সন্ন্যাসী হওয়া ভারতবর্ষেই একচেটিয়া নয়। চীনে হাজার-হাজার গৃহত্যাগী, ধ্যাননিরত, চোখবুজা, সাধক ভক্ত, ধ্যানী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর

তাঁহাদের অভিজ্ঞতায়-পাওয়া সত্যসমূহ সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছে। ছু-কুঙের বাণী শুনিলেই যে-কোন ভারতবাসীই বলিবেন—"এ যে হিন্দুর যোগের কথা! অথবা "এ যে কবীরের উন্মাদ!" অথবা "এ যে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!" অথবা "এ যে বৈদান্তিক একত্ব!" ইত্যাদি। বস্তুতঃ, উহা বৈষ্ণবও নয়, শাক্তও নয়, শৈবও নয়,—উহা সাধনপ্রণালী। দুনিয়ার চরম তত্ত্ব সর্ব্বত্রই এক প্রকার। তুমি-আমি চরম তত্ত্ব পছন্দ না করি—সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু চরম তত্ত্ব ভাবিতে গেলে, খৃষ্টান মিষ্টিক আর বৈষ্ণব প্রেমিক, চীনা তাও-পন্থী আর মুসলমান সুফী—এক ঘাটেই জল খাইবেন। কেহ হয় ত এই জলের নাম দিবেন, 'সিরাজী সরাব'; কেহ হয় ত বলিবেন, উহা 'প্রেম'; কেহ বলিবেন, "উহা ভগবান্ বা অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুবিশেষ" কেহ বলিবেন, "উহা তাও"; কেহ হয় ত বলিবেন—"উহা আমি"; কেহ বা বলিবেন—"উহা শূন্য"; আর কেহ বলিতে পারেন—"ব্রহ্ম, ওভার সোল বা ঐ জাতীয় কিছু।" নানা নাম দেওয়ার ফলে, ব্যাখ্যায় এবং "মুক্তির" স্বরূপ বর্ণনায় কিছু-কিছু পার্থক্য আসিয়াও জুটে।

ছু-কুঙের চব্বিশটা কবিতা পড়িলেই মনে হইবে—"তাই ত, এ ত ঠিক আমারই কথা! তবে কিছু যেন প্রভেদ আছে!" কবিতাগুলি জাইল্‌সের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে। কয়েকটার অনুবাদ ক্র্যান্মার বিঙ্ ও দিয়াছেন।

(১)

ছু-কুঙ্ অসীম শক্তির কেন্দ্রে পৌঁছিতে চাহিতেছেন।

শক্তিরে উড়াও কেন বাহিরের কাজে?
অন্তরের দুনিয়ারে কর ভরপূর।
যেতে হবে মহাশূন্যের রাজ্যে বন্ধনহীন;
তার তরে জমাও শক্তি সর্ব্বদা প্রচুর।

কেন্দ্র সে মুল্লুক গোটা দুনিয়ার ;
জবরদস্ত আঁধারে সে ঢাকা ;—
এ আঁধার মেঘে ভরা ; আর হেথা
তুফানের জোরে খাড়া না যায় থাকা।
বুদ্ধি ধারণার মুল্লুক নয় সে স্থান ;
নিজের সাথে লয়ে মাল চরম জ্ঞানের
পোঁছে সেথা বসিব খাতির জমা,
মস্‌গুল্‌ রোজ পেয়ে ভাগ অসীম ভাণ্ডারের।

(২)

চু-কুঙ্ নিবিড় শান্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

শান্তি সে রহে নীরবতায় ;
গিরিতে, মাঠে সে না রয় ;
অন্তর সুরে সে ধোয়া ;
উড়া একক পাখীর সঙ্গ সে লয়।
শান্তি ঠিক যেন বসন্তের বায়
পোষাক যে ফুলায় ফুৎকারে ;
শান্তি বাঁশীর আওয়াজ যেন
নিজের করতে চায় হৃদয় যারে।
না ঢুঁরে পেলে, কাছে সে
অতি ; ঢুঁরলে না দেয় ধরা ;
রূপ তার বদল হয় অনিবার,
ছেড়ে পলায় শান্তি ত্বরা।

(৩)

বসন্তের সমাগমে কবি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত হইতে দুনিয়ার রূপের সনাতন প্রভাব সম্বন্ধে কয়েক কথা বাহির হইল।

ভর্‌ল দুনিয়া বসন্তের দানে ;—
জঙ্গলা দেশের দীঘির ভিতর
কুমুদ, কমল জলের শোভা,
অতি রূপবতী বালিকা তায়।
ঝুঁকেছে পীচ গাছ সব পাতার ভারে,
ঝোঁপে নিঃশ্বাস ফুর্‌ফুরে হাওয়া,
নদী কিনারায় উইলোর ছায়া,
ছিঁড়িয়া সোণার বরণ সেথায়।
হিয়া মাতোয়ারা রূপের বশে ;
সুন্দরের পানে ছুটল দিল্ ;
অমনি চিত্ত উঠল ভরে'
রোজ তাজা এই পুরাণা কথায়।

এই পুরাণা অথচ তাজা কথাটা কি? প্রতি বৎসর বসন্তের আগমন? না চিত্তের উপর বসন্তের প্রভাব? যাহা হউক, এই কয় লাইনে বুঝা গেল যে, কবি সাময়িক ভোগে মগ্ন থাকিতে-থাকিতেই ধাঁ করিয়া "সনাতনে"র কথা ভাবিলেন। এইটুকুই মিষ্টিসিজ্‌ম্। প্রতি বৎসরই বসন্ত আসিয়া থাকে; এই উপায়ে জগতে চিরযৌবন বিরাজ করে। অথবা মানুষমাত্রেই সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হয়। এই কথাটার মধ্যে তেমন মারাত্মক গূঢ় "রহস্য" বিশেষ কিছু নাই, বলা বাহুল্য।

(৪)

প্রেমমুগ্ধ মানুষমাত্রেই বিরহেও মিলনের সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

প্রেমিকমাত্রেই এই হিসাবে ধ্যানী, বা যোগী, বা মিষ্টিক। প্রেম-সাহিত্য এই কারণে রহস্যময় বা মিষ্টিক সাহিত্য। সকল স্থলেই ভগবানে-মানুষে প্রেমের কথা বুঝিবার আবশ্যকতা নাই। চামড়ার শরীরওয়ালা মানুষে-মানুষে প্রেমের ধর্ম্মও এই। ছু-কুঙ্ এইরূপ প্রেম-"যোগ" সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখিয়াছেন। রাধার প্রেমযোগ, কবীরের প্রেমযোগ, সুফীর প্রেমযোগ, আর দান্তের প্রেম-যোগও এই বস্তু।

সবুজ"পাইনে"র কুঞ্জমাঝে খ'ড়ো কুটীর,
সূর্য্য ডুবে ঝরঝরে হাওয়ায় গড়িয়ে ;
পায়চারি কর্‌ছি এক্‌লা অনাবৃত শির,
ক্বচিৎ দু'একটা পাখী গায় র'য়ে র'য়ে।
কত দূরে আছে মোর প্রিয়া সুন্দরী !
হংসীর দল সেথা যেতে পারে না উড়ে ;
রয়েছে কিন্তু মোর গোটা হৃদয় ভরি
যেমন সেই সোনার কালে ; সে যায়নি ছেড়ে !
কালো মেঘ দরিয়ার উপর আঁধার বাড়ায় ;
চাঁদিনী-মাখন দ্বীপ ভাস্‌ছে জলে ;
(কিন্তু) বারিধারার বিরোধেও প্রেম না ভুলিয়া ;
মধুমাখা কথা মোদের এখনও চলে।

(৫)

একজন "আদর্শ" পুরুষ বা অসীম শক্তিসম্পন্ন বা অমর ব্যক্তির কথা বলা হইতেছে। তিনি মহা উচ্চ স্থানে বিরাজ করেন। আর তিনি অতি পুরাতন লোক। কোন "সত্যযুগে"র অবতার বিশেষ আর কি।

অমর সে যায় আত্মার বলে
করে ল'য়ে কমল;

অনন্ত কালে গতি তার
পথহীন শূন্যে তার চল্,
'সপ্তর্ষি' হ'তে চাঁদ আর সে
বেরিয়ে হাওয়ায় বেড়ায়;
হুয়া-পাহাড় আঁধার ভরা,—
তায় ঘণ্টা বাজে ধরায়।
মূর্ত্তি তার আর দেখা না যায়
মর-মুল্লুকের পার;
নামদার বাদশা হুয়াঙ্ আর যাও
ছাঁচে ঢালা তাহার।

হুয়াঙ্ বাদশাকে "পীত" সম্রাট্ বলা হইয়া থাকে। ইনি মান্ধাতার আমলের একজন নরপতি। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭০৪ হইতে ২৫৯৪ পর্য্যন্ত নাকি তাঁহার রাজত্বকাল। চীনা সভ্যতার অনেক গোড়ার জিনিষ তাঁহারই উদ্ভাবিত বলিয়া পরিচিত। য়াও (খৃঃ পূঃ ২৩৫৭—২২৫৮) চীনের রামচন্দ্র বিশেষ। রাজা ত রাজা য়াও রাজা! কাজেই এই দুইজন পুণ্যশ্লোক বাদশা সেই "অমর" পুরুষেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। "অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ।"

(৬)

ছু-কুঙ এইবার একজন প্রকৃতিনিষ্ঠ ব্যক্তির জীবন চিত্রিত করিতেছেন। এই বর্ণনাটা যে কোন ভাবুকের জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এখানে গভীর তত্ত্ব কিছুই নাই। তবে প্রকৃতি-পূজাটাই গভীর রহস্যময়!

জেড্ পাথরের কেটলিভরা বসন্তবাহার সরাবে,
কুঁড়ে ঘরের খ'ড়ো চালা ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিস্রাবে।
নীরবে বসিয়া আছে কুটীরের ভিতর ভাবুক ধীর,

ডাইনে-বাঁয়ে শোভা পায় তার বাঁশগাছ সকল দীর্ঘ স্থির।

বাদ্‌লা-কাটা আকাশের গায়ে
সাদা সাদা মেঘের বাস,
গাছের ঘন ঝোপের মাঝে
পাখীদের এখন মহোল্লাস।
সবুজ তরুর ছায়ার তলে
মাথা তাহার বীণার উপর,
শুনা যাচ্ছে উর্দ্ধ দিকে
নির্ঝরিণীর জলের ঝর্‌ঝর।
মর্ম্মরিয়ে পাতা পড়ে,
যা করবার নাই কেহ সেথা,
নিবিড় ধ্যানে মগ্ন কবি
"ক্রস্তান্‌থিমাম্‌" শান্ত যথা।
মাসের মাসের ফুলের গৌরব
চিত্ত তাহার ভরে' আছে,—
প্রকৃতির এই গ্রন্থ পাঠেই
জীবনের মূল্য তার কাছে।

(৭)

চু-কুং "চিত্ত শুদ্ধি'র প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, প্রণালীটা সবিশেষ বলা হয় নাই। "চিত্ত শোধন কর"—এই পর্য্যন্তই যেন দেখিতেছি।

ঝেড়ে নিতে হয় খনির লোহা;
সীসা ফেল্‌তে হয় রূপা হ'তে;
হৃদয় তোমার কর পরিষ্কার,—
ঝুটা ছেড়ে রাখো সাচ্চা অমল

সরোবর ময়লাহীন বসন্তের,—
সে যেন আর্শী তুনিয়ার ;
আত্মারে কর দাগহীন খাঁটি
চাঁদের কিরণে ছেড়ে যাও ধরাতল।
তাকাবে কেবল তারার পানে ;
হামেশা গায়িবে সন্ন্যাসীর গান ;
আজ্‌কার জীবন জেনো—ভাসা জল,
গত কল্যই ছিল চাঁদ উজ্জ্বল।

'গতকল্য' শব্দের অর্থ পূর্ব্বজন্ম। তখন আত্মা বিরাট আত্মার সঙ্গে বা মধ্যে ছিল। কাজেই, সেই জীবনটাই আসল জীবন। আর এই জন্মটা কিছুই না,—গড়িয়ে যাওয়া জলমাত্র। এই জন্যই কেবল তারার দিকে উঁচুতে তাকাতে হবে। এখানে মিষ্টিসিজ্‌মের মাত্রা দস্তুর মতই আছে। সীমায় সুখ নাই, অসীমেই সুখ। যদি মাতিতে হয় ত অনন্ত, চিরস্থায়ী, সনাতনে মাতো। উর্দ্ধদৃষ্টি হইবার তাৎপর্য্য এই। নির্ম্মল সরোবরের দৃষ্টান্তটা ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যে পরিচিত বস্তু। আর চাঁদের কিরণে আসা-যাওয়া আমাদের ধ্যানীদের মহলে খুবই জানা আছে। মোটের উপর, কবিতাটা হিন্দু জনসাধারণের মন মাফিক।

(৮)

ছু-কুঙ্ মানুষের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। আদর্শটা এই—"শক্তি অর্জ্জন কর ; শক্তিমান হও ; সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ হও। ভগবানের সাহায্যকারী হও। বিশ্বেশ্বরের পারিষদ্‌বর্গের অন্যতম হও।" অর্থাৎ যদি কিছু হ'তে হয়, ত হও তুনিয়ার ঈশ্বর ; অন্ততঃ পক্ষে, ইন্দ্র,চন্দ্র, বরুণ, যম বা ইঁহাদেরই একজন। এই আদর্শ ও লক্ষ্যই হিন্দুর চিন্তায় বিরাজ করিয়া থাকে। শক্তিপূজক হিন্দু অন্য কোন মক্কে বেশী মাতে নাই।

বাড়াও চিত্ত ঐ শূন্যের সমান ;
কেড়ে লও বিরাট রামধনুর প্রাণ ,
উড়ে যাও উ-পাহাড়ের চূড়ায়
মেঘ সনে ; দৌড়ে পিছে ফেলে বায় ;
পান কর আত্মার রস, তেজ কর ভোগ,
রোজ জমাও এই আর কর প্রয়োগ।
হও হর্ত্তা-কর্ত্তা বিশ্বশক্তির;
জগদীশ-প্রায় রাখ শক্তি স্থির।
আকাশ-পৃথিবীর হও জুড়িদার,
মালিক—ছনিয়ার ভাঙ্গা-গড়ার।
সবারই তেজ তুমি কর মজুত,
নিজ জীবন সদা রাখ্‌তে মজবুত।

শক্তি সাধারণতঃ "স্থির" থাকে না। খরচ করিতে-করিতে তেজ কমিয়া যাইবার কথা। কিন্তু জগদীশ্বরের শক্তি কমে না, যতই খরচ হউক। কাজেই মানুষের আদর্শও তাই। শক্তি খরচ করিতেই হইবে। রোজই উহার প্রয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত—যেন উহা না কমে। শক্তি জমাইয়া রাখিবার উপদেশ ছু-কুঙ্‌ বার বার দিতেছেন। এই জন্যই ইনি নীরবতা, নিবিড় শান্তি ইত্যাদির তারিফ্‌ এত করেন। শক্তিসঞ্চয়ের অবস্থায় নীরব সাধনাই আবশ্যক। এইজন্যই প্রকৃত নিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া উঠে। সংসারের নরনারীর প্রেম হইতে চরম ভগবৎ প্রেম পর্য্যন্ত সকল প্রেমযোগের সাধনাই এইরূপ। হট্টগোলের ভিতর বাজারে দাঁড়াইয়া প্রেমিক, সাধক, ভক্ত বা যোগী কাজ হাঁসিল করিতে পারেন না।

(৯)

ছু-কুঙ্‌ বুঝাইতেছেন :—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তৎ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

চীনা কবিবরের চিন্তায় সন্তোষ কি, এখন দেখা যাউক।

দিল্‌টা যদি থাকে ভরা রত্নে, খেতাবে,
চক্‌চকে সোণার ঝলকের কথা কে ভাবে?
ধনী সাউকারদের আমোদ ফুরায় ত্বরা'
কাঙালের সোজা জীবন সদা সুখে ভরা।
দরিয়ার কিনারায় টুক্‌রা এক কুয়াশার,
গাছের শাখায়, ফুলে ফেরোজা রঙের বাহার;
ফুলবাগানে ঘেরা কুটীর চাঁদিনী-মাখা,
সাঁকো এক চিত্রে আঁকা ছায়ায় আধা দেখা;
প্রেমের পেয়ালায় ভরা অমর লাল মদিরা,
সখা এক সহৃদয় বীণা হাতে করা;—
এই সবে মাতে যে তারে বলি সুখী,
হৃদয় বাড়াবার উপায় আর ত না দেখি।

কবিতাটি "কথামালায়" স্থান পাইতে পারে। বস্তুতঃ, দুনিয়ার সকল সাহিত্যেই নীতি-কথাগুলি একমাত্র শিশুজীবনের উপযোগী। বাইবেল, কোরাণ, মনুসংহিতা, কন্‌ফিউশিয়াসের উপদেশ—এই সব বালক-বালিকাদিগের জন্যই রচিত। বয়স বাড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ সমুদয় বচন মানুষের আবশ্যক হয় না। ঐ সমুদয় তখন হয় শিকায় তোলা থাকে, আর না হয়, ঐ গুলির মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য বড়-বড় বই লেখা সুরু হয়।

(১০)

কবি বলিতেছেন যে, রহা কষ্টকল্পনা করিলেই চরম সত্য লাভ করা যায় না। সহজে, সরলভাবে, অতি স্বাভাবিক উপায়েই জীবনের উচ্চতম, দুরূহতম

কাজগুলি শেষ করিতে পারি। হাড়ভাঙা খাটুনি, বুকফাটান হা-হুতাশ, ভ্রূকুটিপূর্ণ বদনমণ্ডল, খিট্‌খিটে মেজাজ, শশব্যস্ত ভাব ইত্যাদি বড় বড় কাজের আনুসঙ্গিক নয়। কবিরা, শিল্পীরা এই কথা বেশ বুঝিবেন। উচ্চতম শিল্প-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি একপ্রকার বিনা আয়াসেই সম্পন্ন হয়। সাধকেরাও ঠিক এই কথাই বলিবেন। প্রেমিকও এই কথাই বলিবেন।

"যতন করিলে রতন মিলে, ছিল যে মনে ধারণা ;—

জেনেছি জেনেছি প্রণয়েরই রীতি,

যতনে রতন মিলে না, মিলে না।"

চু-কুঙ্ বলিতেছেন—"ওহে বাপু, যতনে রতন মিলে না, মিলে না। স্বভাবের উপর নির্ভর কর—হৃদয়ের খাঁটি বিকাশের উপর নির্ভর কর—বিধিদত্ত শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর কর। তাহা হইলেই অসাধ্য-সাধন করিতে পারিবে।" রাত্রি জাগিয়া এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ঘাঁটিলেই কবি ও শিল্পী হওয়া যায় না। রাস্তায় হাঁটিতে-হাঁটিতে পথ ভুলিয়া যাইতে অভ্যাস করিলেই, ধ্যানী ও মিষ্টিক হওয়া যায় না।

রত্ন— সে ত পদতলে!

ডাইনে-বাঁয়ে ঢুঁরা বৃথা।

সকল পথেই পাবে তারে ;

এক আঁচড়েই বসন্ত হেথা।

হয়েছে ফুল ফুট' ফুট',

নববর্ষ আসে-আসে ;

হাত দিব না তাদের গায়ে,

জোর করলে তারা পড়বে খসে'।

থাকব আমি মুনি হ'য়ে

কিম্বা শ্রেওলা পুকুর ধারে,

আবেগে ভ'রে উঠ্‌লে মন,
তারে মিশাব বিশ্বসুরে।

কবিতাটা গভীরতম অভিজ্ঞতার ফল। যে-সে লোক এই কয় লাইন লিখিতে পারিবেন না। এক আঁচড়ে বসন্ত ফুটাইবার ক্ষমতা ওস্তাদ চিত্রকরদিগের থাকে। হাজার ঘসিয়া-মাজিয়াও যে জীবন বাহির করা গেল না, ওস্তাদ মহাশয় একবার তুলি লেপিয়াই তাহা বাহির করিলেন। মূলে এই কবিতাটার দাম নিশ্চয়ই লাখ টাকা। যতগুলি রূপকের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। আমাদের দেশে বড়-বড় সাধক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের গভীরতম অভিজ্ঞতার ফল আমরা হিন্দীতে, মারাঠিতে, বাঙ্গালার পাইয়াছি। কিন্তু সেই সমুদয় অধিকাংশ স্থলই অশিক্ষিত-পটুত্বের নিদর্শন। চীনা কবিতায় শিক্ষিত সাধকের হৃদয় পাইতেছি। শেওলার কথায় বুঝিতে হইবে যে, কবি নিজেকে একপ্রকার নিশ্চেষ্টভাবে রাখিতে চাহিতেছেন। দুনিয়া তাঁহাকে দিয়া যাহা করাইতে চাহে করাউক। বিলাতের শেলী "পাগলা পশ্চিমা বাতাসে"র বীণা হইতে চাহিয়াছিলেন। শেওলা হওয়া, আর বীণা হওয়া—একজাতীয় হওয়া। "আবেগে ভ'রে উঠ্‌লে মন, তারে মিশাব বিশ্ব-সুরে" —কথাটা অমূল্য। আমার নিজের আবেগ দুনিয়ার সকল আবেগের সঙ্গে মিশুক। আমি দুনিয়ার বীণা হই—অথবা দুনিয়াই আমার বীণা হউক। জগতের প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ গাঁথিয়া উঠুক। এই ভাবের গান ভারতীয় সাহিত্যে অনেকই আছে। সহজ কথায় সাধকগণকে বলা হইয়া থাকে—"ছটফট ক'রো না। অন্ধকার যখন ঘুচ্‌বে, তখন এক মুহূর্ত্তেই ঘুচ্‌বে। এক মুহূর্ত্তের পরশে জীবন বদলাইয়া যায়। নব জীবন লাভ করিতে দিন, সপ্তাহ, মাস বা বৎসর লাগে না। এক মুহূর্ত্তেই বড়-বড় কাজের প্রেরণা হৃদয়ে জন্মে। ভারতীয় "আদি" কবির মুখ এক

মুহূর্ত্তে ফুটিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তের সাক্ষী—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

এই মুহূর্তে বিরাট রামায়ণের সূত্রপাত।

(১১)

মুক্ত অবস্থার চিত্র প্রদত্ত হইতেছে। মুক্তিলাভের অর্থ অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়া।

ফুলে হামেশা ঘুরে' না হই হয়রাণ,
নিঃশ্বাসে নিজের ক'রে ফেলি আশ্‌মান্।
"তাও" পেয়ে আত্মা মিশে সূক্ষ্মলোকে,
সেথায় জীবনের গতি কেউ না রোকে।
দুনিয়া জুড়ে' বেড়াই হাওয়ার মত,
সাগর-শিখর সম উঁচু সতত।
তাঁরে মোর দুনিয়ার শক্তি অজস্র,
ট্যাকে গুঁজে রেখেছি সৃষ্টি সহস্র।
রবি শশী, তারা আমার চোপদার সব,
অমর ফীনিক্‌স্ পাখী বরকন্দাজ নীরব।
সকালে লাগাই চাবুক তিমিঙ্গিলে
চরণ ধুয়ে আসি ফুসাঙের জলে।

বাহবা মুক্তি। মুক্ত অবস্থা এইরূপ হইলে দুনিয়ার সকলেই মুক্তি পাইতে রাজি। আমরা নির্ব্বিকার মুক্তি চাই না। চাই এইরূপ দুনিয়ার উপর এক্তিয়ারওয়ালা বাদশাহী মুক্তি। চু-কুঙ্ জবরদস্ত মিষ্টিক, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, সকল পাকা মিষ্টিকই এই ধরণের শক্তি-মন্ত্রের প্রচারক। মুক্তি পাইয়া ভগবানে ডুবিয়া যাইবার কথায় অনেক সময়ে ডুবার দিকেই

নজর বেশী থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে, ভগবান্ও হওয়া যাইতেছে—এই দিকটা মনে রাখা আবশ্যক। ভগবান্ হওয়ার অর্থ দুনিয়াকে ভাঙ্গিবার-গড়িবার ক্ষমতা পাওয়া। ভারতীয় মুক্তিপন্থীরা যুগে-যুগে এই ক্ষমতার অনুশীলনই প্রচার করিয়াছেন। বেকুবেরা ব্যক্তিত্ব-বিসর্জ্জনটা লইয়াই মাতামাতি করে—শেয়ানারা ভগবান্ হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মোসাবিদা সুরু করে।

ফুসাঙ্ শব্দে চীনাদের বিবেচনায় কোন সুদূরবর্ত্তী মুলুকবিশেষ বুঝিতে হইবে। সাগরের শিখর কি বস্তু? ঢেউগুলি? ওসব এমন কি উঁচু? বুঝা গেল না। তিমিঙ্গিল শব্দে কোন পর্ব্বতপ্রায় বিশাল সমুদ্রজীব বুঝিতে হইবে। চীনারা কোন্ জানোয়ার বুঝে, বলিতে পারি না। ইংরেজ অনুবাদক দুইজনেই "লিভিয়াথান" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের হিসাবে বলা উচিত, "তিমিঙ্গিলঙ্গিল"!

(১২)

কবি সংযমের তারিফ করিতেছেন। বাজে খরচের বিরুদ্ধে এই কয় লাইন।

লেখাপড়া না ক'রেও
বুদ্ধি লাভ হয়;
কথার চেক্ থাক্‌লেই
শোক হৃদে না রয়।
মাত্রা চড়লেও সরাবের
চাঙ্গা হয় না দিল;
ফুল ম'লেই ঠাণ্ডা শীতে
প্রাণে লাগে না খিল্।
ধুলার অণু হাওয়ায় ভরা,

কণা তরঙ্গ-বুদবুদের
ছোটয়-বড়য় ধরতে গেলে
একটা রইবে দশহাজারের।

(১৩)

কবি সাংসারিক জীবনের সুখ অফুরন্তভাবে চাহিতেছেন। উহা অসংখ্য প্রকারের হউক এবং অনন্ত কালের জন্য থাকুক। মিষ্টিক মহাশয়েরা এই ধরণের "অনন্ত" প্রচার করিলে, তাঁহাদের মক্কেল জগতের সকল লোকই হইবে।

চাঙ্গা-করা সুখের বান যেন না থামে,
হরদম্ দিল্ ভরে থাক্ আনন্দ রসে ;—
সুগভীর স্রোতস্বতীর রূপার হাসি,
ফুট'-ফুট' ফুল যাতে বায়ু উড়ে বসে।
আর আসুক তোতা পাখী সখা বসন্তের,
দাওয়া-সোপানের বৈঠক, উইলো তরুর সার,
পার্ব্বত্য দিয়ারা হতে বন্ধু একজন,
পেয়ালা-রঙিন-করা সরাবের বাহার।
বেড়ে যাক্ জীবনের সীমানা এইরূপে,
লেখাপড়ায় জান্ যেন চাপা না পড়ে ;
খোলা-প্রাণ থাকি সদা প্রকৃতির মাঝে,
হিয়ায় আনন্দ বিরাট তোলা যাক্ গড়ে'।

(১৪)

কবি বলিতেছেন যে, বড় বড় যাহা কিছু দুনিয়ায় দেখা যায়, সবই মহা ছোট জিনিসে গড়া। চু-কুঙ অণুর মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। লম্বাচৌড়া বোল্‌চালে এবং আন্দোলনে না মাতিয়া ধরা-ছোঁয়া-যায়-না-যাহা

আর দেখা-শুনা-যায়-না-যাহা এইরূপ কাজে লাগিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানেরই কার্য্য। ভগবান্ এই ধরণের অদৃশ্য ক্ষুদ্রের সাহায্যেই বিরাট অসীম ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়াছেন।

সকল জিনিষেই আছে অণুকণা,
চোখে কাণে বুঝা না যায় ;
রূপ তাদের উঠ্‌ছে সতত গড়ে'
ভগবানের আজব কারখানায় !
দরিয়া গড়ায়, ফুল ফুট'-ফুট',
শিশির বিন্দু শুকায়ে যায়,
লম্বা সড়কের সীমানা বড়,
গলি ঘোঁচে পা ঠেকে পায়।
কথার চটক্ ছেড়ে দাঁড়াও ভাই,
ছুঁড়ে ফেলে চিন্তা অসার,
ও সবুজ বসন্ত যে থাকে কণায় ভরা
আর জ্যোৎস্না-মাখা তুষার।

(১৫)

জীবনে সিদ্ধিলাভ কাহাকে বলে চু-কুঙ তাহার আলোচনা করিতেছেন। আমরা গাহিয়া থাকি :—

বিফল জনম, বিফল জীবন, জীবনের জীবন না হেরে।
সুখ-ডালে বসি ডাকিছ পাখীরে,
ডাকিতেছ কি সেই পরম পিতারে ?
কি বলে ডাকিছ বলে দে আমারে
ডেকে দেখি, পাই কি না পাই তারে ?
গুঞ্জরি ভ্রমর করে গুণ-গুণ
গাহিতেছ কি সেই গুণাকর গুণ ?—ইত্যাদি

ছু-কুঙ্ প্রায় এই আদর্শেরই একাকী নির্জ্জন জীবন চাহিতেছেন।

থাক্‌ব নিজের খেয়াল মত
সখী হবে প্রকৃতি,
অল্পে তুষ্ট, অবাধ জীবন,
বিশ্বেশ্বরে ডাক্‌ব নিতি।
পাইন-তলায় কুঁড়ে বেঁধে
কাব্যচর্চ্চা রাতদিন ;
সকাল সন্ধ্যার রাখব খবর—
মাস-বছরের জ্ঞানহীন।
এতেই যদি সুখ পাওয়া যায়,
আর কিছু কেন চাইব ?
নিজের ভিতর এই ধন পেলে
পাওয়া হল না কি সর্ব্ব ?

ঠিক্ যেন—"গৃহে চ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ ?"

(১৬)

ছু-কুঙ্ প্রকৃতি-সুন্দরীর আবেষ্টনে থাকিতে থাকিতে এক খেয়াল দেখিতেছেন।

সুন্দর পাইনের কুঞ্জ হেথা,
গিরি-নদী বহে গড়িয়ে,
তুষারে নীল আকাশ হাসে
জেলে-ডিঙ্গি যায় দূরে বেয়ে।
নাল-ঝোপে ধীরে, থেমে
জেড্-বরণী সুন্দরী যায়
আমি চলি পিছে-পিছে ;

মিশিল সে উপত্যকায়।
কায় ছেড়ে মন দূর অতীতে
উড়ল অজানা ভুলা দেশে,—
যেথা শরতের সোণার হাসি
কিম্বা চাঁদ বেড়ায় ভেসে!

জেড্, সবুজ রঙ্গের পাথর। জেডের কথা চীনা সাহিত্যে যখন-তখন শুনা যায়।

(১৭)

ছু-কুঙ্ পাহাড়ী পথে চলিতেছেন। চলিতে কষ্ট হইতেছে। এই কষ্টে একটা রূপক দেখা গেল। "তাও"য়ের নানা রূপ। তিনি কখনও সহজ, সরল—কখনও বক্র, জটিল। তিনি লীলাময়।

যাচ্ছিলাম তাই-সিং পাহাড়ে
সবুজ বাঁকা পথ ভেঙ্গে;—
গাছরাশি যেন জেড্-সাগর
ফুল্-গন্ধ বাতাসের অঙ্গে।
পাহাড়ে উঠা কষ্টকর,
আওয়াজ বেরুল মুখ থেকে;
অম্নি ফিরে এল সেটা—
লুকানো যেন না ঢেকে'!
জলের ঘূর্ণিপাক নীচেতে,
আশ্মানে বাজের দৌড় খেলা;
একরূপে "তাও" দেন না দেখা,
এই চতুর্ভুজ, এই গোল লীলা।
প্রতিধ্বনি লুকানো অথচ ঢাকা নয়।

(১৮)

কবি যেন আবার বলিতেছেন যে, বিনা যতনেই রতন মিলে। মানুষের "গুরু" লাভ এইরূপ "দৈব" ঘটনারূপে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে। ছু-কুঙ্ তাঁহার এক অভিজ্ঞতা বিবৃত করিতেছেন।

ছোট-ছোট সোজা কথায়
আমার মন খুলে দিতে চাই ;
হঠাৎ দেখ্লাম এক যোগীরে,
"তাও"য়ের হৃদয়ই যেন তাই।
আঁকা-বাঁকা নদীর ধারে,
ছায়াতলে কালো পাইনের,
বিদেশী এক লকড়ী-হাতে,
বীণার তানে কাণ আর-একের।
এইরূপে পাই খেয়াল বশে,
ঢুঁরলে হয় ত তা পাব না,—
তাল, মান, লয় ছুনিয়া হ'তে,
শুনি তায় অনন্যমনা।

(১৯)

ছু-কুঙ্ এইবার মুক্তি-পাগল হইয়াছেন। উৎকট বৈরাগ্যে আর উৎকট প্রেম-বিরহে মানুষের অবস্থা একরূপ হয়। মুমুক্ষুর বচনেও বিরহীর ভাষ ই বাহির হইয়া থাকে। ছু-কুঙ্ ঠিক বিরহীর মত হা-হুতাশ করিতেছেন। চীনা-মিষ্টিক মহাশয় তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে প্রেয়সী রমণীরূপে আহ্বানও করিতেছেন। সুফী ও বৈষ্ণব মুল্লুকে আসা গেল দেখিতেছি। তবে এ ক্ষেত্রে মাত্রা খুব অল্প ও সংযত। ছু-কুঙের অধ্যাত্ম চিন্তায় শৃঙ্গার রসের রূপক নাই বলিলেই চলে। কাজেই অর্থ সম্বন্ধে

মাথা ঘামাইতে হয় না। কিন্তু সুফী ও বৈষ্ণব সাহিত্যে কতখানি শৃঙ্গার, আর কতখানি অধ্যাত্ম—তাহার মীমাংসা সহজ নয়।

তুফানে নদীরে উতলা করে,
শাঁ-শাঁ ফাট্-ফাট্ গাছে, বনের ভিতরে
মন আমার নীরস বড় মরার মত,
প্রাণপ্রিয়া আজও মোর না সমাগত।
একশ বছর বয়ে গেল, জল সমান ;
ঠাণ্ডা ছাই যেন ধন-খেতাবের প্রাণ।
আমা হ'তে "তাও" রোজ দূরে সরে যায়
দুঃখ নিবৃত্তির পথ কে দেখাবে হায় ?
সৈনিক, বীর, সাহসী খোলে তলোয়ার,
অমনি সুরু হয় অশ্রু অনিবার।
জোরে বয় বাতাস, পাতা পড়ে ধরায় ;
ভাঙ্গা চালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি গড়ায়।

কবিতাটা বোধ হয় ভাল বুঝা গেল না ?

(২০)

ছু-কুঙ্ পূর্ব্বে একবার চিত্রকলা হইতে রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে একটা গোটা কবিতাই এই রূপকের ব্যাখা। ইনি বলিতেছেন যে, চিত্রকর গাছ, পাতা, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বতাদির আসল "স্বরূপ" আঁকিয়া থাকেন। সেই আসল স্বরূপই "তাও"। এই "তাও" বাহির করিবার জন্ম চিত্রকরকে এক প্রকার ধ্যানমগ্ন থাকিতে হয়। পদার্থগুলির বাহ্য রূপ দেখিতে দেখিতে শিল্পী এই সমুদয়ের অন্তরে প্রবেশ করেন। শেষে যখন ছবি আঁকা হয়, তখন দেখা যায় যে, বাহ্য রূপটা প্রকটিত হয় নাই—প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহারই অনুরূপ আর-কিছু। এই "আর-কিছু"তে

তাওয়ের প্রভাব বুঝিতে হইবে। কবিবরের এই মতে ভারতীয়চিত্রশিল্পের কোন-কোন ওস্তাদও সায় দিবেন। "শুক্রনীতি"তে এই ধরণের ধ্যানে-পাওয়া রূপের কথা আছে। শিল্প এবং যোগীর কার্য্য-প্রণালী একপ্রকার। এই জন্য ছু-কুঙ্ যোগীর তাও-সাধনের বর্ণনা করিতে যাইয়া শিল্পীর কথা পড়িয়াছেন।

স্থিরনেত্রে বস্তুটার রূপ দেখলে অনেকক্ষণ;
তাহার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি লাভ করে শিল্পীর মন ;—
লহরমালার ভঙ্গী, শ্রী—চায় সে যখন,
অথবা আঁকিবে সে বসন্ত রতন।
বাতাসে তাড়ানো মেঘ রূপ পায় কত,
উদ্ভিদের বিকাশে শক্তি খেলে শত ;
সাগরের কুল-ভাঙ্গা তরঙ্গরাশি,
আর গিরির ঘাড়ে-পীঠে শৃঙ্গের হাসি ;—
সকলেরই ভিতর বিরাট "তাও" বিরাজে,
"তাও" লাগে দুনিয়ার বস্তু-গঠন কাজে।
রূপ ছাড়া "অনুরূপ" পাওয়া যদি যায়,
আত্মা পাওয়া হ'ল না কি শিল্প-কলায় ?

(২১)

কবি এইবার অসীম বা অতীন্দ্রিয়ের স্বরূপ বুঝাইতেছেন। ধরা-ছোঁয়া যায় না—সেই বস্তুটা কি ? বলা বাহুল্য, বর্ণনাটাও ধরা-ছোঁয়া না যাইবারই কথা।

সূক্ষ্ম মনের তৈরি নয় সে,
বিশ্বের অণুতেও নয় তার প্রাণ,
রয় সে যেন সাদা মেঘে

নিয়ে যায় তারে বায়ুর টান।
দূরে যখন, যেন কাছে,
কাছে গেলে উড়ে যায় ;
"তাও" যে বস্তু সেও তাই
রয় না সে নশ্বরের সীমায়।
পাহাড়ে, তরুশিখরে,
শেওলায়, রবি-কিরণে সে ;
"তাও" রয় গোপনে ধ্যানকালে,
ধ্বনি তার কাণে না পশে।

আমরা গাহিয়া থাকি—

"আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়,
শশী-তারকায়, গহনে।"

(২২)

কবি সিদ্ধিলাভের পথের এক স্তর দেখাইতেছেন। একাকী নির্জন সাধনায় মগ্ন থাকিবার পর, যোগীরা এই ধরণের কথাই বলেন। "ঠিক যেন পেয়েছি অথচ পেলাম্ না।" এই সুরেই আমরা গাহিয়া থাকি—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না।

* * *

হারাই হারাই সদা ভয় হয়
হারাইয়ে ফেলি চকিতে।"

চীনা সাধক প্রায় এই কথাই বলিতেছেন। যে-কোন লক্ষ্য এবং আদর্শ লাভ করিবার প্রয়াসেই সাধকেরা এই অভিজ্ঞতা পাইবেন।

"পথ চেয়ে তার, বসি বিরলে,

একাকী, সঙ্গীহীন ;—

হাও-পাহাড়ের সারসের মত ;

যেন বা হুয়া-পাহাড়ের মেঘ।

বীরের প্রতিকৃতি চিত্রে

জীবনের তেজ যায় দেখা ;

অসীম সাগরে ভাসে পাতা

বয়ে নেয় তারে হাওয়ার বেগ।

ধরা যেন পড়্‌বে না সে,

সদাই হয় ধরা পড়'-পড়' ;

তারাই পেয়েছে যারা বুঝে এই,

পাবে না তারা যাদের বেশী আবেগ।"

অর্থাৎ পূরাপূরি দেখ্‌তে চাওয়াটাই বেকুবি! চীনা কবি বলিতেছেন—"অত্যধিক আশা করিও না। মাঝে-মাঝে যাহা পাইতেছ, তাহাই চরম।" ছু-কুঙের মতে "কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে" বলিয়া কাঁদা অনাবশ্যক। ভিতরকার চারলাইন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে কি?

(২৩)

একটা কবিতায় ছু-কুঙ্ মানুষের আয়ু অল্প দেখিয়া দুঃখ করিতেছেন। তাহার তুলনায় পাহাড় অমর।

এক-শ' বছর মানুষ বাঁচে,

জীবন কত শীঘ্র ফুরায়!

সুখের ভাগ ত অল্প বিশেষ

দুঃখের হিস্‌সাই বিরাট হায়!

পরম সুখ ত মদের পেয়ালা,

আর রোজই কুঞ্জে আসা-যাওয়া,

দেখতে "ইষ্টোরিয়া" লতার ফুল
পশ্‌লায় যখন আকাশ ছাওয়া ;
তার পর খুস্ হ'লে দিল সরাবে,
ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়া ;
সবাই একদিন হবে প্রাচীন—
কেবল দখিন পাহাড় রইবে খাড়া।

এই শেষ লাইনের জন্যই কি কবিতাটা সাধন-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে ? না—জীবনের দুঃখের কথা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ?

(২৪)

চু-কুঙ্ এইবার জীবনের শেষ অবস্থার কথা বলিতেছেন। তাহাতেই না কি তাঁহার সমগ্র সাধন-তত্ত্বের সঙ্কেতও রহিয়াছে। এই চাবির সাহায্যে তাঁহার "তাও"-রহস্য খোলা যাইবে।

জল তুল্‌বার চাকা যেটা ঘুরছে সতত
অথবা গড়িয়ে যাওয়া মুক্তার দানা,—
জীবনের শেষ অবস্থা কি এদেরই মত ?
এ সব রূপক মূর্খের তরে—সকলের জানা।
ধরিত্রীর ব্যাস-দণ্ড বিরাট,
সদা চঞ্চল মেরু আকাশের,—
এ সকলের তত্ত্ব বুঝে ল'য়ে,
সবাই মিশি ভিতরে মহা একের।
স্বপ্ন-চিন্তার অতীত হ'ব,
গ্রহের মত ঘুর্‌ব শূন্যে,
হাজার বছরে এক চক্কর দিব,—
চাবি এই মোর রহস্যের জন্যে।

বোধ হয় আত্মার শেষ অবস্থাটা—চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে, গ্রহলোকে অমর জীবন।

এই চব্বিশটা কবিতায় তাও-ধর্ম্মের অনেক কথা জানা গেল। মোটের উপর বুঝিলাম, এই ধর্ম্ম অন্য নামে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে।

যাঁহারা তাও-ধর্ম্মের প্রশংসা করেন, তাঁহারা চু-কুঙ্ প্রচারিত তত্ত্বের মত তত্ত্বাংশ লোকের সম্মুখে বাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দার্শনিকতাই তাও-ধর্ম্মের একমাত্র অঙ্গ নয়। ইহার একটা ভূতুড়ে-কাণ্ডের অংশও আছে। হাঁচি, টিকটিকি, তিথি নক্ষত্র, মঘা, অশ্লেষা ইত্যাদির অসংখ্য জুড়িদারে তাও-ধর্ম্মীদিগের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। যাঁহারা তাও-ধর্ম্মের নিন্দা করেন, তাঁহারা লোকের সম্মুখে সেইগুলি দেখাইয়া থাকেন।

আর যাঁহারা আত্মা, যোগ, ধ্যান, মুক্তি, অতীন্দ্রিয়, শূন্য, সাধন, ভগবৎপ্রাপ্তি ইত্যাদি পছন্দ করেন না, তাঁহারা চু-কুঙের মত সাধকেরও নিন্দা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ভূতুড়ে-কাণ্ডে ত তাঁহাদের সহানুভূতি থাকিতেই পারে না। এই শ্রেণীর লোকের নিকট তাও-ধর্ম্ম আগাগোড়াই নিন্দনীয়। অর্থাৎ তাঁহারা ভারতীয় অথর্ব্ব বেদেরও শ্রাদ্ধ করিবেন, আর কবীর, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদিকেও বেকুব বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের চিন্তায় একদিক গেল খাঁটি কুসংস্কার, আর একদিক একেজো কাণ্ডজ্ঞানহীন মাথাপাগলা লোকের খেয়াল। যাহা হউক, তাও-ধর্ম্মের নাম শুনিয়া ভারতবাসী হয় ত ভাবিতে পারেন—একটা নূতন কিছু বুঝি। সত্য কথা, ভারতীয় হিন্দু গৃহস্থেরা সকলেই তাও-ধর্ম্মী। আমরা উপনিষৎ-বেদান্তের "পন্থা"ও খুঁজিয়া থাকি, আবার পাঁজী-পুঁথি ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও কাটাই না।

চীনে আর একটা ধর্ম্মের প্রচলন আছে। জগতে তাহাকেই লোকেরা খাঁটি চীনাধর্ম্ম বলিয়া জানে। তাহার নাম কনফিউশিয় ধর্ম্ম। এক

কথায় একটা ধর্ম্মের বর্ণনা করা অসম্ভব। এই ধর্ম্মেও ভূতুড়ে-কাণ্ড আছে; উহা তাও-ধর্ম্মীদেরই সুপরিচিত বস্তু। দু'-এক বিষয়ে উনিশ বিশ আছে কি না, বলিতে পারি না। বস্তুতঃ, চীনারা কন্‌ফিউশিয়ই হউক, বা তাও-পন্থীই হউক, সকলেই এ সম্বন্ধে খাঁটি ভারতবাসী। ইহারা আমাদেরই মাস্‌তুত ভাই।

সাধারণতঃ কিন্তু কন্‌ফিউশিয়-ধর্ম্মীরা নিজেদেরকে তাও-পন্থী হইতে তফাৎ করিতে চেষ্টিত। এইজন্য নিজেদের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিতে তাহারা বিশেষ যত্নবান। তাহারা বলে—"তাও-ধর্ম্মীরা আত্মা, মুক্তি, পরকাল লইয়া ব্যস্ত। আমরা ও-সবের ধার ধারি না। আমরা এই জগতের সাংসারিক নীতি-পালনকেই জীবনের ধর্ম্ম বিবেচনা করি।" এককথায় বলিতে পারি যে, এই নীতির সূত্র—"পিতামাতা গুরুজনে সেবা কর কায় মনে।" অর্থাৎ এই হিসাবে "মনুসংহিতা" যে সমাজে প্রচলিত, সে সমাজ কন্‌ফিউশিয়-ধর্ম্মী। বস্তুতঃ, কন্‌ফিউশিয়-পন্থীরা ভগবানে বিশ্বাসও করে, মূর্ত্তিপূজাও করে। তাও-পন্থীদের বহু দেবদেবী কনফিউশিয়-মহলেও পূরা মাত্রায় বিরাজ করিয়া আসিতেছে।

শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই,

এম, এল, সি মহাশয়ের নামে প্রবর্ত্তিত

হৃষীকেশ-সিরিজ এর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর   মূল্য—২৲

Approved by the Director of Public Instruction as a Prize and Library Book.

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, এফ্-জেড্-এস্ প্রণীত

২। পাখীর কথা   মূল্য—২৷৷৹

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩। ভারত-পরিচয়   মূল্য—২৸৵৹

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

৪। কান্তকবি রজনীকান্ত মূল্য—৪৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ প্রণীত

৫। চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ মূল্য—১৲

পরে বাহির হইবে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত

১। বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

২। স্থাপত্য-শিল্প

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

৩। বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়